পি. এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ

ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ

শিরোনাম: বাংলাদেশে পাত্র সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি : একটি নৃ-ভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ (The Language and culture of Patro Community of Bangladesh: An anthropo linguistic analysis)

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ
চেয়ারম্যান, যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
অনারারি অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৭
শিক্ষাবর্ষ: ২০১২-২০১৩
(হল: স্যার এ এফ রহমান)
ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এপ্রিল ২০১৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
কলা অনুষদ

ঘোষণাপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে পাত্র সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি : একটি নৃ-ভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ (The Language and culture of Patro Community of Bangladesh: An anthropo linguistic analysis) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করেছেন। এ গবেষণাকর্মটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এ গবেণাকর্মের কোনো অংশ বা সিদ্ধান্ত কোনো ডিগ্রী বা জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়নি।

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক, ড. হাকিম আরিফ
চেয়ারম্যান, যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
অনারারি অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

২০০৪ সালে আমি সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করি। এ অঞ্চলের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির ভাষা ও সংস্কৃতি আলোচনা করতে গিয়ে পাত্র সম্প্রদায় সম্পর্কে অবগত হই এবং তাঁদের ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক অন্বেষণে উৎসাহী হয়ে উঠি। ২০০৫ সালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করলেও পাত্র সম্প্রদায় সম্পর্কিত গবেষণায় আমার ছেদ পড়েনি। অতঃপর ২০১২-২০১৩ সেশনে পিএইডির বিষয় হিসেবে বাংলাদেশে পাত্র সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি : একটি নৃ-ভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ (The Language and culture of Patro Community of Bangladesh: An anthropo linguistic analysis) নির্ধারণের পর এ বিষয়ে আরও অনুপুঙ্খ ও বিস্তারিত গবেষণায় আত্মনিয়োগ করি।

আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফের নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। গবেষণার প্রথম থেকে শেষ অবধি তিনি প্রতিটি অধ্যায় অনুপুঙ্খভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন এবং প্রতিটি অধ্যায় কীভাবে সংশোধন করে উন্নত করা যায় সে বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি দিক-নির্দেশনা দিয়ে আমার গবেষণাকর্মটি সমৃদ্ধ করেছেন। এ জন্য আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এ গবেষণার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক ভাষাবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের প্রতি। তিনি আমাকে পাত্র সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রথমেই অবহিত করেছেন। তাঁর মূল্যবান উপদেশ ও নির্দেশনা এ অভিসন্দর্ভটি লেখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। পুরো অভিসন্দর্ভটি তিনি দেখে দিয়েছেন এবং তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী কোনো কোনো অংশ বাদ দিয়েছি ও কিছু নতুন বিষয় সংযোজন করেছি।

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, এই বিভাগের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক অধ্যাপক ড. আবদুল আউয়াল বিশ্বাসের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। প্রত্যক্ষ মাঠ-গবেষণায় তিনি আমাকে সর্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করেছেন। অনেকবার তাঁর সঙ্গে পাত্র এলাকায় গিয়ে তথ্য আহরণের সুযোগ পেয়েছি। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মাঠ গবেষণায় আমার জন্য সময় ব্যয় করেছেন। গত সাত বছরে বিভিন্ন সময় তাঁর বাসায় থেকে গবেষণার সুযোগ পেয়েছি। তাই কেবল ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর এই ঋণ শোধ করা যাবে না। এই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. মোখলেছুর রহমান তাঁর বাসায় থাকা ও খাওয়ার

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থা করে আমার গবেষণার কাজ সহজ করে দিয়েছেন। তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রী (ভাবী)-কে আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মনযুর-উল-হায়দার পাত্র এলাকায় গিয়ে কাজ করার নিমিত্তে আমাকে তাঁর ক্যামেরা, ল্যাপটপ ও আনুষঙ্গিক সহযোগিতা দিয়ে আমার কাজটি সহজ করে দিয়েছেন। তাঁর বাসায় ভাবির আতিথ্যে আমার কাজটি আরও সহজ হয়েছে। আমি তাঁদের দুজনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সাইফুর রশীদের প্রতি রইল আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। তিনি আমাকে এ বিষয়ে কাজ করার জন্য উৎসাহ যুগিয়েছেন। এছাড়া এ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব রাশীদ মাহমুদ, ড. মো. রাফিউল ইসলাম, ড. এস এম আরিফ মাহমুদ প্রমুখের সহৃদয় সহযোগিতা আমার কাজটিকে সমৃদ্ধ করেছে। আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পাত্র এলাকায় কাজ করতে গিয়ে পাত্র জনগোষ্ঠির অনেকের সাথেই আমার হার্দিক সম্পর্ক হয়েছে। তাঁরা অনেকেই আমার তথ্য সংগ্রহের কাজে অকৃত্রিম ভালোবাসা দেখিয়েছেন। পাত্র সম্প্রদায় কল্যাণ পরিষদের (পাসকপ, দলই পাড়া, খাদিমনগর, সিলেট সদর) সভাপতি এবং বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সদস্য শ্রী গৌরাঙ্গ পাত্র আমার তথ্য সংগ্রহে নিরলস কাজ করেছেন। তিনি পাত্র এলাকার বিভিন্ন গোত্র প্রধানের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। পাত্ররা তথ্য প্রদানে ভয় ও ইতস্তত করেন বলে তাঁদের কাছ থেকে অনেক সময়ই আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় না। কিন্তু শ্রী গৌরাঙ্গ পাত্র আমার এ কাজটি সহজ করেছেন। তাঁকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পাত্ররা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি হিসেবে বিভিন্ন উৎসব পালন করে থাকেন। কোনো কোনো উৎসবে বহিরাগতদের অংশগ্রহণ একেবারেই নিষেধ। আবার কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকলেও তাঁরা ঐ অনুষ্ঠানের কোনো তথ্য বহিরাগতদের কাছে প্রকাশ করেন না। আমি প্রায় সব অনুষ্ঠানেই অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছি। কারণ অধিকাংশ পাত্র বাড়ির অভিভাবক আমাকে চেনেন এবং তাঁরা আমাকে অতিশয় নির্ভর করেন। এই অসম্ভব কাজটি সহজ করে দিয়েছিন শ্রী বিধূর পাত্র। তিনি পাসকপে চাকুরি করেন এবং দলই পাড়ার সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। পাসকপে চাকুরি করেন রিন্টু পাত্র, বয়স ২৬ বছর, খাদিমনগরের মালগাও গ্রামে তার বসতি; তিনি আমাকে পাত্র এলাকায় গিয়ে তথ্য সংগ্রহে সবিশেষ সাহায্য করেছেন। শ্রী লগনী পাত্র আমার গবেষণা কাজে অনেক সাহায্য করেছেন। তাঁর ভাই পবিত্র পাত্র তাঁদের সংস্কৃতি ও ভাষার নানা দিক উদঘাটনে আমাকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমার সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তসমূহ পবিত্র পাত্র যাচাই বাছাই করে তা আরো সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর প্রতি রইল আমার অকৃত্রিম

Dhaka University Institutional Repository

ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। এছাড়া লবণী পাত্র, সুমতি পাত্র, শ্রী সঞ্জিত পাত্র, নকুল পাত্র, মোহন পাত্র, নিপু পাত্র প্রত্যেকের প্রতি আমি ঋণী।

খাদিমনগর এলাকার সেনানিবাস সংলগ্ন একটি স্থানের নাম হলো বটেশ্বর। এখান থেকে পাত্র এলাকা বেশি দূরে নয়। বটেশ্বরে সেনানিবাস সিনেমার কাছে ছোট্ট একটি পানের দোকান আছে। দোকানটি সকালবেলা খোলার পর থেকেই যে ভীড় শুরু হয় তা চলে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত। পাত্র এলাকায় ঘুরোঘুরি করে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে এই দোকানে এসে অনেকবার বসেছি। পান বিক্রির মাঝে মাঝে পাত্র সমাজ, সংস্কৃতি, প্রথা, বিশ্বাস, ঐতিহ্য, পূর্বের অবস্থা, বর্তমান অবস্থা, ভবিষ্যতে পাত্রদের ভাগ্য কোথায় গিয়ে ঠেকবে-ইত্যকার নানা বিষয়ে লিটন পাত্র আমাকে তথ্য দিয়েছেন। তাঁর এই আলাপ আলোচনায় আমি অনেক কিছুই জানতে পেরেছি। পাত্র সম্প্রদায়ের না হয়েও ঐ এলাকায় দীর্ঘদিন বসবাসের ফলে পাত্রদের সঙ্গে অনেকেরই হৃদ্যতা হয়েছে। এর মধ্যে ইব্রাহীম এবং ইসলাম উদ্দীনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইসলাম শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগ থেকে পাস করে এখন সিলেটের একটি স্কুলের শিক্ষক। তিনি আমাকে পাত্র এলাকার জনগণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এবং তথ্য উপাত্ত সংগ্রহে প্রয়োজনীয় সাহায্য করেছেন। ইব্রাহীম দীর্ঘদিন যাবৎ পাত্র এলাকায় থাকেন। শৈশব থেকে পাত্রদের সঙ্গে বসবাসের ফলে তিনি পাত্র ভাষা আয়ত্ত করেছেন। পাত্ররা ইব্রাহীমকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। গরিব অথচ সৎ ইব্রাহীমের অনুষঙ্গ না পেলে আমার গবেষণার অনেক তথ্যই অজ্ঞাত রয়ে যেত। ইব্রাহীমের প্রতি তাই আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

অভিসন্দর্ভ রচনার প্রয়োজনে আমি বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সাহায্য নিয়েছি-এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সিলেট পাবলিক লাইব্রেরি, বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট, পাত্র এলাকায় অবস্থিত বেসরকারি সংস্থা এফআইভিডিবির গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, পাবলিক লাইব্রেরি প্রভৃতি। এসব গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা ও কর্মচারির প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা রইল।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

সার-সংক্ষেপ **i-iii**

১. প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা **১-৬**

১.১ গবেষণার বিষয় শনাক্তকরণ
১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য (purpose)
১.৩ গবেষণার পরিধি (scope)
১.৪ গবেষণা প্রশ্ন
১.৫ অভিসন্দর্ভ-গঠন পরিকল্পনা (proposed structure)
১.৬ গবেষণার আনুমানিক সময়-পরিধি (expected research timeframe)
১.৭ উপসংহার

২. দ্বিতীয় অধ্যায়

পাত্র জনগোষ্ঠির পরিচয় **৭-১৩**

২.১ সিলেটের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পাত্র জনগোষ্ঠি
২.১.১ পাত্রদের অবস্থান
২.১.২ ধর্মবিশ্বাস
২.১.৩ পাত্রদের সামাজিক অনুষ্ঠানাদি

৩. তৃতীয় অধ্যায়

পূর্ব-গবেষণা সমীক্ষা **১৪-২৩**

৪. চতুর্থ অধ্যায়

নৃ-ভাষাবিজ্ঞানঃ তাত্ত্বিক বিবেচনা **২৪-৪৩**

৪.১ নৃ-ভাষাবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য
৪.১.১ নৃ-ভাষাবিজ্ঞানের প্রামাণ্য সংজ্ঞা
৪.২ নৃ-ভাষাবিজ্ঞান (anthropological linguistics)
ও ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানের (linguistic anthropology) সম্পর্ক
৪.৩ নৃ-ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাস
৪.৪ উপসংহার

৫. পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশে নৃ-ভাষাবিজ্ঞান চর্চা **৪৪-৫৮**

Dhaka University Institutional Repository

৬. ষষ্ঠ অধ্যায়

পাত্র সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ৫৯-৭৬

৬.১ ইতিহাস

৭. সপ্তম অধ্যায়

গবেষণা পদ্ধতি ৭৭-৮১

৭.১ গবেষণা পদ্ধতি (research methodology)

৭.১.১ লিটারেচার রিভিউ

৭.১.২ উপাত্ত সংগ্রহ

৭.১.২.১ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ

৭.১.২.২ সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে উপাত্ত সংগ্রহ

৭.১.২.৩ প্রাথমিক উৎস

৭.১.২.৪ দ্বৈতীয়িক উৎস

৭.২ উপাত্ত বিশ্লেষণ

৭.৩ গবেষণা প্রকৃতি (nature of the research)

৮. অষ্টম অধ্যায়

পাত্র ভাষা বিশ্লেষণ ৮২-১১৬

৮.১ ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে পাত্র ভাষার অবস্থান

৮.২ পাত্র ভাষার বৈশিষ্ট্য

৮.৩ পাত্র ভাষা বিশ্লেষণ

৮.৩.১ ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

৮.৩.১.১ স্বরধ্বনি বিচার

৮.৩.১.২ অর্ধ–স্বরধ্বনি (Semi-vowel)

৮.৩.১.৩ দ্বিস্বরধ্বনি (Diphthong)

৮.৩.১.৪ ত্রি–স্বর

৮.৩.১.৫ ব্যঞ্জনধ্বনি (Consonant)

৮.৩.১.৬ ন্যূনতম শব্দজোড় (minimal pair)

৮.৩.১.৭ নাসিক্য ব্যঞ্জন (Nasal Consonents)

৮.৩.১.৮ যুগ্মীভবন

৮.৩.১.৯ অক্ষর (Syllable)

৮.৩.১.১০ ধ্বনির উচ্চারণগত দিক

৮.৩.২ রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

৮.৩.২.১ রূপমূল বিশ্লেষণ

৮.৩.২.১.১ মুক্তরূপমূল ও বদ্ধরূপমূল

৮.৩.২.২ বদ্ধরূপমূল

৮.৩.২.৩ যৌগিক রূপমূল

Dhaka University Institutional Repository

৮.৩.২.৪ জটিল রূপমূল
৮.৩.২.৫ সম্প্রসারিত রূপমূল
৮.৩.২.৬ শব্দগঠন প্রক্রিয়া
৮.৩.২.৭ প্রত্যয় সংযুক্তি (affixation)
৮.৩.২.৮ পুনরাবৃত্তি (reduplication)
৮.৩.২.৯ যৌগিকীকরণের মাধ্যমে গঠিত শব্দ
৮.৩.২.১০ দিন বাচক শব্দ
৮.৩.২.১১ সংখ্যা গণনা
৮.৩.২.১২ বচন (number)
৮.৩.২.১৩ লিঙ্গ
৮.৩.৩ বাক্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
৮.৩.৩.১ বাক্যের পদক্রম
৮.৩.৩.২ পাত্র ভাষার বাক্যের প্রকারভেদ
৮.৩.৩.৩ অর্থগত দিক থেকে বাক্যের শ্রেণিবিন্যাস
৮.৩.৩.৪ প্রশ্নবোধক বাক্য
৮.৩.৩.৫ পদ–প্রকরণ
৮.৩.৩.৬ কারক, বিভক্তি ও অনুসর্গের ব্যবহার
৮.৩.৩.৭ কারক–বিভক্তি
৮.৩.৩.৮ অনুসর্গের ব্যবহার
৮.৩.৩.৯ বাচ্যের প্রকারভেদ
৮.৩.৩.১০ ক্রিয়ার ভাব
৮.৩.৩.১১ পুরুষের প্রকারভেদ
৮.৩.৩.১২ কাল
৮.৩.৪ অর্থতত্ত্ব (Semantics)
৮.৩.৪.১ সমার্থ শব্দ
৮.৩.৪.২ বিপরীতার্থক শব্দ
৮.৩.৪.৩ সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ
৮.৩.৪.৪ অন্তর্ভুক্ততা
৮.৪ পাত্র ভাষা সংগঠনে পাত্র সংস্কৃতির প্রভাব
৮.৪.১ ধ্বনিতাত্ত্বিক সংগঠনে প্রভাব
৮.৪.২ রূপতাত্ত্বিক সংগঠনে প্রভাব
৮.৫ উপসংহার

৯. নবম অধ্যায়
পাত্র সংস্কৃতির নানা দিক **১১৭-১৩৪**

৯.১ পাত্র সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির নানা দিক

Dhaka University Institutional Repository

৯.২ পরিবারের ধরন

৯.৩ জন্ম ও আচার-অনুষ্ঠান

৯.৪ গৃহনির্মাণ

৯.৫ বিয়ে ও বিয়ে ব্যবস্থা

৯.৬ গোত্র বিভাজন

৯.৭ খাদ্যাভ্যাস ও পানীয়

৯.৮ ধর্ম বিশ্বাস ও রীতিনীতি

৯.৮.১ ধর্ম ও যাদুবিদ্যা

৯.৮.২ ধর্ম ও বিশ্বাস

৯.৯ পূজা-পার্বণ

৯.১০ মৃতের সৎকার

৯.১০.১ শ্মশানে নেওয়ার রীতি

৯.১০.২ মৃতদেহ দাহ করা

৯.১০.৩ শ্রাদ্ধ প্রক্রিয়া

৯.১১ পাত্রদের পোশাক

৯.১২ সামাজিক বিধি-নিষেধ

৯.১২.১ ধর্মীয় ক্ষেত্রে

৯.১২.২ বিয়ের ক্ষেত্রে

৯.১২.৩ খাদ্যের ক্ষেত্রে

৯.১২.৪ জন্ম ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে

৯.১২.৫ শিশুর ক্ষেত্রে

৯.১২.৬ কাজের ক্ষেত্রে

৯.১২.৭ সামাজিক ক্ষেত্রে

৯.১৩ অর্থনৈতিক অবস্থা ও পেশা

৯.১৪ উপসংহার

১০. দশম অধ্যায়

পাত্র শব্দভাণ্ডার: সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ **১৩৫-১৫৩**

১০.১ সামাজিক সৌজন্যবোধ (social greetings) নির্দেশক শব্দ

১০.২ গোত্র বিভাজন সংক্রান্ত শব্দ

১০.৩ জ্ঞাতিগোষ্ঠি সংক্রান্ত শব্দ

১০.৪ বিয়ে সংক্রান্ত শব্দ

১০.৪.১ পাত্র-পাত্রী নির্বাচন সংক্রান্ত শব্দ

১০.৪.২ বিয়ের প্রকার নির্দেশক শব্দ

Dhaka University Institutional Repository

১০.৪.৩ বিয়ে সম্পাদন সংক্রান্ত শব্দ
১০.৪.৪ বিয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান সংক্রান্ত শব্দ
১০.৪.৫ বিয়ের উপহার সংক্রান্ত শব্দ
১০.৫ গৃহনির্মাণ সংক্রান্ত শব্দ
১০.৬ খাদ্যাভ্যাস ও পানীয় সংক্রান্ত শব্দ
১০.৭ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সংক্রান্ত শব্দ
১০.৭.১ পূজা সংক্রান্ত শব্দ
১০.৭.২ সামাজিক অনুষ্ঠান সংক্রান্ত শব্দ
১০.৭.২.১ শিকার শব্দ
১০.৭.২.২ তিল সংরাইন অনুষ্ঠান
১০.৭.২.৩ মাখাই বা বঘাই সেবা উৎসব
১০.৭.২.৪ মৃতের সৎকার সংক্রান্ত শব্দ
১০.৮ সামাজিক বিধি-নিষেধ সংক্রান্ত শব্দ
১০.৮.১ বিয়ের বিধি-নিষেধ সংক্রান্ত শব্দ
১০.৯ অপভাষা (slang) সংক্রান্ত শব্দ
১০.৯.১ গালি সংক্রান্ত শব্দ
১০.৯.২ বিবাদ সংক্রান্ত শব্দ
১০.১০ পাত্র ভাষার শব্দভাণ্ডারে কোড মিশ্রণ
১০.১০.১ শব্দ পর্যায় কোড মিশ্রণ
১০.১০.২ বাক্য পর্যায় কোড মিশ্রণ
১০.১১ উপসংহার

১১. একাদশ অধ্যায়
পাত্র ভাষার সংস্কৃতিঃ লোকসাহিত্যিক প্রতিফলন **১৫৪-১৬২**
১১.১ লোক-সঙ্গীত (folk-songs)
১১.১.১ জাতীয় সঙ্গীত
১১.১.২ দেশাত্ববোধক গান
১১.১.৩ ভালোবাসা সঙ্গীত
১১.১.৪ ভালোবাসা সঙ্গীত
১১.১.৫ অভিব্যক্তি প্রকাশক সঙ্গীত
১১.১.৬ বিরহ সঙ্গীত
১১:১.৭ প্রার্থনা সঙ্গীত
১১.১.৮ নৃত্য গান

১১.২ ছড়া (rhyme)
১১.৩ ধাঁধা (riddles)
১১.৪ বাগধারা (idioms)
১১.৫ প্রবাদ (proverbs)
১১.৬ লোককাহিনী (folktale)
১১.৭ মিথ (myth)
১১.৮ কথোপকথন (dialouge)
১১.৯ উপসংহার

১২. দ্বাদশ অধ্যায়

পাত্র সম্প্রদায় উন্নয়নে সুপারিশমালা **১৬৩-১৭৩**

গ্রন্থপঞ্জি **১৭৪-১৮১**

পরিশিষ্ট **১৮২-২২২**

সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে বাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি হলো পাত্র। তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যবাহী ভাষা রয়েছে। পাত্র সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ হয়নি। তাই আমি পাত্রদের ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক এই অভিসন্দর্ভে উপস্থাপন করেছি। বারোটি অধ্যায় সংবলিত এই গবেষণাকর্মটিতে আমি পাত্র সম্প্রদায়ের অনেক নতুন দিক উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছি। আশা রাখছি, এ অভিসন্দর্ভটি পাত্র সম্প্রদায় সম্পর্কে আগ্রহী গবেষক, ভাষাবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানীদের উপকারে আসবে।

অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে পাত্র সম্প্রদায় সম্পর্কে একটি ভূমিকা উপস্থাপন করেছি। এ অধ্যায়ে গবেষণার উদ্দেশ্য, পরিধি, সময়ের ব্যাপ্তি, অধ্যায় বিভাজন ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি পাত্রদের পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করেছি। পাঠক যাতে সহজেই পাত্র জনগোষ্ঠি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারেন, এ উদ্দেশ্যেই এই অধ্যায় রচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে সাহিত্য সমীক্ষা বা লিটারেচার রিভিউ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণাকর্মে সংশ্লিষ্ট যেসব দ্বৈতীয়িক উৎস ব্যবহৃত হয়েছে; বিশেষ করে যেসব পুস্তক, প্রবন্ধ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রকাশিত হয়েছে সেসবের উল্লেখ করা হয়েছে এ অধ্যায়ে। স্মর্তব্য যে, সিলেটে পাত্র সম্প্রদায়ের বসবাসের প্রারম্ভিক পর্যায় থেকে বর্তমান অবধি অনেক গবেষক, ভাষাবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, ভাষাগেবষক তাঁদের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির আদ্যোপ্রান্ত উন্মোচনে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁদের লেখায় পাত্রদের সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। এসব রচনার মধ্য দিয়ে পাত্রদের জীবন, সংস্কৃতি ও ভাষা সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। এছাড়া এসব রচনায় অনুপুঙ্খভাবে পাত্রদের নামকরণ, ধর্ম, পেশা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, ভাষা, বসবাসের স্থান, আর্থ-সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

আমি অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি 'নৃভাষাবিজ্ঞান: তাত্ত্বিক বিবেচনা'। এখানে নৃবিজ্ঞান ও ভাষাবিজ্ঞানের সমন্বিত শাস্ত্র *নৃভাষাবিজ্ঞানের* সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, ইতিহাস প্রভৃতি আলোচনা করা হয়েছে।

মানুষ যেদিন থেকে পৃথিবীতে এসেছে সেদিন থেকেই তার সংস্কৃতি চর্চা শুরু হয়েছে। তবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংস্কৃতি পঠন, পাঠন বা চর্চা অনেক পরে শুরু হয়েছে। কারণ ভাষা ও নৃবিজ্ঞান কেন্দ্রিক আলোচনায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা লক্ষ করা যায় গত কয়েক শ বছর ধরে। আরও যথাযথভাবে বললে, এ ধরনের চর্চার কাল উনিশ শতকের শেষ অবধি কিংবা বিশ শতকের শুরুতে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের

Dhaka University Institutional Repository

অধিকাংশ প্রায়োগিক শাখার উদ্ভব ও বিকাশ বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। কাজেই এ সময়ে নৃভাষাবিজ্ঞান বিকাশ লাভ করেছে-এমন তথ্য উপাত্তই আমাদের কাছে সুলভ। অভিসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে আমি "নৃভাষাবিজ্ঞান চর্চা: প্রাচীনকাল ও বর্তমান বাংলাদেশ" নামক অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। এ আলোচনায় প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কিভাবে নৃভাষাবিজ্ঞানের চর্চা হয়ে আসছে তার প্রেক্ষাপট নির্মাণের চেষ্টা করা হয়েছে। এই ইতিহাস বিনির্মাণে ভাষাবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী, গবেষক ও অনুসন্ধিৎসুদের গবেষণাকর্মের বিভিন্ন দিক অবতারণা করেছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি 'পাত্র সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়'। কোনো আদিবাসী বা সম্প্রদায় সম্পর্কে অবগত হতে হলে তার ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানলাভ অত্যন্ত প্রয়োজন। কেননা প্রত্যেক সম্প্রদায় বা জাতি-গোষ্ঠির ইতিহাস স্বতন্ত্র। সিলেটের পাত্র সম্প্রদায়েরও আলাদা একটি ইতিহাস রয়েছে। পাত্ররা রাজা গৌড় গৌবিন্দের উত্তরসূরী বলে প্রচার করে থাকেন। তাঁদের এই দাবি কতটা যুক্তিযুক্ত তা নিয়ে সংশয় থাকতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ গবেষকই পাত্র জাতির আলোচনায় এই ইতিহাসটি উল্লেখ করেছেন। কেবল তাই নয়, এই ইতিহাস উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁরা রাজা গৌড় গোবিন্দের সঙ্গে হজরত শাহজালাল-এর অলৌকিক যুদ্ধের বর্ণনাও দিয়েছেন। আমি বিভিন্ন গবেষকদের মতামত উল্লেখ করে এ প্রবন্ধে পাত্রদের মিথগাঁথা ইতিহাস বিনির্মাণে প্রয়াসী হয়েছি।

সপ্তম অধ্যায়ে 'গবেষণা পদ্ধতি' বিষয়ে আলোকপাত করেছি। গবেষণার একটি নিয়ম বা পদ্ধতি রয়েছে; সব পদ্ধতিই সব গবেষণার জন্য প্রযোজ্য নয়। গবেষণার বিষয় অনুসারে আমি আমার গবেষণার পদ্ধতি নির্ধারণ করেছি। এ অধ্যায় লিখতে গিয়ে প্রথমেই আমি গবেষণা পরিকল্পনা স্থির করেছি।

অষ্টম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি 'পাত্র ভাষা বিশ্লেষণ'। ভাষা মানুষের জৈবিক ও মানবিক অধিকার। ভাষার সাহায্যেই মানুষ একে অপরের সঙ্গে সংজ্ঞাপন করে থাকে। আদিকাল থেকে বর্তমান অবধি মানুষ ভাষার রহস্য উন্মোচনে নিবিষ্ট হয়েছেন। পাত্রদের ভাষা নিয়েও ভাষাগবেষকদের কৌতূহলের অন্ত নেই। এ অধ্যায়ে পাত্র ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, বাক্যতাত্ত্বিক ও অর্থতাত্ত্বিক রূপটি বিশ্লেষণ করেছি।

পৃথিবীতে বাসকারী প্রত্যেক জাতির সমৃদ্ধ সংস্কৃতি রয়েছে। এই সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যই জাতিকে তার আপন পরিচয়ে উদ্ভাসিত করে। বাংলাদেশের সিলেটে বাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি পাত্রদের আলাদা সমাজ ও সংস্কৃতি বিদ্যমান। সেই সংস্কৃতি অন্বেষণ করতে গিয়ে আমি নবম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি 'পাত্র সংস্কৃতির নানা দিক'।

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে 'পাত্র শব্দভাণ্ডার: সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ'। উল্লেখ্য যে, ভাষার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে শব্দ একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শব্দের সাহায্যে বাক্য গঠন করে আমরা সংজ্ঞাপন করে থাকি। ধ্বনি সমবায়ে গঠিত শব্দের অর্থব্যাপকতাই ভাষার প্রাণ। প্রত্যেক ভাষার শব্দভাণ্ডার ভাষাকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যে প্রাণবন্ত করে তোলে। এই শব্দভাণ্ডার প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব সম্পদ। শব্দের যেমন বৈচিত্র্য রয়েছে, তেমনি এর ব্যবহারের ক্ষেত্র বা প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। কারণ প্রত্যেক ভাষায় শব্দ ব্যবহারের সঙ্গে প্রসঙ্গের একটি ভূমিকা থাকে। কেননা একজন ভাষীর শব্দ ব্যবহারের সঙ্গে ঐ ভাষাসমাজের মূল্যবোধ, আদর্শ, প্রথা, বিশ্বাস, রীতি-নীতি, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদির সম্পর্ক বিদ্যমান। মানুষের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে সংস্কৃতির ছায়াপাত নেই। ভাষার শব্দ ব্যবহারের সঙ্গে তাই সংস্কৃতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। ভাষা যেমন সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে, তেমনি সংস্কৃতি দ্বারাও ভাষা প্রভাবিত হয়। পাত্র ভাষার শব্দভাণ্ডারে পাত্রসমাজের সংস্কৃতির নানা অনুষঙ্গ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। পাত্রদের জীবনাচারণ, সামাজিক সৌজন্যবোধ, গোত্র বিভাজন, জ্ঞাতিগোষ্ঠি, বিয়ে, গৃহনির্মাণ, খাদ্যাভ্যাস ও পানীয়, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, মৃতের সৎকার প্রভৃতি কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত শব্দ ও তার সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এ অধ্যায়ে।

একাদশ অধ্যায়ে আলোকপাত করেছি পাত্রদের লোকসাহিত্য নিয়ে। এ আলোচনায় প্রতিভাত হয়েছে যে, পাত্র লোকসাহিত্য বেশ সমৃদ্ধ এবং পাত্রদের প্রাত্যহিক জীবন থেকে শুরু করে জীবনের সার্বিক পরিমণ্ডলে এর প্রভাব বিদ্যমান। এসব সাহিত্য পাত্র ভাষার নিজস্ব সম্পদ হিসেবে পরিগণিত। পাত্র ভাষার সাহিত্যের সাবলীল বিকাশের প্রয়োজনে মৌখিক চর্চার পাশাপাশি লিখিত রূপের নিদর্শনের ব্যবস্থা এখন অত্যাবশ্যক।

'পাত্র সম্প্রদায় উন্নয়নে সুপারিশমালা'-নামক দ্বাদশ অধ্যায়ে ক্রমক্ষয়িষ্ণু পাত্র সম্প্রদায়কে কীভাবে উন্নতি করা যায় তার কিছু প্রস্তাব প্রদান করা হয়েছে। আমরা জানি, সিলেটে বাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি পাত্ররা শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, নিরাপত্তা ইত্যাদি মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। কাজেই পাত্রদেরকে মূলস্রোতের জনগণের ন্যায় উন্নতি করতে হলে বিশেষ সুযোগ সুবিধা ব্যতিরেকে তা সম্ভব নয়। ভাষার প্রতি বর্তমান প্রজন্মের আগ্রহ দিনের পর দিন কমে যাচ্ছে। এ ধারা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে পাত্র সংস্কৃতি ও ভাষা মৃত্যুমুখে পতিত হবে। সবদিক মিলিয়ে এ অধ্যায়ে যে সুপারিশ করা হয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

সংস্কৃতি মানুষের সার্বিক জীবনব্যবস্থা বলে মানব জীবনের প্রতিটি স্তরে এর উপস্থিতি বিদ্যমান। তাই বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতির যেকোনো দিক মানুষের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রতিফলনের মধ্য দিয়েই মানুষের নিরন্তর জীবনব্যবস্থা পরিচালিত হতে থাকে। মানুষের দৈনন্দিন জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রতিটি স্তরে সংস্কৃতির সংশ্লিষ্ট উপাদানের ভূমিকা বিদ্যমান। মানুষ তাঁর সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, ভালোলাগা, ভালোবাসা, মনের সাহিত্যিক চিন্তা প্রভৃতির প্রকাশ ঘটায় এই সংস্কৃতির মাধ্যমে। ভাষাই সংস্কৃতি প্রকাশের পূর্বশর্ত। ভাষা ব্যতিরেকে সংস্কৃতি প্রকাশ সম্ভব নয়। ভাষা তাই সংস্কৃতির অন্যতম বাহন হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। সংস্কৃতি প্রকাশে ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। ভাষাজ্ঞান আয়ত্তের মধ্য দিয়েই সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব। তাই সংস্কৃতির স্বরূপ অন্বেষণে ভাষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। অন্যভাবে বলা যায়, সাংস্কৃতিক গবেষণার অন্যতম সোপান ভাষাকে জানা ও বোঝার মধ্য দিয়েই কোনো সংস্কৃতি সম্পর্কে অবগত হতে হয় (মল্লিক, ২০০২)।

১.১ গবেষণার বিষয় শনাক্তকরণ

বাংলাদেশ বহু ভাষা ও সংস্কৃতির দেশ। এদেশে বাঙালি ছাড়াও ৪৫টির অধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি বাস করেন (চাকমা ও চাকমা, ২০১৫)। এসব জনগোষ্ঠি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ভীত নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁরা বাংলাদেশে উপজাতি, আদিবাসী, পাহাড়ি, জুম্মা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা প্রভৃতি নামে অভিহিত। তাঁরা অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা ভূ-খণ্ডে বাস করে আসছেন। এ সম্পর্কে তরু (২০০৮: ৬৪) বলেছেন,

> উপজাতি বা ক্ষুদ্র জাতিসত্তা কিংবা আদিবাসী যে অভিধায় অভিহিত করি না কেন বাংলাদেশের একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে আদিবাসীদের বসবাস। সারা দেশ জুড়েই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে আদিবাসীরা যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় বসবাস করে আসছে। এই আদিবাসীদের বৃহৎ অংশই মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠির মানুষ। পাশাপাশি ভেড্ডিড দ্রাবিড়ীয় বা অস্ট্রোলয়েড নরগোষ্ঠির সঙ্কর আদিবাসী এরা ভিন্ন ভাষাভাষি। এদের জীবনধারা, সংস্কৃতি ও আচার-আচরণ ভিন্ন ভিন্ন হলেও মনোভাবের দিক থেকে এরা সহজ সরল জীবন যাপন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

এসব নৃ-গোষ্ঠি বাংলাদেশের রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, সিলেট, রাজশাহী, ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে বাস করেন। বাংলাদেশে বাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির অধিকাংশই মঙ্গোলীয় নৃ-গোষ্ঠিভুক্ত। চাকমা ও চাকমা (২০১৫: ২৪) এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

> আদিবাসী জাতির মধ্যে অধিকাংশ জাতি মঙ্গোলীয় মহাজাতিভুক্ত জনগোষ্ঠী। পাবর্ত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল (রাঙামাটি-খাগড়াছড়ি-বান্দরবান), মধ্য-উত্তর অঞ্চল (বৃহত্তর ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল), উত্তর-পূর্ব অঞ্চল (বৃহত্তর সিলেট) এবং উপকূল অঞ্চলে (চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-পটুয়াখালী-বরগুনা) বাসকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহ এ মহাজাতিভুক্ত।

এসব নৃ-গোষ্ঠির আলাদা ভাষা রয়েছে। রয়েছে বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। এসব জাতিগোষ্ঠির সম্মিলনেই বাংলাদেশের সংস্কৃতির সার্বিক ধারা অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় সিলেটে রয়েছে উর্বর সংস্কৃতি। এ অঞ্চলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠির বাস সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য প্রদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তাই সিলেট হয়ে ওঠেছে বহু সংস্কৃতির মিলনমেলার কেন্দ্রভূমি। মণিপুরি, খাসিয়া, পাত্র প্রভৃতি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি বাস করেন সিলেটে।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি পাত্র সম্প্রদায় দীর্ঘদিন যাবৎ সিলেট সদরের খাদিমনগর এলাকায় বাস করে আসছেন। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত থেকে বলা যায় যে, প্রায় ছয়শত বছর ধরে সিলেটের অরণ্য বা পাহাড়-পর্বত-টিলার উঁচু জায়গায় তাঁদের আবাসভূমি গড়ে ওঠেছে। তাঁরা রাজা গৌড় গোবিন্দের উত্তরসূরী বলে প্রচার করেন। সিকদার (২০১২: ২১৩) পাত্রদের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে-

> বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের অন্যতম হল পাত্র। সিলেট জেলার সদর ও গোয়াইনঘাট থানাদ্বয়ের অন্তভুক্ত ২৩টি গ্রামে প্রায় ৪০২টি পরিবারের ২,০৩৩ জন পাত্র সম্প্রদায়ের। কারও কারও মতে, এদের সংখ্যা পাঁচ-ছয় হাজার হবে। তবে এ বিষয়ে সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। পাত্ররা নিজেদের ভাষার নাম লালং বলে এবং নিজেদের লালং জাতি হিসাবে পরিচয় দিয়ে থাকে। এদের ভাষার সঙ্গে গারোদের ভাষার মিল লক্ষ করা যায়। সিলেটে বসবাসকারী নৃ-গোষ্ঠী পাত্রদের আলাদা সমাজ সংস্কৃতি ও ভাষা থাকলেও সে ভাষার কোনো বর্ণমালা নেই। নৃ-গোষ্ঠী পাত্ররা বোড়ো জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন।

পাত্রদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি থাকলেও তাঁরা এই সংস্কৃতি বর্তমানে সঠিকভাবে চর্চা করতে পারছেন না। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে পাত্ররা পূর্বসূরীদের সংস্কৃতি অনুশীলনে ব্যর্থ হচ্ছেন। তারপরও অনেক পাত্রই ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি প্রকাশ ও বিকাশে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আবার

Dhaka University Institutional Repository

অনেকেই বাধ্য হয়েই নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চা থেকে বিরত থাকছেন। ফলে তাঁদের মধ্যে মিশ্র সংস্কৃতি লক্ষ করা যায়।

বর্তমানে অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের মত পাত্রদের জীবনও নানা সমস্যায় জর্জরিত। পাত্র এলাকায় অন্যান্য জনগোষ্ঠির বসতি স্থাপনের ফলে পাত্ররা নিজেদের সম্পত্তি হারিয়েছেন। ফলে তাঁরা বন থেকে কাঠ আহরণ ও তা দিয়ে কয়লা বানিয়ে বিক্রি করার যে পেশা যুগের পর যুগ অব্যাহত রেখেছিলেন, সেই পেশা আজ আর চালিয়ে যেতে পারছেন না। ফলে তাঁরা পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছেন। এভাবে তাঁরা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির অনেক কিছুই চর্চা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। নিজস্ব ভাষা থাকলেও লিখিত রূপ নেই বলে এ ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। হোসেন (২০০৯: ১২৫) পাত্রভাষার বর্তমান চিত্র তুলে ধরেছেন এভাবে-

> এই সম্প্রদায়ের নিজস্ব ভাষা রয়েছে। নিজ সম্প্রদায়ের মানুষদের সাথে কথা বলার সময় তারা এই ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। স্থানীয়দের মতে, হযরত শাহজালাল এর আগমনের পূর্বে এই অঞ্চলের রাজা গৌরগোবিন্দের এই ভাষা ছিল। তখন এই ভাষাতেই এ অঞ্চলের প্রশাসনিকসহ যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হত। কিন্তু পরবর্তীতে মুসলিম শাসন এবং তারপর ব্রিটিশ আমলে ভাষাটির ব্যবহার রহিত হয়ে যায়। বর্তমানে এই ভাষার লিখিত রূপও পাওয়া যায় না বলে উল্লেখ করেন স্থানীয় পাত্ররা।

উপরিউক্ত বর্ণনার আলোকে, সিলেটের পাত্র জনগোষ্ঠির প্রায় বিলীয়মান ভাষা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক নির্ধারণের পাশাপাশি উক্ত ভাষাটিকে নথিবদ্ধকরণের উদ্দেশে এই জনগোষ্ঠির সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান বিশ্লেষণ ও এদের ভাষার সাংগঠনিক বর্ণনা ও ব্যাখ্যা প্রদানকল্পে উল্লেখিত পিএইডি গবেষণাকর্ম স্থিরকৃত হয়েছে।

তাই বর্তমান অভিসন্দর্ভের শিরোনাম হলো ''বাংলাদেশে পাত্র সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি: একটি নৃ-ভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ (The language and culture of Patro community of Bangladesh: An anthropo linguistic analysis)''। আলোচ্য গবেষণায় পাত্র সংস্কৃতি ও ভাষার বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়েছে। বারোটি অধ্যায় সংবলিত এ অভিসন্দর্ভে পাত্র নৃ-গোষ্ঠির বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। মাঠ গবেষণা ও অন্যান্য উৎস থেকে তথ্য-উপাত্ত আহরণ করে অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন হয়েছে। পাত্র সংস্কৃতির সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবণাচারের বিষয়টিও প্রতিফলিত হয়েছে আলোচ্য অভিসন্দর্ভে।

Dhaka University Institutional Repository

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য (purpose)

বাংলাদেশে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ভাষীর লোক বাস করেন। আবহমান কাল থেকে এদেশে তাঁদের উপস্থিতি আমাদের দেশকে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে। এ বৈচিত্র্য দেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিনির্মাণেও অপরিহার্য। বাঙালির পাশাপাশি বাংলাদেশে যেসব ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি বাস করেন, তাঁদের সংস্কৃতির স্বরূপ নির্ণয় করা একান্ত প্রয়োজন।

বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় সিলেটে রয়েছে বহু ভাষী ও সংস্কৃতির জনগোষ্ঠি। তাঁদের রয়েছে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি। এসব জনগোষ্ঠির মধ্যে পাত্র সম্প্রদায় একটি। প্রাত্যহিক জীবনে তাঁরা স্ব-সংস্কৃতির চর্চা করে থাকেন। বাংলাদেশের আদিবাসীদের নিয়ে বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি উদ্যোগে নানা পদক্ষেপ গৃহীত হলেও পাত্রদের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে তেমন কোন কাজ হয়নি। পাত্র ভাষার উদ্ভব ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সংবলিত আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণাকর্মও অনুপস্থিত। এমনকি জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন তাঁর *Linguistic survey of India* গ্রন্থে আসামী, বাংলা, উড়িয়া ইত্যাদি ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করলেও (Grierson, 1903: volume, page-2) পাত্র ভাষা সেখানে অনুপস্থিত। অথচ পাত্রদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি বিদ্যমান। এ কথার সমর্থন অন্যত্রও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, 'In their own language, patras call their tribe laleng (Islam, 2003: volume 8, p.10). 'জাতিগত ভাবে পাত্ররা 'বেডো' জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করে থাকেন' (বিশ্বাস ও আসাদুজ্জামান, ২০০৬: ১৩১)। মোহান্ত (১৯৯৮: ৫৮) বলেছেন, 'জাতিগতভাবে অল্পপরিচিত পাত্রেরা বোডো জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে পন্ডিতেরা অনুমান করে থাকেন। তাদের নিজস্ব ভাষা থাকলেও বর্ণমালা নেই'। পাত্র ভাষা সম্পর্কিত ভাষাবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীদের উপরিউক্ত মূল্যায়নসমূহ বিবেচনায় রেখে বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে আদিবাসী পাত্র সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতির নানা দিক অনুপুঙ্খভাবে উপস্থাপন করা তথা পাত্র ভাষার স্বরূপ উন্মোচন করে এর ভাষাতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করা। আমাদের জানামতে, উপরিউক্ত শিরোনামে এ ধরনের গবেষণাকর্ম ইতঃপূর্বে সম্পাদিত হয়নি। সুতরাং এ বিষয়ক গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব রয়েছে।

১.৩ গবেষণার পরিধি (scope)

সিলেটের আদিবাসী পাত্র সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের নৃ-ভাষাবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করাই হলো এই অভিসন্দর্ভের মূল আলোচ্য বিষয়। এ আলোচনায় পাত্র সংস্কৃতির সার্বিক দিক প্রতিফলিত হয়েছে। সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে ভাষাব্যবহারের সম্পর্কও দেখানো হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

এখানে। সংস্কৃতি যেমন ভাষাকে প্রভাবিত করে, তেমনি আবার ভাষা দ্বারাও সংস্কৃতি প্রভাবিত হয়। তাই পাত্র শব্দভাণ্ডারে সংস্কৃতির প্রভাব কেমন তা পর্যালোচনা করার অবকাশ আছে আলোচ্য অভিসন্দর্ভে। এছাড়া সাহিত্যের বিভিন্ন অনুষঙ্গ পাত্র সংস্কৃতিকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। পাত্র সংস্কৃতিতে সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণের বিষয়টিও এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সবকিছু মিলে পাত্র সংস্কৃতির নানামাত্রিক আলোচনা স্থান পেয়েছে বর্তমান গবেষণায়।

১.৪ গবেষণা প্রশ্ন

এই অভিসন্দর্ভের গবেষণা প্রশ্ন হচ্ছে-

ক. পাত্রভাষীদের ব্যবহৃত ভাষার ভাষিক উপাদানের অন্তর্নিহিত স্বরূপটি কী?

খ. পাত্রভাষীদের ব্যবহৃত ভাষার ভাষিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানের মিথস্ক্রিয়াটিকে কিভাবে বিশ্লেষণ করা যায়?

এ অভিসন্দর্ভে গবেষণা প্রশ্নের উত্তরকল্পে পাত্রভাষার বিভিন্ন উপাদান যেমন, ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্বের বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। আবার নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে পাত্র সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান অর্থাৎ বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত হয়েছে। পাত্র ভাষীদের ব্যবহৃত ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতি প্রকাশের বিষয়টি আবশ্যিকভাবেই সংশ্লিষ্ট হয়েছে এই আলোচনায়। কাজেই গবেষণা প্রশ্ন এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

১.৫ অভিসন্দর্ভ- গঠন পরিকল্পনা (The proposed structure)

যেকোনো গবেষণাকর্মের গঠন পরিকল্পনা বা অধ্যায় বিভাজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি গবেষণার জন্য নিম্নলিখিত পাঠ পরিকল্পনা স্থির করেছি–

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা

দ্বিতীয় অধ্যায়: পাত্র জনগোষ্ঠির পরিচয়

তৃতীয় অধ্যায়: সাহিত্য সমীক্ষা বা লিটারেচার রিভিউ

চতুর্থ অধ্যায়: নৃভাষাবিজ্ঞান: তাত্ত্বিক বিবেচনা

পঞ্চম অধ্যায়: নৃভাষাবিজ্ঞান চর্চা: প্রাচীনকাল ও বর্তমান বাংলাদেশ

ষষ্ঠ অধ্যায়: পাত্র সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

সপ্তম অধ্যায়: গবেষণা পদ্ধতি

অষ্টম অধ্যায়: পাত্র ভাষা বিশ্লেষণ

নবম অধ্যায়: পাত্র সংস্কৃতির নানা দিক

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায়: পাত্র শব্দভাণ্ডার: সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ

একাদশ অধ্যায়: পাত্র ভাষার সংস্কৃতি: লোকসাহিত্যিক প্রতিফলন

দ্বাদশ অধ্যায়: পাত্র সম্প্রদায় উন্নয়নে সুপারিশমালা

উপর্যুক্ত বারোটি অধ্যায়ের মাধ্যমে পাত্র ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক আলোচনার প্রয়াস আছে এই অভিসন্দর্ভে। এখানে প্রতিটি অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয় বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণার শিরোনামকে সংশ্লিষ্ট করে এসব অধ্যায় বিন্যস্ত হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক অন্বেষণ যথোপযুক্ত করার লক্ষে এতে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো অধ্যায়ের আলোচনা সুসংহত করা জন্য সংশ্লিষ্ট ছবি ও তথ্যসূত্র উপস্থাপন দেওয়া হয়েছে। সবকিছু মিলে বারোটি অধ্যায়ে পাত্র ভাষা ও সংস্কৃতি নৃ-বৈজ্ঞানিক ও ভাষাবৈজ্ঞানিক আলোচনা প্রতিফলিত হয়েছে।

১.৬ গবেষণার আনুমানিক সময়-পরিধি (Expected research timeframe)

এই গবেষণাকর্মটি আনুমানিক ৩ বছরের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে বলে প্রথমে প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে মাঠ গবেষণায় তথ্য আহরণের প্রয়োজনে আরও দুই বছর বৃদ্ধি করে মোট পাঁচ বছরে গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করা হয়েছে।

১.৭ উপসংহার

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি পাত্র সিলেটে দীর্ঘদিন যাবৎ বাস করে আসছেন। তাঁরা সিলেটের তথা বাংলাদেশের সংস্কৃতি বিকাশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সিলেটের সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতির ক্ষেত্রে পাত্রদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বর্তমানে তাঁরা নানামুখি সমস্যায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই নিজস্ব সংস্কৃতি প্রকাশ করতে তাঁরা ব্যর্থ হচ্ছেন। সংস্কৃতির গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়ার মধ্যে পাত্র সংস্কৃতি বর্তমানে মিশ্র সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। তবুও পাত্ররা নিজেদের সংস্কৃতির চর্চা চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। অভিসন্দর্ভে পাত্র সংস্কৃতি ও ভাষার নৃ-বৈজ্ঞানিক ও ভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ প্রতিফলিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাত্র জনগোষ্ঠির পরিচয়

বাংলা একটি প্রাচীন জনপদের নাম। এই ভূ-খণ্ড প্রাচীনকালে বঙ্গ, বরেন্দ্র, সমতট, হরিকেল, রাঢ় প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত ছিল। এসব জনপদে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও চীনা-তিব্বতি-বর্মি জাতির মানুষ বাস করতেন। সে বিবেচনায় অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে বাস করছেন বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মানুষ। কেননা, বাংলাদেশে বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও অনেক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির বসবাস এই অঞ্চলে বাস করে (চৌধুরী, ২০১২)। 'সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট আদিবাসী জনসংখ্যা হচ্ছে ১২,০৫৯৭৮ জন যা দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ১.০৩ ভাগ' (কামাল, ২০০৭: xxii)। বাঙালির পাশাপাশি এসব জাতি-গোষ্ঠির স্বতন্ত্র সংস্কৃতি বাংলাদেশকে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে। আমাদের দেশে এসব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির সংখ্যা বর্তমানে ৭৩ (কামাল, ২০১৫)। কিন্তু বাংলাদেশে বাসরত বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ নৃতাত্ত্বিক গবেষণা হয়নি বলে তাঁদের ভাষা ও সংস্কৃতির অনেক তথ্যই অজ্ঞাত রয়েছে; এমনকি বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির সংখ্যা কত-এ নিয়েও ভাষাবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের মতানৈক্য লক্ষণীয়। চৌধুরী (২০১২: ২১) উল্লেখ করেছেন, 'পিটার বার্টেচি (১৯৮৪) এদের সংখ্যা ১২ বলে উল্লেখ করেছেন। এ জি সামাদ (১৯৮৪) ১৫ বলে উল্লেখ করেছেন। ১৯৯১ সালের সেন্সাসে এদের সংখ্যা ২৯ বলে উল্লেখ আছে'। এক্ষেত্রে সিকদার (২০১৩: ৩৩) বলেছেন-

> বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সঠিক সংখ্যা কত?- এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় না। এমনকি সরকারি জনগণনার হিসাবেও এদের প্রকৃত জনসংখ্যার কোনো চিত্র নেই। ১৯৯১ সালের জনগণনার হিসাবে ২৯টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নাম উল্লেখসহ মোট জনসংখ্যা দেখানো হয়েছে ১২,০৫৯৭৮। এটি নিঃসন্দেহে পূর্ণাঙ্গ তথ্য নয়। ২০১১ সালের জনগণনার হিসাবে ২৭টি আদিবাসীর নাম দেখানো হয়েছে। জনসংখ্যা প্রায় ১৮ লক্ষ। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ নামক ভূ-খণ্ডে এই সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ। অন্যদিকে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম প্রকাশিত স্মরণিকায় (২০০৮) ৪৫টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন গবেষকের মতে এই সংখ্যা প্রায় ৮০।

বাংলাদেশে এশিয়াটিক সোসাইটির *আদিবাসী জনগোষ্ঠী* গ্রন্থেও ৪৫টি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠির উল্লেখ আছে (কামাল ও অন্যান্য, ২০০৭)।

বাঙালির নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয় উদঘাটন করতে গিয়ে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ জনধারা বা সাংস্কৃতিক প্রভাবের উল্লেখ করা যায়– 'ক) মঙ্গোলীয়-চায়নিজ প্রবাহ খ) প্রটো-অস্ট্রোলয়েড বা ভেড্ডিড বা অস্টিক জনধারা এবং গ) দ্রাবিড় ভাষাভাষী বা ভূমধ্যীয় বা মেডিটেনেরিয়ান নৃজাতি রূপের প্রবাহ' (সুর, ১৯৭৯: ৪২)।

Dhaka University Institutional Repository

এসব উপাত্ত থেকে সহজেই প্রতিভাত হয় যে, অতি প্রাচীনকাল থেকে বাংলা ভূ-খণ্ডে বাস করে আসছেন বিভিন্ন জনগোষ্ঠি এবং তাঁদের প্রত্যেকের রয়েছে ঐতিহ্যবাহী মাতৃভাষা। বর্তমানে আমাদের দেশে চারটি পরিবারের (ইন্দো-ইউরোপীয়, দ্রাবিড়, অস্ট্রো-এশিয়াটিক, চীনা-তিব্বতি বা তিব্বতি বর্মী) ভাষা প্রচলিত রয়েছে।

২.১ সিলেটের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পাত্র জনগোষ্ঠি

প্রাচীন বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় সিলেটে রয়েছে স্বতন্ত্র সংস্কৃতি। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে তা আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। কাশেম বলেছেন (২০০৭: ৯৯) 'বাংলাদেশের ছয়টি বিভাগের একটি হলো সিলেট বিভাগ। প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্যের পাশাপাশি আদিবাসীদের বসবাস এ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যি এনেছে'। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় সিলেটের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিদ্যমান। মানিক (২০০১: ২৭) এ প্রসঙ্গে বলেছেন–

> সিলেট অঞ্চলের সামাজিক রাজনৈতিক ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। সিলেট অদূর অতীতে বাংলা এবং আসামের সাথে যুক্ত বিযুক্ত হয়েছে। কিন্তু আসামের অন্তর্ভুক্ত হলেও পুরো আসামী হয়নি সিলেটের মানুষ। আবার বাংলার সাথে থেকেও জীবনাচার, মেজাজ ও মানসিকতায় বজায় রেখেছে বৈশিষ্ট্য। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন 'Sylhet is Bengal but with a difference'।

সিলেটের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি পাত্রদের কিংবদন্তি গাঁথা ইতিহাস রয়েছে। ইতিহাসটি এরকম- মধ্যযুগে তৎকালীন গৌড় রাজ্যের (বর্তমান সিলেট) রাজা ছিলেন গৌড় গৌবিন্দ। তিনি ছিলেন 'একাধারে যোদ্ধা, রণকুশলী ও যাদুবিদ্যায় পারদর্শি' (খাঁ, ২০১৪: ২৩)। তাঁর রাজত্বকালে রাজ্যে বাস করতেন বুরহানউদ্দিন নামে একজন সুফি দরবেশ। তিনি মানত রক্ষার জন্য বা ছেলের আকিকা দেওয়ার জন্য গোপনে হিন্দুরাজ্যে হিন্দুদের দেবতা গরু কোরবানি করলেন। কিন্তু কাক বা চিল গরুর মাংশের একটি টুকরো রাজা গৌড় গোবিন্দের প্রাসাদে নিয়ে আসে। গো-হত্যা মহাপাপ ও অন্যায় বলে রাজা গৌড় গোবিন্দ অন্যায়কারীকে শাস্তিদানের জন্য খুঁজতে থাকেন। এ লক্ষে তিনি রাজ্যে ঘোষণা দেন অন্যায়কারীকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য পুরস্কার প্রদান করবেন। অবশেষে রাজা নিশ্চিত হন যে, বুরহানউদ্দিনই এই অন্যায় কাজটি করেছেন। তাই শাস্তিস্বরূপ রাজা বুরহানউদ্দিনের ডান হাত কেটে ফেলেন এবং তার ছেলেকে হত্যা করেন। বুরহানউদ্দিন রাজার এই জঘন্য কাজের বিচারের জন্য তৎকালীন দিল্লীর ও সোনারগাঁয়ের সুলতানের দ্বারস্থ হলেন। এ সময় ইয়েমেন থেকে আগত হযরত শাহজালার দিল্লীতেই অবস্থান করছিলেন; তিনি বুরহানউদ্দিনের এই বিষাদময় বর্ণনা শুনেন এবং মনে

Dhaka University Institutional Repository

মনে দয়াপরবশ হন। অতঃপর দিল্লীর ও সোনারগাঁয়ের সম্রাটগণের নির্দেশে সিপাহশালার নাছির উদ্দিন ও সিকান্দার গাজী প্রমুখের শত শত সৈন্যের মিলিত শক্তির সাথে হযরত শাহজালালের ৩৬০ ওলি ও যোদ্ধারা অংশগ্রহণ করেন। সিকান্দার গাজীর বাহিনী প্রথমে রাজা গৌড় গোবিন্দের বাহিনীর নিকট পরাজয় বরণ করেন। দ্বিতীয়বার যুদ্ধে সম্মিলিত মুসলিম বাহিনী অতি সহজেই বিজয় লাভ করে। পরাজয়ের পর হজরত শাহজালালের নিকট রাজা গৌড় গোবিন্দ প্রাণভিক্ষা চান। গৌড় গোবিন্দকে তিনি শর্ত দেন যে, রাজ্য ছেড়ে গেলেই তিনি প্রাণে রক্ষা পাবেন। বাধ্য হয়েই রাজা গৌড় গোবিন্দ গভীর অরণ্যের দিকে পলায়ন করেন। রাজাকে অনুসরণ করেন তার সতীর্থরা। একসময় রাজার অনুসারীরা তাঁকে না পেয়ে সিলেটের খাদিমনগরের বিভিন্ন টিলা বা পাহাড়ের উপর বসতি স্থাপন করেন। দীর্ঘদিন পাহাড়ে লুকিয়ে থাকার পর এসব জনগণ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয়, বিক্রয় ও অর্থ উপার্জনের নিমিত্তে জনসম্মুখে আসতে বাধ্য হন। জনগণের সঙ্গে দেখা হলে তাঁরা নিজেদেরকে লালেং বলে পরিচয় দেন। পাত্র ভাষায় লালেং শব্দের অর্থ পাথর। এ পাত্র সম্প্রদায় বিভিন্ন সময়ে লালেং, লালং, লালুং, পাতর, গোয়ার গোবিন্দি, গুরু গোবিন্দি ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়েছে। অধিকাংশ গবেষক তাঁদেরকে লালেং, পাত্র নামে চিহ্নিত করেছেন। তবে পাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় শব্দ হচ্ছে পাত্র। তাঁদের নামের শেষে তাই পাত্র শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। পাত্ররা বর্তমানে রাজা গৌড় গোবিন্দের বংশধর পরিচয় দিতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।

বাংলাদেশে সিলেটে বাসকারী পাত্রদের যেমন ইতিহাস রয়েছে তেমনি রয়েছে তাঁদের বর্ণাঢ্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। তাঁদের বস্তুগত সংস্কৃতি ও অবস্তুগত সংস্কৃতির আলোচনায় এ সত্য সহজেই প্রতিভাত হয়েছে। পাত্ররা জাতিগতভাবে চীনা-তিব্বতি বা তিব্বতি বর্মির বোডো গোষ্ঠির অন্তর্গত বলে পণ্ডিতেরা প্রমাণ করেছেন। খাঁ (২০১৪) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'জাতিতত্ত্ববিদদের মতে পাতর গোষ্ঠীরা বৃহত্তর বোডো জনগোষ্ঠীর কোনো প্রশাখার বলে ধারণা করেছেন' (খাঁ, ২০১৪: ২৬)। আর তাঁদের ভাষা চীনা-তিব্বতি ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ভাষাগবেষকগণ।

২.১.১ *পাত্রদের অবস্থান*

সিলেট জেলার সদর উপজেলা ও গোয়াইনঘাট উপজেলার প্রায় ৩২টি গ্রামে প্রায় শতকরা নব্বই ভাগ পাত্র বাস করেন। পূর্বে সিলেট শহরের পাঠানটুলি পাড়ায়ও পাত্ররা বাস করতেন বলে মাঠ গবেষণায় তথ্য পাওয়া যায়। বর্তমানে পাত্র সংখ্যা চার হাজারের মতো। পাত্ররা পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অনুসারী। পুরুষরাই সংসারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সম্পত্তির উত্তরাধিকার হিসেবে ছেলে সন্তানেরা পিতার সম্পত্তির অংশ পেয়ে থাকেন। হিন্দু সমাজব্যবস্থার ন্যায় পাত্র মেয়েরা পিতার সম্পত্তির কিছুই

Dhaka University Institutional Repository

পান না। পাত্র সমাজে বিধবা বিয়ে প্রথা চালু থাকলেও তা সব সময় ইতিবাচক হিসেবে দেখা হয় না। পাত্রদের আদি পেশা ছিল কাঠ ও কয়লা বিক্রি। তবে বর্তমানে অধিকাংশের পেশা কৃষিকাজ।

অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ন্যায় পাত্র সমাজে রই বা গোত্র ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে। তাঁদের সমাজে বারোটি গোত্রের লোক বাস করেন বলে তথ্য প্রমাণ রয়েছে। পেশার ভিত্তিতে পাত্রসমাজে এই গোত্রের নামকরণ করা হয়েছে। এক গোত্রের সঙ্গে অন্য গোত্রের কোনো বৈষম্য নেই। অর্থনৈতিক কিংবা বংশগত কারণে উচ্চ-নিম্ন এরূপ কোনো স্তরবিন্যাস পাত্রসমাজে নেই। গোত্রপ্রথা পাত্র সমাজে প্রচলিত থাকলেও তাঁরা গৌড়গোবিন্দের গোত্রের লোক বলে প্রচার করেন।

পাত্রদের খাদ্য তালিকায় আদিবাসী জীবনের ছায়া প্রতিভাত হয়। তাঁরা শূকর, খরগোশ, বনমোরগ, কাছিম ইত্যাদির মাংস পছন্দ করেন। এছাড়া তাঁদের প্রাত্যহিক খাবার তালিকায় ভাত, মাছ, মাংস, কবুতর, সবজি, হাঁস, মুরগি, ডাল ইত্যাদি লক্ষ করা যায়। পানীয় হিসেবে নিজেদের তৈরি মদ অত্যন্ত প্রিয়।

২.১.২ *ধর্মবিশ্বাস*

ধর্মের দিক থেকে পাত্ররা সনাতন ধর্মের অনুসারী। বর্তমানে তাঁরা হিন্দুদের মতই অনেক দেব-দেবির পূজা করে থাকেন। তবে ধর্মীয় আচারে আদিবাসী হিসেবে তাঁদের নিজস্বতা সহজেই অনুমেয়। তাঁদের সব দেব-দেবির জন্য নিজস্ব নাম আছে এবং নিজস্ব ধারায় তাঁরা পূজা-অর্চনা সম্পন্ন করে থাকেন। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে পাত্রদের বাড়িতে দেব-দেবির মূর্তি ছিল না; প্রত্যেক বাড়িতে সে সময় পাত্ররা পাথর পূজা করতেন। বিভিন্ন পাহাড়ের চূড়ায় রক্ষিত থান বা পাথরের পূজায় তাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন। বর্তমানেও পাত্ররা এই ধারা অব্যাহত রেখেছেন; যেমন-পাত্র এলাকায় কালিথান, লক্ষীথান প্রভৃতি পূজা এর উদাহরণ। পাত্রদের পূজা-অর্চনার জন্য ওসাই নামে নিজস্ব পুরোহিত রয়েছে। এই ওসাইয়ের নির্দেশক্রমে পাত্ররা চাল, কবুতর, দুধ, মাছ, খর বা হাড়িয়া প্রভৃতির সাহায্যে তাঁরা পূজা করেন। কোনো পূজায় পাঠাবলি ও কবুতর বা হাঁসবলি করতেও দেখা যায়। পাত্রদের ঐতিহ্যবাহী পূজা হলো খেমুলারাম (গৃহদেবতা); বছরে একবার তাঁরা এ পূজা পালন করে থাকেন। বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী এবং আগত সন্তান যাতে সুখে শান্তিতে থাকে সেজন্য পাত্ররা সরস্বতীর পূজা করেন। এ পূজা তাঁরা বছরের যেকোনো সময় করতে পারেন। তবে সাধারণত মাঘ মাসের ২২ তারিখে পাত্ররা সর্বজনীন সরস্বতীর পূজা পালন করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে ম্রি (২০০৭: ৪৩৪) উল্লেখ করেছেন-

> পাত্রদের ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান দেখে এবং তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে, তাদের স্বতন্ত্র ধর্মবিশ্বাস রয়েছে যা তাদের পূর্বতন সর্বপ্রাণবাদ ও হিন্দুদের সনাতন ধর্মের

Dhaka University Institutional Repository

সংশ্রিণ। তবে এখন তারা সরাসরিভাবে তাদের আদি ধর্ম বা সনাতন ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মবিশ্বাসের কথা প্রকাশ করেন না। যদিও অতীতে পাত্ররা বিভিন্ন আদিবাসীদের মতো সর্বপ্রাণবাদী ও প্রকৃতির উপাসক ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তারা সনাতন ধর্মে ধর্মান্তরিত হন। বর্তমানে তারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী হিসেবে পরিচিত। তবে তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে আদিবাসীদের অনেক বৈশিষ্ট্যই লক্ষ করা যায়।

২.১.৩ *পাত্রদের সামাজিক অনুষ্ঠানাদি*

পাত্রদের বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান রয়েছে; এর মধ্যে বিয়ে, কর্ণভেদ প্রথা, গর্ভকালীন ও শিশুজন্ম পরবর্তী বিভিন্ন অনুষ্ঠান, নৃত্যগীত, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, বংশ প্রদীপ জ্বালানো প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। গর্ভকালীন পাত্ররা বিভিন্ন সংস্কার ও প্রথাপালন করেন। সাধারণত কোনো নারী গর্ভবতী হলে তাকে সাদা ভাত খাওয়ানো হয়। পাত্র ভাষায় একে 'সাত খাওয়ানো' বলে। গর্ভবতী মহিলার মা এসে এই ভাত খাওয়ান। গর্ভবতী মা যাতে ভালো থাকেন, এ বিশ্বাসে পাত্ররা এ সাদা ভাতের আয়োজন করে থাকেন। গর্ভধারণের আট বা নয় মাসের মধ্যে গর্ভধারিণীকে রূপসী পূজা করতে হয়। শিশুর কল্যাণ ও নিরাপদ প্রসবের জন্যই পাত্ররা এই পূজার আয়োজন করেন। পুত্র সন্তান প্রসব হলে ৯ দিন এবং কন্যা সন্তান হলে ৭ দিনের দিন একজন নাপিত এনে শিশুসন্তানের চুল কামানো হয়। শিশু জন্মের ২১ দিন পর পুনরায় শুদ্ধাচার হয়। এ সময় নাপিত এসে শিশুর চুল কামায়; এরপর পাত্ররা আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত করে খাওয়ান। অনুষ্ঠান শেষে ধাত্রীকে নতুন কাপড় ও কিছু টাকা দিয়ে খুশি করা হয়। এই অনুষ্ঠানকে পাত্র ভাষায় 'বাইসা' বলা হয়। ঐদিনই পাত্ররা শিশুর নাম রাখেন।

পাত্রদের বিয়ে ব্যবস্থা দৃষ্টিনন্দন ও আদিবাসী চরিত্রের পরিচায়ক। তাঁদের বিয়ের বিভিন্ন পর্বের মধ্যে পান পা উনি, পান দুয়ারানী, জংটু সিন্দুর পইরানি, বাংসিকুং তারিখ, খালতি, ভাসা, মারুয়া, বননাইওর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পাত্রদের বিভিন্ন ধরনের বিয়ের মধ্যে সীতকই ও সাতপাকে বাধা বা সাব্যস্ত বিয়েই বেশি প্রচলিত। ছেলে বা মেয়ে বিয়ের উপযুক্ত হলে পরিবারের অভিভাবকরাই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তবে সীতকই বিয়ের ধরনটা সাধারণ বিয়ের সাযুজ্য নয়। এটি প্রেমঘটিত বা জোরপূর্বক বিয়ে ব্যবস্থা। পিতামাতার অনুমতি ব্যতিরেকে অথবা কন্যাকে জোর করে তুলে এনে এ ধরনের বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ বিয়ে ব্যবস্থা পাত্রদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। পরিবারের অনুমতিতে সাব্যস্ত বিয়েই পাত্রদের মধ্যে বিধেয় ব্যবস্থা। ছেলেমেয়ের বিয়ে মোটামুটি ঠিক হলে ঐ দিন থেকেই বিভিন্ন ধরনের বিয়ের রীতি পালন পাত্রদের মধ্যে লক্ষ করা যায়। পাত্রদের নিজস্ব ঐতিহ্যের ভিত্তিতেই বিয়ের সকল নিয়ম সম্পন্ন হয়। বিয়েতে নাচগানের ব্যবস্থা থাকে। নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পাত্ররা বিয়ের সব আয়োজন নিষ্পন্ন করে থাকে। পাত্রসমাজে বিয়ে বিচ্ছেদের কোনো প্রথা নেই। কোনো কারণে

Dhaka University Institutional Repository

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হলে এবং বিয়ে ভাঙার উপক্রম হলে ঐ গোত্রের প্রধানসহ অন্য পাত্ররা বসে তাঁদের মধ্যে সমঝোতার ব্যবস্থা করে দেন। পাত্রসমাজে সাধারণত একক বিয়ে রীতিই মান্য করা হয়। তবে কোনো স্বামীর একাধিক স্ত্রী নিয়ে ঘরসংসার করার দৃষ্টান্ত উপেক্ষণীয় নয়। পাত্রসমাজে ঘরজামাই প্রথা চালু রয়েছে। তবে 'অন্যান্য জাতির ন্যায় পাত্ররাও ঘর-জামাই প্রথাকে সুনজরে দেখেন না' (ম্রি, ২০০৭: ৪৩৮)। বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্রদের মধ্যে কিছু বিধি-নিষেধ রয়েছে। পাত্রদের মধ্যে আন্তগোষ্ঠিয় বিয়ে রীতিই প্রচলিত। নিজ গোত্রের মধ্যে সাধারণত বিয়ে হয় না। তাঁদের মধ্যে কাকাতো, মামাতো, পিসতুতো, কিংবা মাসতুতো ভাইবোন সহ নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে হয় না। তবে এসব নিয়মের ব্যত্যয় ঘটলে বরপক্ষকে অনেক জরিমানা দেওয়ার রীতি এ সমাজে প্রচলিত আছে।

পাত্রদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি মারা গেলে 'পুড়ে ফেলা' বা মাটিতে 'পুতে রাখা'-উভয় পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়। কেউ মারা গেলে পাত্ররা নিজেদের মানুষ পাঠিয়ে এ মৃত্যসংবাদ জানানোর ব্যবস্থা করেন। যে ব্যক্তি মৃত্যুর সংবাদ নিয়ে যাবেন তিনি কোনো বাড়িতে প্রবেশ করবেন না; রাস্তায় দাঁড়িয়ে এ সংবাদ পৌঁছাবেন। বাড়িতে পৌঁছালে মৃতব্যক্তির অকল্যাণ হবে এই ধারণা থেকেই এভাবে পাত্ররা মৃত্যুর সংবাদ প্রদান করে থাকেন। অতঃপর আত্মীয় স্বজন ও গ্রামের লার-মস্তানী সবাই মিলে মৃতব্যক্তিকে নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিবেন পোড়াবেন, না মাটিতে দাফন করবেন। মৃতের সৎকারের পর পাত্ররা ঘাটের কাজ, দশাং কাম, শুদ্ধ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি রীতি পালন করে থাকেন।

পাত্রদের মধ্যে পূর্বে কর্ণভেদ প্রথা চালু ছিল। আট-দশ বছর বয়সের প্রত্যেক ছেলের কানের লতি গাছের কাঁটা দিয়ে ফোঁড়ানোকে বলা হয় কর্ণভেদ। একসময় এই অনুষ্ঠান খুব জাঁকজমকভাবে পালন করা হতো; বর্তমানে কেউ কেউ পালন করলেও তা আবশ্যকীয়ভাবে করা হয় না। পাত্ররা এখনও 'তিলসংরাইন উৎসব' গুরুত্বের সঙ্গে পালন করেন। তিল দিয়ে সবার কপালে তিলক দেওয়া হয় বলে এই অনুষ্ঠান তিল সংরাইন অনুষ্ঠান নামে পরিচিত। বংশপ্রদীপ জ্বালানো পাত্রদের আরেকটি উৎসবের নাম। প্রতিবছর কার্তিক মাসের দেওয়ালী উৎসবের রাতে বংশের একজন ছেলে ভোগ সাজিয়ে ও প্রদীপ জ্বালয়ে তার প্রয়াত সাত পূর্ব পুরুষের নাম ধরে ডাকার অনুষ্ঠান করেন। এই অনুষ্ঠানে পূর্ব পুরুষদের আত্মার কল্যাণের জন্য বিশেষ আশীর্বাদ করা হয়। এই অনুষ্ঠানকে পাত্ররা বংশের প্রদীপ জ্বালানো বলে অভিহিত করেছেন।

পাত্রদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির অনেক কিছুই বর্তমানে হারিয়ে যাচ্ছে। পেশা পরিবর্তন, পাত্র এলাকায় বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ, তাঁদের জমি বেদখল, ধর্ম পরিবর্তন, খাদ্যাভাসে পরিবর্তন প্রভৃতি কারণে তাঁদের বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ, পূর্বে পাত্ররা পাহাড় থেকে বিভিন্ন ধরনের বনজ পাখি, পশু শিকার করে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতেন; পাত্র এলাকায় পাহাড়

Dhaka University Institutional Repository

না থাকার ফলে বর্তমানে ঐ সব প্রাণি শিকার করা সম্ভব নয় বলে সেসব খাদ্য পাত্রদের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। তাঁরা আগে সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাস করতেন এবং তাঁরা ছিলেন প্রকৃতিপূজারি। কিন্তু বর্তমানে হিন্দুধর্মে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে তাঁদের ধর্মীয় আচারে বিশেষ পরিবর্তন এসেছে। কেবল বস্তুগত সংস্কৃতিতেই নয়, বরং অবস্তগত সংস্কৃতিতেও এই পরিবর্তন লক্ষণীয়। পাত্রদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদানের অন্তর্ভুক্তি ও বিযুক্তির ফলে পাত্র ভাষায় এর উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

পূর্ব-গবেষণা সমীক্ষা

সিলেটের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি পাত্র বা লালেং সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি রয়েছে। পাত্রদের সংস্কৃতি নিয়ে রচিত হয়েছে বেশ কিছু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ। এসব রচনায় পাত্রদের বস্তুগত সংস্কৃতির নানা দিক বিশ্লেষিত হয়েছে। পাত্র পরিবার, বিয়ে, প্রাত্যহিক জীবনাচার, মৃতের সৎকার প্রভৃতি এসব রচনার মূল প্রতিপাদ্য। কিন্তু পাত্র সংস্কৃতির বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা এসব রচনায় অনেকটাই দুর্লভ। মূলত পাত্রদের ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণধর্মী কোনো বই এখনও রচিত হয়নি। তবে ক্রম-ক্ষয়িষ্ণু পাত্র সংস্কৃতির নানা দিক নিয়ে বর্তমানে গবেষক, শিক্ষক, লেখক, শিক্ষার্থীগণ বেশ উৎসাহী হয়েছেন। তাঁরা পাত্রদের বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতি আলোচনায় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এ অধ্যায়ে পাত্রভাষা, পাত্র জনগোষ্ঠির সাংস্কৃতিক উপাদান প্রভৃতি বিষয়ে প্রকাশিত গ্রন্থের বিশ্লেষণ প্রাধান্য পেয়েছে।

সিলেটে পাত্র জাতি বসবাসের প্রারম্ভিক পর্যায় থেকে বর্তমান অবধি তাঁদের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন নৃবিজ্ঞানী, ভাষাবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, ভাষা-গবেষক প্রমুখ। তাঁদের আলোচনায় পাত্র সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক উন্মোচিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ল্যান্ড (Land 1962) তাঁর প্রবন্ধে পাত্র আচার-ব্যবহার, পেশা, বস্তুগত সংস্কৃতি, ভাষা, বিয়ে প্রথা, জ্ঞাতিসম্পর্ক, বর্ণ, সামাজিক সংগঠন, ধর্ম, ধর্মীয় আচার প্রভৃতি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। পাত্র সংস্কৃতি নিয়ে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রথম পর্যায়ের রচনা। পাত্র গবেষকদের নিকট প্রবন্ধটি সঙ্গত কারণেই অপরিহার্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তবে ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে পাত্রভাষা এখানে বিশ্লেষিত হয়নি; পাত্রদের বস্তগত সংস্কৃতির আলোচনাই এতে সীমিত আকারে উপস্থাপিত হয়েছে মাত্র। একথা স্বীকার্য যে, এ প্রবন্ধটি প্রাথমিক পর্যায়ের রচনা বলে এর প্রায়োগিক মূল্য অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। এরপর রিজভি (Rizvi, ১৯৭০) পাত্র সংস্কৃতি আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন। তিনি সিলেটের ইতিহাস, সংস্কৃতি, জনসংখ্যা, মানুষের দৈহিক গঠন প্রভৃতি বিষয়ের আলোকপাত করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ের সমবায়ে পাত্র সংক্রান্ত তাঁর বই বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি অধ্যায় হলো জনসংখ্যা, সমাজ ও সংস্কৃতি (People, society and culture)। লেখক সিলেটে মানুষের বসতি স্থাপন, অভিবাসন, ধর্ম, ভাষা এবং নৃতাত্ত্বিক শ্রেণিবিভাগের দিকটি বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন আলোচ্য অধ্যায়ে। বইটির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো খাসিয়া ও মণিপুরি নৃ-গৌষ্ঠির সঙ্গে পাত্র জনগোষ্ঠির সমাজ ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরার প্রয়াস। পাত্র রাজা গৌড় গোবিন্দের উল্লেখ আছে এ গ্রন্থে। পাত্রদের প্রধান পেশা কয়লা বিক্রির বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে লেখক আলোচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। সব মিলিয়ে পাত্রদের ধর্ম ও প্রাত্যহিক জীবন

Dhaka University Institutional Repository

প্রণালির কথা লেখক সুচারুরূপে বর্ণনা করেছেন। বইটিতে পাত্রদের প্রাথমিক পরিচয় দেওয়ার প্রচেষ্টা লক্ষ করা গেলেও সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

হোসেন (১৯৯০) পাত্র সংস্কৃতির আলোচনার একজন সারথি। তিনি তাঁর গ্রন্থে সিলেটে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠিকে পাহাড়ী বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি পাত্রদের পূর্বপুরুষ রাজা গৌরগোবিন্দের শাসন-ইতিহাস তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটি সিলেটের ইতিহাস নির্মাণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; তবে পাত্র সংস্কৃতির সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য এতে পাওয়া যায় না। এই ধারাবাহিকতায় আরও বেশ কিছু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে যা পাত্রদের ইতিহাস ও নৃতাত্ত্বিক অন্বেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছে। চৌধুরী (১৯৯২) তাঁর গ্রন্থের চারটি অধ্যায়ের প্রতিটিতে সিলেটে বাসরত মানুষের ইতিহাস, ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছন। কাজেই সিলেটের ইতিহাস ও ঐতিহ্য অন্বেষণে গ্রন্থটির ভূমিকা অনস্বীকার্য। তবে এতে সিলেটের অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি সম্পর্কে অনুপুঙ্খ আলোচনা থাকলেও পাত্র ভাষা ও সংস্কৃতির উল্লেখ আছে অতি সামান্যই। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি পাত্রদের নাম ও তাঁদের পেশা সম্পর্কে অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন। ফলে পাত্র সংস্কৃতির বিস্তৃত আলোচনা এ গ্রন্থে উপেক্ষিত হয়েছে। খিসানের (১৯৯৪) আলোচনায় পাত্র সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক উন্মোচিত হয়েছে। তিনি তাঁর প্রবন্ধে পাত্রদের সঙ্গে গৌড়গোবিন্দের সম্পর্ক তথা গৌরগোবিন্দ যে পাত্রদের রাজা ছিলেন, সে ইতিহাস তুলে ধরেছেন। এ প্রবন্ধে তিনি পাত্রদের ভাষা, ধর্ম, পেশা সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনায় প্রয়াসী হয়েছেন। মোহান্ত (১৯৯৮: ৫৮) পাত্রদের গোত্র, ইতিহাস, অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ের অবতারণা করেছেন। তাঁর অনুসন্ধানে জানা যায় যে, পাত্ররা খাসিয়া আদিবাসীরই অংশ। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন-

> জাতিগতভাবে স্বল্পপরিচিত পাত্ররা বৃহত্তর বোডো জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করে থাকেন। তাঁদের নিজস্ব ভাষা থাকলেও বর্ণমালা নেই। এ অর্থে তাঁরাও অনক্ষর জনগোষ্ঠী। তাঁরা নিজস্ব বাচনভঙ্গিতে সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতে পারেন। এঁরা মাঝারি উচ্চতাসম্পন্ন, দীর্ঘকপাল এবং এঁদের গাত্রবর্ণ বাদামী। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে এঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, শ্রীহট্টে কাঠকয়লা প্রভৃতি বিক্রয়কারী পাতর জাতীয় ব্যক্তিগণ হিন্দু মতাবলম্বী খাসিয়া জাতি হইতে পৃথক নহে।

১৯৯৯ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধে মোহান্ত সংক্ষিপ্তাকারে পাত্রদের জীবন ও সংস্কৃতি তুলে ধরেছেন। এ প্রবন্ধের মাধ্যমে পাত্র জাতি সম্পর্কে নতুন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। মোহান্ত একই সালে প্রকাশ করেছেন 'সিলেটের আদিবাসী: সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন' (১৯৯৯) প্রবন্ধ। এ রচনায় তিনি ত্রিপুরা, পাত্র, হাজং, হালাম ইত্যাদি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নির্মাণের চেষ্টা করেছেন। পাত্র (পাতর) সম্প্রদায়ের আলোচনায় তিনি নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি, বাংলাদেশে পাত্রদের সংখ্যা, গৌড় গোবিন্দের সঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

পাত্রদের সম্পর্কের বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। পাত্রদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় উন্মোচন প্রসঙ্গে প্রবন্ধকার লিখেছেন– 'নৃতাত্ত্বিকভাবে স্বল্প পরিচিত পাত্ররা বৃহত্তর বোডো জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। তাদের নিজস্ব ভাষা থাকলেও কোনো বর্ণমালা নেই' (মোহান্ত, ১৯৯৯: ৬৬৭)। এ প্রবন্ধ থেকে পাত্রদের তেমন তথ্য পাওয়া যায় না। পাত্রদের বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করলে প্রবন্ধটি আরও সমৃদ্ধ হতো।

চৌধুরী (১৯৯৯) তাঁর গ্রন্থে *সিলেট আঞ্চলে প্রচলিত আরো কয়েকটি ভাষা* শীর্ষক প্রবন্ধে পাত্রদের সংখ্যা, ভাষা, ইতিহাস, তাঁদের জীবিকা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন–

> বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে সিলটী নাগরী ছাড়াও আরো কয়েকটি ভাষা প্রচলিত রয়েছে, এসব ভাষার কোন লেখ্য রূপ নেই। এসব ভাষা ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩০ হাজারের ঊর্ধ্বে হবে। প্রথমটি হলো পাত্র বা পাত্তর সম্প্রদায়, এদের সংখ্যা হাজার খানেক হবে। এই পাত্র সম্প্রদায়ের লোকেরা সিলেট শহরের কাছে খাদিম এলাকার কালাগুল মৌজায় বসবাস করে। সিলেটের স্থানীয় আদিবাসীরা এদেরকে খাই বলে অভিহিত করেন। এই খাই সম্প্রদায় তারা নিজেদের সিলেটের শেষ হিন্দু রাজা গৌড়-গোবিন্দের বংশধর বলে দাবি করে (১৯৯৯: ২৩)।

পাত্র সম্প্রদায়ের ইতিহাস, সমাজ, অর্থনীতি, ভাষা, তাঁদের উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। লেখকের অন্বেষা থেকেই বইটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। চক্রবর্ত্তী (২০০০: ভূমিকা) এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

> সিলেট জেলার নিঃস্ব আদিবাসী পাত্র সম্প্রদায় বাংলাদেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর অগোচরে রয়ে গেছে। আদিবাসী পাত্র সম্প্রদায়ের ইতিহাস, সমাজ ও অর্থনীতি সম্পর্কে আলোচনা এই গ্রন্থের মূল বিষয়। মাঠ পর্যায়ে জরিপকর্ম পরিচালনা ছিল গবেষণা পদ্ধতি। সর্বপ্রাণবাদী পাত্র সম্প্রদায় এক সময় সনাতন ধর্মাবলম্বী হলেও তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রকাশ লক্ষণীয়। তাদের সুসংহত গ্রামব্যবস্থা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চাপে ভেঙ্গে গেছে। ভূসম্পত্তির অধিকার ক্রমশ হারিয়ে পাত্র সম্প্রদায়ের অধিকাংশই এখন নিঃস্ব, সহায়-সম্বলহীন। বাংলাদেশের বিভিন্ন আদিবাসীদের মতো পাত্র সম্প্রদায়ের নিজস্ব ভাষা থাকলেও নিজস্ব বর্ণমালা নেই। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে সিলেটের আদিবাসী পাত্র সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক একীভবন এখনও সম্ভব হয়নি।

তত্ত্বনিধির (২০০২) গ্রন্থে সিলেটের ইতিহাস এবং এ অঞ্চলের মানুষের বর্ণনা, সাহিত্য, ভৌগোলিক বিবরণ, ভাষা এবং সংস্কৃতি প্রভৃতি স্থান পেয়েছে। লেখক তাঁর আলোচনাকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন- প্রথম অংশে তিনি সিলেটের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা, কৃষিকাজ, শিল্প, বাণিজ্য,

Dhaka University Institutional Repository

পশুপাখি, পবিত্র স্থান ইত্যাদি তুলে ধরেছেন। সিলেটের অধিবাসী নিয়ে তিনি প্রথম অংশের সপ্তম অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। এখানে তিনি হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। তাঁর এ গ্রন্থে খাসিয়া, কুকি, চুটিয়া, ত্রিপুরা, মণিপুরি এবং লালংদের ইতিহাস নির্মাণের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। লেখকের অন্বেষা খাসিয়া, চুটিয়া ও কুকি থেকে পাত্র সম্প্রদায় আলাদা একটি গোষ্ঠি-পাত্র জাতিকে এরূপ স্বতন্ত্র সত্তায় প্রতিষ্ঠা করার তথ্য প্রদান করে। আলী (২০০৩) সিলেটের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জনসংখ্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। সিলেটের ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠির উল্লেখ প্রসঙ্গে লেখক লেলুং বা পাত্র সম্প্রদায়ের আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন। তবে গ্রন্থটি থেকে কেবল পাত্র সম্প্রদায়ের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় পাওয়া যায়; পাত্র সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত প্রত্যাশিত তথ্য পাওয়া যায় না। একই সময়ে খানের (২০০৩) প্রবন্ধ *পাত্র* নামে প্রকাশিত হয়। এতে প্রবন্ধকার পাত্রদের নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি, তাঁদের ইতিহাস, বিয়ে প্রথা, উত্তরাধিকার ইত্যাদি তথ্য সন্নিবেশ করেছেন। তাঁর এ আলোচনা থেকে নতুন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

সুলতান, বাংলাদেশ গ্রাম বান্ধব বা এফআইভিডিবি, সিলেট থেকে প্রকাশ করেন *পাত্র জাতির (?)* কথা নামে ১৪ পৃষ্ঠার একটি মেমোগ্রাফ। লেখক এতে পাত্রদের পূর্ব পুরুষ, ঐতিহাসিক স্থান, সামাজিক সংগঠন, বসবাসের স্থান, দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও গঠন, ধর্ম, জনসংখ্যা, আচার, বিয়ে প্রথা, উত্তরাধিকার, খাদ্য, ভাষা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। পাত্রদের উন্নয়নে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গৃহীত পদক্ষেপেরও উল্লেখ আছে এ রচনায়। তিনি এ রচনায় পাত্র ভাষার উদ্ভব অন্বেষণে প্রয়াসী হয়েছেন। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত পাত্রদের মৌলিক শব্দের একটি তালিকাও তিনি সংযোজন করেছেন এতে। রচনাটি পাত্র গবেষকের নিকট ইতোমধ্যেই সাদরে আদৃত হয়েছে।

জাহান 'সিলেটের উপজাতি পাত্র' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি থেকে (১৩৮০- ১৪০০ বাংলা)। প্রবন্ধকার পাত্রদের সংস্কৃতি ও জীবনাচরণের একটি প্রতিচ্ছবি নির্মাণ করেছেন আলোচ্য প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি নাতিদীর্ঘ হলেও এতে পাত্রদের বস্তুনিষ্ঠ তথ্য উপস্থাপনার প্রয়াস আছে।

কামাল, ইসলাম ও চাকমার (২০০৭) সম্পাদনায় বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয় বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে ৫২০ পৃষ্ঠার আকর গ্রন্থ *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*। গ্রন্থের প্রথম অংশে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল, দ্বিতীয় অংশে উত্তরবঙ্গ অঞ্চল এবং তৃতীয় অংশে ময়মনসিংহ-সিলেট অঞ্চলের মোট ৪৫টি আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতির বর্ণনা। তৃতীয় অংশ অর্থাৎ ময়মনসিংহ-সিলেট অঞ্চলের মোট ১৮টি আদিবাসীর আলোচনায় পাত্র উল্লেখিত হয়েছে ১০ নম্বরে ৪৩১-৪৪০ পৃষ্ঠাব্যাপী। পাত্র (২০০৭) শিরোনামে প্রবন্ধটি রচনা করেছেন শ্রি। এ আলোচনায় তিনি পাত্রদের

Dhaka University Institutional Repository

জাতিগত পরিচিতি, লালেং থেকে পাত্র, সামাজিক কাঠামো, বিস্তৃতি ও জনসংখ্যা, পোশাক-পরিচ্ছদ, ধর্ম, তাঁদের সামাজিক অনুষ্ঠান, বিয়েব্যবস্থা, বহুবিবাহ, নৃত্যগীত, বিশ্বাস, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান প্রভৃতি তুলে ধরেছেন। তাঁর বর্ণনায় মৌলিকত্ব নেই বললেই চলে; কারণ পাত্রদের বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতি নিয়ে অন্য লেখকদের আলোচনাকে তিনি পুনরায় বর্ণনা করেছেন মাত্র। এছাড়া এ প্রবন্ধে তিনি আদিবাসী অন্বেষণের মূল উপাদান ভাষা নিয়ে কোনো আলোচনা করেননি। কাজেই তাঁর আলোচনার সীমাবদ্ধতা সহজেই অনুমেয়।

বিশ্বাস ও জামান (২০০৬) তাঁদের প্রবন্ধে পাত্রদের বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ আলোচনায় সংস্কৃতির পূর্ববর্তী আলোচনারই ধারাবাহিকতা মাত্র। তবে এ প্রবন্ধেই প্রথম ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে পাত্র ভাষার আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। ভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রবন্ধকারদ্বয় ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্বের আলোচনা করেছেন। পাত্র ভাষা গবেষক ও অনুরাগী পাঠককের নিকট প্রবন্ধটি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হতে পারে।

রহমানের (২০০৭) অনুসন্ধানে বিধৃত হয়েছে পাত্র সম্প্রদায়ের পরিচয়, তাঁদের অবস্থান, পাত্রদের সংখ্যা, আবাস ও আবাসিক এলাকা, ভাষা, গোত্র ও সমাজ, গ্রামীণ সংগঠন, পরিবার কাঠামো ও নারীর অবস্থান, আর্থিক অবস্থা, শিক্ষা, স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থা, ধর্ম, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, ধর্ম ও সমাজ শাসন, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, ইহলৌকিক আচার-অনুষ্ঠান, পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম, বর্ণপ্রথা, বিবাহ প্রথা, খাদ্যাভ্যাস ও পানীয়, সনাতন চিকিৎসা পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়। প্রবন্ধকার এখানে পূর্ববর্তীগণের লেখা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন; বিশেষ করে তিনি *সিলেটের নিঃস্ব আদিবাসী পাত্র* গ্রন্থের বিষয়গুলি পুনর্বর্ণনা করেছেন। কাজেই এ প্রবন্ধ থেকে পাত্র জনগোষ্ঠি সম্পর্কে নতুন কোনো তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায় না।

আহমেদ ও বিশ্বাস (২০০৭) নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে পাত্রদের সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক বর্ণনা করেছেন। তাঁদের এ প্রবন্ধে পাত্র ভাষার স্থান নেই। ভাষা ব্যতিরেকে একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠির সংস্কৃতির পরিচয় অন্বেষণের ফলে পাঠকের কাছে প্রবন্ধটির সীমাবদ্ধতা সহজেই চোখে পড়ে।

হাই (২০০৭) অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পাত্রদের নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি, আর্থ- সামাজিক অবস্থা, বিয়ে, পরিবার, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, ধর্ম ও আচার, পাত্র বা লেলুং ভাষা, বস্তুগত সংস্কৃতি ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন। পাত্র সংস্কৃতির বহুবিধ দিক তিনি তুলে ধরেছেন; এসব আলোচনার অধিকাংশই পূর্ববর্তী লেখক বা গবেষকদের আলোচনার বিস্তৃতি মাত্র। তাঁর অন্বেষণের অষ্টম অধ্যায়ে আছে লেলুং ভাষা বা পাত্রভাষার অবতারণা। তিনি পাত্র ভাষা আলোচনায় কেবল এ ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত কিছু মৌলিক শব্দের তালিকা দিয়েছেন; ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এসব শব্দের ব্যাখ্যা ও

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষণ তিনি দেখাননি। একাডেমিক গবেষণার অংশ হিসেবে বইটির গুরুত্ব রয়েছে, তবে সার্বিক বিবেচনায় বইটির সীমাবদ্ধতাও বিদ্যমান।

হোসেন ও অন্যান্য (২০০৯) বিশটি আদিবাসীর সংস্কৃতি, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, বর্তমানে তাঁদের সমস্যা ও তা থেকে উত্তরণের উপায় ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেছেন। গ্রন্থের ১২৪ পৃষ্ঠায় তাঁরা পাত্র আদিবাসী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। পাত্র আলোচনায় তাঁরা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা, নারীর অবস্থান, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা করেছেন। পাত্র সম্পর্কে আলোচনার শুরুতেই হোসেন ও অন্যান্য (২০০৯: ১২৪) বলেছেন–

> বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে নূতন করে সৃষ্ট ধর্ম রাষ্ট্র কর্তৃক অবজ্ঞায় সংখ্যালঘু উচ্ছেদের এক নির্মম উদাহরণ এদেশে বসবাসরত আদিবাসী 'পাত্র জনগোষ্ঠী'। শত শত বছর পূর্বে স্থানীয়ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষরা সংখ্যালঘু এবং সংখ্যালঘু থেকে বর্তমানে বিলুপ্ত-প্রায় একটি জাতিগোষ্ঠীতে পরিণত।

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পৃথক সংস্কৃতি বিদ্যমান। কিন্তু পাত্র ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষক ও লেখকগণ তেমন দৃষ্টি নিবদ্ধ করেননি বলে পাত্রদের সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনার অবকাশ রয়েছে। তাঁদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে হজরত শাহজালালের সিলেট আগমনের ইতিহাসও সংশ্লিষ্ট। গবেষকগণ বিভিন্ন বইপত্র ও প্রবন্ধে পাত্রদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড উল্লেখের প্রয়াস পেয়েছেন। পাত্র ভাষা পাত্রদের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হলেও এ ভাষা নিয়ে উল্লেখ করার মতো তেমন কাজ হয়নি। পাত্রভাষা সম্পর্কে তাঁরা সামান্য আলোচনা করেছেন। এ সম্পর্কে হোসেন ও অন্যান্য (২০০৯: ১২৫) উল্লেখ করেছেন–

> এই সম্প্রদায়ের নিজস্ব ভাষা রয়েছে। নিজ সম্প্রদায়ের মানুষদের সাথে কথা বলার সময় তারা এই ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। স্থানীয়দের মতে, হযরত শাহজালাল (র.)'র আগমনের পূর্বে এই অঞ্চলের রাজা গৌরগোবিন্দের এই ভাষা ছিল। তখন এই ভাষাতেই এ অঞ্চলের প্রশাসনিকসহ যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে মুসলিম শাসন এবং তারপর ব্রিটিশ আমলে ভাষাটির ব্যবহার রহিত হয়ে যায়। বর্তমানে এই ভাষার লিখিত রূপও পাওয়া যায় না বলে উল্লেখ করেন স্থানীয় পাত্ররা।

তাঁদের এ অন্বেষা মূলত পূর্ববর্তী গ্রন্থের সারাংশ। কাজেই এ আলোচনা থেকে নতুন কিছু পাওয়া যায় না।

মুরমু (২০০৯) ৬৪টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থের ১৫২ পৃষ্ঠা থেকে ১৫৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লেখক পাত্র সম্প্রদায়ের ভৌগোলিক বিবরণ, পাত্র শব্দের নামকরণ, পাত্রদের

Dhaka University Institutional Repository

অতীত ইতিহাস, গোত্র ও সমাজ, জন্ম, মৃত্যু ও বিয়ে, পাত্রদের উন্নয়ন কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থ অধ্যয়নে পাত্রদের বস্তুগত সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। পাত্রদের অবস্তুগত সংস্কৃতি বিশেষ করে, ভাষা সম্পর্কে কোনো আলোচনা এ গ্রন্থে নেই। পাত্র শব্দের নামরকণ ব্যাখ্যায় লেখক চক্রবর্ত্তীর *সিলেটের নিঃস্ব আদিবাসী পাত্র* (২০০০) গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন। সে বিবেচনায় পাত্র নামকরণ সম্পর্কে মুরমু (২০০৯: ১৫২) বলেছেন-

> নামকরণ: পাত্র আদিবাসীরা ক্ষেত্র বিশেষে 'পাতর' আবার 'পাথর' হিসেবে পরিচিত। অনুমান করা হয়, কয়লা তৈরি করতো বলে তাদের পাথর বলা হতো যা অপভ্রংশ হয়ে পাতর হয়েছে। সিলেটে স্থানীয়ভাবে জায়গা জমির দলিলপত্রে পাথর বা খাসিয়া হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। পাত্রদের নিকট তাদের নিজস্ব জাতিগত পরিচয় হলো লালেং এবং লালেং শব্দের অর্থ হলো পাত্র। আদিবাসী পাত্র সম্প্রদায়ের সদস্যগণ তাদের নামের শেষে পদবী হিসেবে পাত্র শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। শিক্ষিত পাত্র আদিবাসীরা তাদের নামের শেষে মহাপাত্র পদবী হিসেবে সংযাজন করে থাকে। মহাপাত্র পদবীধারীদের যুক্তি, তারা সিলেটের রাজা গৌরগোবিন্দের সভাসদ, সুতরাং তারা পাত্র নয়, মহাপাত্র। এটা নাকি তাদের মনের উপলব্ধি থেকে উদ্ভুত হয়েছে।

রহমান (২০০৯) ৩০টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে বিশদ বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থের ১১১-১১৩ পৃষ্ঠায় পাত্র বা পাথর শিরোনামের উপশিরোনাম পাত্র বা পাথর জাতিগত অন্যান্য পরিচয় অংশে লেখক পাত্রদের ইতিহাস, বসত এলাকা, অর্থনৈতিক অবস্থা, সাংস্কৃতিক জীবন প্রবাহ, ধর্ম, ভাষা, পোশাক ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরেছেন। পাত্র ভাষা আলোচনায় তিনি অভিনবিষ্ট হয়েছেন এবং এ সম্পর্কে তিনি পাত্রদেরকে প্রাচীন কুকি চীনা ভাষা পরিবারের লোক বলে আখ্যায়িত করেছেন। পাত্রদের ভাষা বর্তমানে বাংলা ভাষার মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে বলেও তিনি মনে করেন। পাত্র ভাষার নিজস্ব কোনো হরফ নেই, তাই এ ভাষার ক্ষেত্র ও পরিধি কম। এছাড়া পাত্ররা গোত্রের বাইরে বাংলা ভাষায় কথা বলে এবং প্রয়োজনীয় কাজ সমাপন করে বাংলা ভাষায় (রহমান, ২০০৯)। আদিবাসী পাত্রদের ভাষা নিয়ে লেখকের এ অন্বেষা গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ পাত্রদের স্বতন্ত্র ভাষা রয়েছে এবং এ ভাষা তারা সাবলীল ভাবে ব্যবহার করে থাকেন। বরং বলা যায়, প্রাত্যহিক জীবনে পাত্ররা নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে পাত্র ভাষা ব্যবহার করেন এবং অপাত্রদের সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁরা বাংলাভাষা বা সিলেটী বাংলাভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন।

চাকমা ও অন্যান্যের (২০১৫) গবেষণা ও সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে *বাংলাদেশের আদিবাসী এথনোগ্রাফিয় গবেষণা* শীর্ষক আকর গ্রন্থ। গ্রন্থটির দুটি খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ডে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চল, বৃহত্তর সিলেট অঞ্চল ও উপকূল অঞ্চল- এই তিন ভাগে ভাগ করে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির আলোচনায় প্রয়াসী

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছেন লেখকগণ। বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির আলোচনায় তাঁরা পটভূমিকা, খাসিয়া, পাত্র, মণিপুরি শিরোনামে উদ্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। পাত্র বিয়ে ও বিয়ে ব্যবস্থা, বিধবা বিয়ে, বিয়ে বিচ্ছেদ, বহুবিবাহ, ঘরজামাই, মৃত্যু ও সৎকার পদ্ধতি, মৃত ব্যক্তিকে শ্মশানে নেয়ার ব্যবস্থা, শ্মশানে মাটি দেওয়া, ঐতিহ্যগত সামাজিক প্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক সংগঠন, ভূমি অধিগ্রহণ, উত্তরাধিকার আইন, পেশার প্রকারভেদ, বাসস্থানের ধরন, ধর্মীয় অবস্থা, পূজা-পার্বণ, পরিবারের ধরন, ব্যক্তির জীবনচক্র, জন্ম ও আচার অনুষ্ঠান, সামাজিক উৎসব, ভাষা ও বর্ণমালা, সংস্কার ও লোকবিশ্বাস, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয় অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। ফলে এ গ্রন্থ থেকে পাত্র সম্প্রদায় সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। ভাষা ও বর্ণমালা সম্পর্কে চাকমার (২০১৫: ৩৪০) অন্বেষা পাত্র ভাষা সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান করে-

> আদিবাসী পাত্রদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে। এই ভাষার নাম হলো লালেং বা থার। তাদের আদিবাসী বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিজস্ব ভাষা উল্লেখযোগ্য। এই ভাষা অন্যান্য জাতির ভাষা এবং বাংলা ভাষার সাথে কোনো মিল নেই। কিন্তু পাত্রদের নিজস্ব ভাষা থাকলেও সেই ভাষার কোনো বর্ণমালা নেই। বর্তমানে বাংলা ভাষার আগ্রাসনে আদিবাসী পাত্রদের ভাষা প্রায় বিলুপ্তির পথে। পাত্র ভাষা নিয়ে তেমন কোনো গবেষণা হয়নি এবং ভাষাটি কোন ভাষা পরিবারভুক্ত সে ব্যাপারে কোনো তথ্য জানা নেই। কোনো গবেষণা এবং বইয়ে ভাষার ব্যাপারে কোনো তথ্য উল্লেখ করা হয়নি।

লেখকগণের পাত্র ভাষার উৎস সম্পর্কে অভিমত পুরোটাই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ পাত্র ভাষা কোন্ পরিবারভুক্ত তা বিভিন্ন গবেষকদের গবেষণায় পর্যালোচিত হয়েছে।

সিকদার (২০১১) চৌদ্দটি অধ্যায়ে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য আদিবাসী, যেমন– চাকমা, মারমা, গারো, ওঁরাও, সাদরি, খুমি, পাত্র প্রভৃতি ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা সুচারুরূপে সন্নিবেশ করেছেন। বাংলাদেশের আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে রচিত এটি একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কারণ দশটি আদিবাসীর ভাষা নিয়ে গবেষণাধর্মী গ্রন্থ এটি। গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক বাংলাদেশের আদিবাসী ও আদিবাসী ভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন । এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষার উৎস সন্ধান এবং এসব ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। এই অধ্যায়েই লেখক পাত্র বা লালেং ভাষার বর্ণনা করেছেন। আলোচনার শুরুতেই তিনি আদিবাসী পাত্র সম্প্রদায়ের আবাসস্থল, জনসংখ্যা, পেশা, পাত্র শব্দের উদ্ভব ইত্যাদি তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন।

২০১২ সালে প্রকাশিত হয় *ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মৌখিক সাহিত্য* নামে একটি গ্রন্থ। এ গ্রন্থের উপদেষ্টা সম্পাদক হলেন লিয়াকত আলী লাকী, প্রধান সম্পাদক ড. ঈশানী চক্রবর্তী এবং সম্পাদক এস এম শামীম আকতার। গ্রন্থটিতে লেখকগণ চৌদ্দটি আদিবাসীর ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা

করেছেন। লেখকগণ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠিকে উত্তরাঞ্চল, বৃহত্তর ময়মনসিংহ, বৃহত্তর সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ভাগ করে আলোচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁরা বৃহত্তর সিলেটের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির আলোচনায় খাসি ও পাত্রদের সমাজ, সংস্কৃতি ও মৌখিক সাহিত্যের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। পাত্র ভাষার ছড়া বা গান, প্রার্থনা সঙ্গীত, দেশাত্ববোধক গান, নৃত্য গান, লোককাহিনী প্রভৃতির আলোচনায় লেখকগণ ব্রতী হয়েছেন। এ আলোচনার বিশেষত্ব হলো পাত্র ভাষার মৌখিক সাহিত্যের দিক উন্মোচন করা। গ্রন্থটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির মৌখিক সাহিত্য অন্বেষণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে বইটিতে পাত্র ভাষার অন্যান্য দিক, যেমন–পাত্র শব্দভাণ্ডার, পাত্র ভাষার মৌখিক সাহিত্যের ব্যাকরণ নির্মাণ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা থাকলে বইটি আরও সমৃদ্ধ হত।

খাঁ (২০১৪) আটটি অধ্যায় সংবলিত 'লালেং থারকুং চিনিকাং' শীর্ষক গ্রন্থে লালেং সম্প্রদায় ও সিলেট, লালেং ভাষার ব্যাকরণের প্রথম ধাপ, লালেং ভাষার বিষয়ভিত্তিক চলমান শব্দাবলি, লালেং ভাষার শব্দভাণ্ডার, বৃহত্তর সিলেটে লালেং ভাষার ক্রিয়া বিশেষণের ব্যবহার, লালেং ভাষায় ব্যবহৃত কয়েকটি উদাহরণ ইত্যাদি আলোচনায় সিদ্ধহস্তের পরিচয় দিয়েছেন। ভাষাতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের কারণে গ্রন্থটি পূর্ববর্তী অন্যান্য গ্রন্থ থেকে স্বতন্ত্র। তিনি দীর্ঘদিন পাত্র এলাকায় চাকুরিসূত্রে অবস্থানের কারণে পাত্রদের সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষা পর্যবেক্ষণ করেছেন অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। তাঁর এই অন্বেষা বইটি লেখার ক্ষেত্রে সপ্রদীপে ভাস্বর। পাত্র সম্প্রদায় কল্যাণ পরিষদের নির্বাহী প্রধান গৌরাঙ্গ পাত্র ও পাত্র আদিবাসী ঐক্য পরিষদের পরিচালক ডা. রবীন্দ্র পাত্রের কথায় এই কথার স্বীকৃতি পাওয়া যায়–

> এফআইভিডিবি এর জনাব মালিক আনোয়ার খাঁ সাহেবকে আমরা পাত্র (লালেং) সমাজের লোকেরা অনেক আগে থেকে চিনি। আমরা তাঁর লেখা অনেক বই দেখেছি। আমাদের পাত্র গ্রামগুলি তাঁদের কর্ম এলাকার অন্তর্ভুক্ত থাকায় পাত্র সমাজের অনেক মানুষ প্রায় ত্রিশ বছর থেকে মালিক আনোয়ার স্যারের নিকট ট্রেনিং নিয়েছে (উল্লেখ- খাঁ, ২০১৪: ৯)।

খাঁ ১২০ পৃষ্ঠার গ্রন্থে পাত্রদের ভাষার ব্যাকরণ নির্মাণের চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছদে তিনি লালেং বা পাত্রভাষার পদ, বচন, ক্রিয়া, পুরুষ ও কালের ব্যবহার, কারক ও বিভক্তির আলোচনা করেছেন। এ আলোচনায় পাত্র ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ প্রতিফলিত হয়েছে। গ্রন্থটি পাত্র ভাষাগবেষককে অনুপ্রাণিত করবে- এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে পাত্রভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তিনি দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে পারেননি। কারণ পাত্রভাষা বিশ্লেষণে তিনি ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতি অনুসরণ করেননি। ফলে তাঁর পাত্রভাষার আলোচনা বর্ণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে।

‘পাত্র সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থা-২০১৪ এর জরিপের ফলাফল উপস্থাপনা’ শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করে পাত্র সম্প্রদায় কল্যাণ পরিষদ বা পাসকপ। এ প্রবন্ধে পাত্র জাতিসত্তার পরিচয়, সমাজ ব্যবস্থা, সামাজিক সংগঠন, বসতবাড়ি ও পরিবেশ, উত্তরাধিকার নীতিমালা, খাদ্যাভ্যাস, পেশা, মৃত্যু সৎকার, জন্ম ও শিশুর নামকরণ, পূজা-পার্বণ, ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে পাত্র সম্প্রদায়ের অবদান, পাত্র সম্প্রদায়ের বসতি উপজেলার নাম, উপজেলা ভিত্তিক পাত্র সম্প্রদায়ের ভূমির পরিমাণ, ধর্মীয় উপাসনালয় সংক্রান্ত তথ্য, স্বাস্থ্য চিকিৎসা ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। এ প্রবন্ধটি পাত্র সম্প্রদায়ের সাম্প্রতিক তথ্য উদঘাটনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। কারণ পাসকপ পাত্রদের নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করছে এবং এরই ফলাফল সংবলিত অন্বেষা এ প্রবন্ধে সুচারুরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রবন্ধটির কলেবর বেশি নয়; মাত্র ১০ পৃষ্ঠা। এই দশ পৃষ্ঠায় কোনো একটি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করা দুরূহ। তাই প্রবন্ধকার এতসব বিষয় আলোচনা না করে পাত্রদের ভাষা বা তাঁদের যেকোনো একটি বিষয় নিয়ে আলোচনায় প্রয়াসী হলে এ প্রবন্ধ থেকে সম্যক ধারণা লাভ করা যেত।

বিশ্বাসের (২০১৫) আটটি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত *Ethnographic profile of the ethnic communities of north-eastern Bangladesh* গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে পাত্রদের জনসংখ্যা, দৈহিক গঠন, অভিবাসনের ইতিহাস, সামাজিক সংগঠন, উত্তরাধিকার নীতি, ভাষা ও সংস্কৃতি, ধর্ম ও আচার, পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্ক, রাজনৈতিক অবস্থা, বিয়ে রীতি, গ্রাম্য সংস্থাসমূহ, ঐতিহ্যগত পেশা ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে। এ আলোচনায় লেখক মৌলিকত্বের স্বাক্ষর রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ এ গ্রন্থে তিনি পাত্রদের নতুন তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করেননি। পূর্ববর্তী কয়েকটি গ্রন্থ থেকে তথ্য নিয়ে তা সংক্ষিপ্তকারে সম্পাদনা করেছেন মাত্র। কাজেই বইটি থেকে পাত্রদের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আশানুরূপ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশে পাত্র সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ কোনো কাজ হয়নি। গবেষক ও লেখকগণ পাত্রদের বস্তুগত সংস্কৃতি নিয়েই আগ্রহী হয়েছেন বেশি। ফলে পাত্রদের নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক বিষয়ে গবেষণাধর্মী কাজের প্রয়াস লক্ষ করা যায় না। এসব কারণে অনেক ক্ষেত্রেই পাত্রদের ভাষা ও সংস্কৃতির বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা গবেষকদের অন্তর্দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়নি।

চতুর্থ অধ্যায়
নৃ-ভাষাবিজ্ঞানঃ তাত্ত্বিক বিবেচনা

ভাষা ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রকাশ মূলত ভাষা নির্ভর। এ কারণে সংস্কৃতির চারটি মৌলিক উপাদানের (মূল্যবোধ, আদর্শ, ভাষা ও প্রতীক) মধ্যে ভাষা অন্যতম উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। 'ভাষা হচ্ছে সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান উপদান। বলা যায় সংস্কৃতির সব চাইতে বড় নির্ভরযোগ্য এবং ব্যাপক বাহন বা মাধ্যম হচ্ছে ভাষা' (মানিক, ২০০১: ৫৫)। ভাষা যেমন যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত তেমনি এটি মানুষের জীবনধারণের উপায় হিসেবেও গণ্য হয়েছে। পৃথিবীর দীর্ঘদিনের ইতিহাসে এ সত্যটিই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই 'সমাজে জীবিকানির্বাহের প্রধান অবলম্বন বা উপায় বলে পরিগণিত হয়েছে ভাষা। প্রসঙ্গ অনুযায়ী যখন এটি ব্যবহৃত হয় তখন তা হয় সংস্কৃতিনির্ভর এবং বহুবিধ জটিল সংশ্রয়ে তা আবদ্ধ থাকে' (Kramsch, 1998: 3)।

সংস্কৃতির দুটি বড় বিভাজন হলো বস্তুগত সংস্কৃতি (concrete culture) ও অবস্তুগত সংস্কৃতি (abstract culture)। সংস্কৃতির যেসব উপাদান দৃশ্যমান তাকে বলা হয় বস্তুগত সংস্কৃতি। পোশাক-পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র, খাদ্যদ্রব্য ও এর উপাদান, খাদ্য সংগ্রহ, উৎপাদন ও প্রস্তুত করার যন্ত্রপাতি, পাত্র, আধার, পথঘাট, চিকিৎসাব্যবস্থার উপকরণ, ঘরবাড়ি, ধনদৌলত, যানবাহন ইত্যাদি বস্তুগত সংস্কৃতির অংশ। অন্যদিকে, সংস্কৃতির যে সব উপাদান দৃশ্যমান নয় কিন্তু তা অনুধাবন করা যায় তাকে বলা হয় অবস্তুগত সংস্কৃতি। যুক্তি, চিন্তা, কল্পনা, বিশ্বাস দিয়ে মানুষ সংস্কৃতির এ উপাদানটিকে বিকশিত করে তোলে। সংস্কৃতির বাস্তব উপাদানের পাশাপাশি তাই মানুষের মননশীলতার বিষয়াদিও সংস্কৃতির অংশ। 'মানসসম্পদ এই হিসাবে সমাজসৌধের শিখরচূড়া মাত্র (superstructure), সহজ কথায় উপরতলার উপকরণ' (হালদার, ১৯৭৬: ৪২)। অন্যদিকে, সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদান ও অবস্তুগত উপাদান- উভয় ক্ষেত্রেই ভাষার ভূমিকা অত্যাবশ্যক। ভাষার সাহায্যে সংস্কৃতির এসব উপাদান প্রকাশিত হয়। নৃবিজ্ঞানী বেনেডিকট সংস্কৃতির সংজ্ঞায় বলেছেন, 'Culture is that which binds men together- অর্থাৎ 'বহু মানুষকে যা একসূত্রে বাঁধে তাই তার সংস্কৃতি' (উদ্ধৃত, সরকার, ১৯৯১: ১৯)। ভাষার ক্ষেত্রেও এই কথাটি সমভাবে প্রযোজ্য। ভাষা ব্যতিরেকে সূচারুরূপে সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব নয়। কারণ সংস্কৃতির প্রকাশ ও বিকাশের মাধ্যম হলো ভাষা- এমনকি ভাষাই শিক্ষা ও যোগাযোগের বাহন। ভাষা একই সঙ্গে সংস্কৃতির বস্তুগত এবং অবস্তগত উপাদানকে প্রকাশ করে। ধ্বনি দিয়ে গঠিত শব্দ দৃশ্যমান হয়ে ওঠে এবং তা অদৃশ্যমান অর্থ প্রকাশ করে থাকে। এসব দিক বিবেচনা করে সংস্কৃতি প্রকাশের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে ভাষাকে গণ্য করা হয়েছে।

ভাষা যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম। আমরা এর সাহায্যে অপরের সঙ্গে সংজ্ঞাপন করে থাকি। তাই এটি আমাদের ভাব বিনিময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাহন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে (সরকার, ১৯৮৪)। ভাষার প্রাথমিক বা প্রধান কাজ হচ্ছে সংজ্ঞাপন করা। মনের ভাব ব্যক্ত করার জন্য আমরা ভাষার আশ্রয় নিয়ে থাকি। মতামত ব্যক্ত করার জন্যও আমরা ভাষা ব্যবহার করি। কেবল তা-ই নয়, তথ্য জানার জন্য আমরা অন্যদেরকে প্রশ্ন করি এবং তারা কোন কিছু জানতে চাইলে আমরা উত্তরে ভাষা ব্যবহার করি (Crystal, 2010)। এভাবে আমরা যে শব্দ বা ভাষা ব্যবহার করি তা আমাদের সংস্কৃতির পরিচায়ক। কারণ শব্দের মাধ্যমে বক্তার আচরণ, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয় (Kramsch, 1998)। আমাদের মতো প্রত্যেক সমাজের মানুষ একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে ভাষার সাহায্যে। 'সমাজে তারা যেভাবে একে অপরের সঙ্গে ভাষার মাধ্যমে সংজ্ঞাপন সম্পন্ন করে তাকে বলা যেতে পারে সামাজিক আচরণ' (Bartsch and Vennenmann, 1975:158)। এ ধারা প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান অবধি চর্চা হয়ে আসছে। উদাহরণস্বরূপ,

> হার্ডার মনে করিয়ে দেন যে আরবরা সিংহের জন্য পঞ্চাশটি, সাপের জন্য দু'শ, মধুর জন্য আশিটি এবং তলোয়ারের জন্য এক হাজারেরও বেশি শব্দ ব্যবহার করতোঃ তার মানে তখনো পর্যন্ত ইন্দ্রিয়গত বিশেষ্যের বিমূর্তায়ন সম্ভব হয়নি। তিনি, যারা ভাষার ঐশ্বরিক উৎস-এ বিশ্বাস করেন, তাদের সংশ্লেষে জিজ্ঞেস করেনঃ ঈশ্বর নিরর্থক শব্দ-বাহুল্য তৈরি করলো কেন? (উদ্ধৃত, ইসলাম, ১৯৯৭: ২৫-২৬)।

ভাষার মাধ্যমে এভাবে ভাষীর সাংস্কৃতিক বাস্তবতা প্রকাশিত হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে ভাষিক সম্প্রদায় আবার অভিজ্ঞতা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতা সৃজনেও সমর্থ হয়। ভাষী এ সৃজনশীলতা দৈনন্দিন বহুবিধ সংজ্ঞাপনে প্রয়োগে সমর্থ হয়। ভাষীরা, ভাষা প্রকাশে যেসব মাধ্যম ব্যবহার করে তাতে তাঁরা অর্থ আরোপ করেন; যেমন- টেলিফোনে সরাসরি কথা বলা, চিঠি লেখা বা বৈদ্যুতিক বার্তাপ্রেরণ, সংবাদপত্র পাঠ বা চিত্র তথা চার্ট ব্যাখ্যা করা ইত্যাদি। কথ্য, লেখ্য বা ভিজুয়াল যে মাধ্যমই হোক না কেন সবক্ষেত্রেই তাঁরা এমন অর্থসৃষ্টি করেন যাতে সমাজের সবাই বুঝতে সমর্থ হয়। উদাহরণস্বরূপ, বলা যেতে পারে বক্তার কণ্ঠের স্বর, শ্বাসাঘাত, সংজ্ঞাপনীয় কৌশল, অঙ্গভঙ্গি, মৌখিক ভঙ্গি ইত্যাদি (Kramsch 1998)।

মানুষের অভিজ্ঞতা অর্জনের সঙ্গে ভাষা ব্যবহারের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। এর সাহায্যে মানুষ পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ 'মানুষ যত অভিজ্ঞতা অর্জন করে, বিভিন্ন বস্তুকে তত বেশী করে তাদের নানা রূপে, নানা দিক থেকে জানতে পারে, সেই সাথে ভাষা তত সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে' (ইসলাম, ১৯৯৭: ২৬)। এভাবে মৌখিক ও অমৌখিক উভয় ক্ষেত্রেই ভাষার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক বাস্তবতা প্রকাশিত হয়। ভাষার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধও প্রকাশ পায়।

এজন্য ভাষাকে গণ্য করা যেতে পারে সামাজিক পরিচিতির মাধ্যম বলে। কেননা ভাষার মাধ্যমে ভাষাব্যবহারকারীর সংস্কৃতি শনাক্ত করা যায়। তাদের স্বর, শব্দভাণ্ডার, কথাবলার ধরন প্রভৃতির মাধ্যমে ভাষিক সম্প্রদায় নির্ধারিত হয়। বিচ্ছিন্ন সমগোত্রীয় ট্রোবিয়ান্ড সম্প্রদায়ের গবেষণায় ম্যালিনোস্কি দেখিয়েছেন যে, 'সমজাতীয় সাংস্কৃতিক অনুশীলন, দৈনন্দিন মিথস্ক্রিয়া, প্রভৃতি কার্যাদি সম্পন্ন জনগোষ্ঠী একই ভাষা সম্প্রদায় বলে বিবেচিত হয়' (উদ্ধৃত, Kramsch, 1998)। এভাবে ভাষা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক অন্বেষণে ভাষাবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও ভাষা-গবেষকগণ সংস্কৃতি নির্ভর নৃবিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটিয়েছেন যা বর্তমানে 'নৃভাষাবিজ্ঞান' হিসেবে আদৃত হয়েছে।

৪.১ নৃ-ভাষাবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

নৃভাষাবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নিরূপণের পূর্বে নৃবিজ্ঞানের স্বরূপ অন্বেষণ অত্যাবশ্যক। Anthropology শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে 'নৃবিজ্ঞান' শব্দটি বাংলায় ব্যবহৃত হয়েছে। তাই Anthropology শব্দের উৎস ও অর্থ অনুধাবনের মাধ্যমে এখানে নৃভাষাবিজ্ঞানের সংজ্ঞা প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে।

'গ্রীক 'anthropos' শব্দের অর্থ মানুষ, আর logia অর্থ পাঠ। তাই Anthropology শব্দের অর্থ মানুষ সম্পর্কিত পাঠ' (নকী ও রহমান, ১৯৮০: ১)। নৃবিজ্ঞানে মানুষের উৎপত্তি ও দৈহিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে যেমন আলোচনা করা হয়, তেমনি এ শাস্ত্রে মানুষের সংস্কৃতির বিশদ বর্ণনাও দেওয়া হয়ে থাকে। মানব প্রকৃতির বিভিন্ন দিক তাই এ শাস্ত্রের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। মানুষের অস্তিত্বের প্রশ্ন নিয়ে যেমন নৃবিজ্ঞানে আলোচনা করা হয়, তেমনি সেই অস্তিত্ব বিকাশের বিভিন্ন পর্যায় বিকাশের স্বরূপটিও উন্মোচন করে এ শাস্ত্র। নকী ও রহমান (১৯৮০: ৪) এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

> মানুষ নিয়ে অথবা তার প্রকৃতি (nature) নিয়ে যে বিজ্ঞান আলোচনা করে তাকে বলা হয় অ্যানথ্রপলজি (anthropology)। বাংলায় আমরা সাধারণত একে বলি নৃতত্ত্ব বা নৃ-বিজ্ঞান (নৃ= মানুষ)। মানুষের অস্তিত্বের দুটো দিক: দৈহিক (physical) ও মানসিক (mental)। নৃবিজ্ঞানেরও তাই দুটো দিক। এক দিককার আলোচ্য বিষয় হল মানুষের দৈহিক বৈশিষ্ট্য, প্রাণিজগতে মানুষের স্থান ও বর্তমান মানুষের আবির্ভাব হল কীভাবে তাই। অন্যদিকে নৃ-বিজ্ঞানের আর একটি দিকের আলোচ্য হল, মানুষ যা কিছু সৃষ্টি করেছে, তার উদ্ভব ও পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা। মানুষ যা কিছু সৃষ্টি করেছে তাকে সমগ্রভাবে নৃ-বিজ্ঞানে বলা হয় মানুষের সংস্কৃতি বা কালচার (culture)।

এ বিষয়ে Silverstein (1975:157) বলেছেন,

> To explain social behavior, Anthropologists speak in terms of a conceptual system called culture; to explain linguistic behavior in particular, and Linguists speak in terms of a conceptual system called grammar.

নৃতত্ত্বের কয়েকটি শাখা আছে। উদাহরণস্বরূপ, নৃতত্ত্বের যে শাখায় মানুষের দেহ ও দেহগত বেশিষ্ট্য এবং প্রাণী হিসেবে পৃথিবীর বুকে মানুষের আবির্ভাবের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে বলা হয় দৈহিক নৃতত্ত্ব (physical anthropology)। অন্যদিকে, নৃ-বিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচ্য বিষয় মানুষের সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ, তাকে বলা হয় সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব (cultural anthropology) (সামাদ, ১৯৬৭: বিষয়াভাস)। সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব বা নৃবিজ্ঞানে মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজের প্রথা ও আচার অনুষ্ঠান তথা এর উৎপত্তি ও বিকাশ পর্যবেক্ষণ দ্বারা সেগুলোর মধ্যে মিল ও অমিল অনুসন্ধান করা হয় সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে। নকী ও রহমানের (১৯৮০: ৪) উক্তিটি এখানে প্রণিধানযোগ্য-

> সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীগণ বিশ্বের বিভিন্ন আদিম জনগোষ্ঠীর রক্ত-সম্পর্ক, বিবাহ, পরিবার, বিবাহবিচ্ছেদ, উৎপাদন যন্ত্র ও কলাকৌশল, তাদের আইন, সামাজিক প্রথা, ঐতিহ্য, ধর্ম, যাদুবিদ্যা, বিশ্বাস ও তৎসম্পর্কিত আচরণবিধি, ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা তথা তাদের গোটা সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ে গবেষণা করেন।

সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের নিম্নলিখিত কয়েকটি উপবিভাগ রয়েছে-

ক) *এথনোগ্রাফি (Ethnography)*: এথনোগ্রাফি হচ্ছে মানবজাতির বিবরণমূলক বিদ্যা। এটিকে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এথনোগ্রাফি শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো মানুষ সম্পর্কে কিছু লেখা। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত জনগোষ্ঠি সম্পর্কে মিশনারি, ব্যবসায়ী, ভৌগোলিক আবিষ্কারক ও পদস্থ সামরিক কর্মচারী বর্ণনামূলক তথ্য লিপিবদ্ধ করে এথনোগ্রাফির রূপরেখা প্রদানে সমর্থ হয়েছেন (রহমান, ১৯৯৪)।

খ) *এথনোলজি (Ethnology)*: এথনোলজি হলো সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা বিষয়ক বিদ্যা। এথনোলজির আলোচনা বর্ণনামূলক এবং ইতিহাস নির্ভর। এথনোলজি সাংস্কৃতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে বলে একে 'cultural history' বা 'সাংস্কৃতিক ইতিহাস' বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। আদিম সমাজের জ্ঞাতি সম্পর্ক ও পারিবারিক, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, সরকার ও আইন, ধর্ম, বস্তুগত সংস্কৃতি, টেকনোলজি, ভাষা, শিল্পকলা, ভাস্কর্য, সংগীত, নৃত্য, লোক কাহিনী ও পুরাতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা করা হয় এখানে (রহমান, ১৯৯৪)।

গ) *সামাজিক নৃবিজ্ঞান (social anthropology)*: সামাজিক নৃবিজ্ঞানকে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের একটি উপশাখা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। র‍্যাড ক্লীপ ব্রাউনের নেতৃত্বে কয়েকজন ইংরেজ নৃবিজ্ঞানী সামাজিক-নৃবিজ্ঞানের প্রচলন করেন।

ঘ) *ভাষাতত্ত্ব (Linguistics)*: নৃভাষাবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ। এ সম্পর্ক নিরূপণে ভাষাতত্ত্বের তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি প্রায়োগিক আলোচনাও স্থান পায়। ভাষাতত্ত্বের মূল লক্ষ্য যেহেতু ভাষার বস্তুনিষ্ঠ তথ্য উন্মোচন করা, তাই এ আলোচনায় অন্যান্য শাস্ত্রও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে, কোনো জনগোষ্ঠির ভাষা আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তার সংস্কৃতির আলোচনা। অনেকক্ষেত্রে তাই নৃভাষাবিজ্ঞান বর্ণনায় ভাষা, সংস্কৃতি, মানুষের উদ্ভবের ইতিহাস, বিভিন্ন সমাজের ভাষা ও সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা প্রভৃতি স্থান পায়। এমনকি ভাষাতত্ত্বের জ্ঞানের সাহায্যে বা প্রায়োগিক ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে ভাষা ও সংস্কৃতির উদ্ভব এবং বিকাশ নিরূপণ করা হয়। প্রসঙ্গত, রহমানের (১৯৯৪: ১৯) নিচের উক্তিটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে-

> ভাষা সংস্কৃতির বাহন। সেজন্য উন্নত দেশে নৃবিজ্ঞান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ভাষাতত্ত্ব অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। শিল্পকলা ও সাহিত্যে (Art and Literature) সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিফলন ঘটে। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান তার গবেষণায় কলা ও সাহিত্যের সাহায্য গ্রহণ করে।

৪.১.১ *নৃ-ভাষাবিজ্ঞানের প্রামাণ্য সংজ্ঞা*

নৃভাষাবিজ্ঞানকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন নৃভাষাবিজ্ঞানী, ভাষাবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও ভাষাগবেষকগণ। নিচে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো।

১. anthropolological linguistics The study of relation between language and culture. Anthropologists generally find it necessary to learn the languages of the people they are studying, and they realized early that the languages that investigation (Trask, 2004:15).

২. Anthropological or ethno-linguistics and sociolinguistics focus on languages as part of culture and society, including language and culture, social class, ethnicity, and gender (Fromkin, 2000:4)

৩. Anthropological linguistics is a subdisicipline within the discipline of anthropology. It grew out of the anthropological concern for unwritten exotic languages and was and remains firmly grounded in both field linguistics and linguistic methodology (Klein, ? Overview)।

৪. Linguistic Anthropology is one of many disciplines dedicated to the study of the role of languages (and the language faculty) in these and the many other activities that make up the social life of individuals and communities (Duranti, 2009:1)।

৪.২ নৃ-ভাষাবিজ্ঞান (anthropological linguistics) ও ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানের (linguistic anthropology) সম্পর্ক

নৃভাষাবিজ্ঞানের কয়েকটি পরিভাষা রয়েছে। এর মধ্যে ভাষাতাত্ত্বিক-নৃবিজ্ঞান (linguistic Anthropology), জাতি-নৃবিজ্ঞান (ethnolinguistics), নৃভাষাবিজ্ঞান (anthropological linguistics) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণে এসব পরিভাষার সৃষ্টি হয়েছে। নৃবিজ্ঞানীগণ মনে করেন, নৃভাষাবিজ্ঞান নৃবিজ্ঞানেরই একটি শাখা; কাজেই এর সঙ্গে ভাষাবিজ্ঞানের পার্থক্য বিদ্যমান। এ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে নৃভাষাবিজ্ঞান ও ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান সমার্থক নয়। অর্থাৎ নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষা ও সংস্কৃতির আলোচনাকে তাঁরা ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন। নৃবিজ্ঞানীদের আলোচনার সঙ্গে ভাষাবিজ্ঞানীদের পার্থক্য রয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানীগণ ভাষা ও সংস্কৃতি আলোচনায় নিবিষ্ট হয়েছেন ঠিকই কিন্তু তাঁদের আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে ভাষাবৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ। তাঁরা ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষা ও সংস্কৃতির আলোচনাকে নৃভাষাবিজ্ঞান বলে বিবেচনা করেছেন। কারণ ভাষাবিজ্ঞানীগণ, নৃভাষাবিজ্ঞানকে ভাষাবিজ্ঞানের শাখা হিসেবে বিবেচনা করেছেন; বিশেষ করে তাঁরা এ শাস্ত্রকে প্রায়োগিক ভাষাবিজ্ঞানের একটি শাখা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

কোনো কোনো নৃবিজ্ঞানী নৃভাষাবিজ্ঞান (anthropological linguistics) অভিধা স্বীকার করেননি। তাঁরা বলেছেন নৃভাষাবিজ্ঞান (anthropological linguistics) বলতে কিছু নেই-

> There is Linguistics, there is linguistics in anthropology, and there is linguistics anthropology, but if we wish our terms to have unambiguous and pertinent reference, there is no anthropological linguistics (উদ্ধৃত, Teeter, 1964: 878)।

সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে ভাষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ভাষার বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করা হয় ভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্রে। আর নৃবিজ্ঞানে আলোচনা করা হয় মানুষের দৈহিক বিবর্তন ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলি। ভাষাবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের মিথস্ক্রিয়া ঘটে ভাষার মাধ্যমে। ভাষাবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের আন্তঃশৃঙ্খলার নাম নৃভাষাবিজ্ঞান। ডেল হাইমস (১৯৬৩), নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষার আলোচনাকে নৃভাষাবিজ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতে, '...The study of speech and language within the context of anthropology' (Duranti, 1997: 2)। Duranti (১৯৯৭) ভাষার অধ্যয়নকে সংস্কৃতি অনুশীলনের

বিষয় হিসেবে দেখেছেন '... as the study of language as a cultural resource and speaking as a cultural practice' (Duranti, 1997: 2)।

নৃভাষাবিজ্ঞান আলোচনা করতে গিয়ে নৃবিজ্ঞানী ও ভাষাবিজ্ঞানীগণ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নৃবিজ্ঞানের আরো কয়েকটি শাখার উল্লেখ করেছেন– ক) প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান (archaeological anthropology), দৈহিক/ জৈবিক নৃবিজ্ঞান (biological anthropology), সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান (sociocultural anthropology) ভাষানৃবিজ্ঞান (linguistic anthropology) বা নৃভাষাবিজ্ঞান (anthropological linguistics)। নৃভাষাবিজ্ঞান এই চারটি শাখার মধ্যে অন্যতম একটি শাখা। নৃবিজ্ঞানীগণ ভাষানৃবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনায় প্রয়াসী হয়েছেন এবং তাঁরা এ আলোচনায় নৃবিজ্ঞানকে বেশি গুরুত দিয়েছেন। অন্যদিকে একে ভাষাবিজ্ঞানীগণ নৃ-ভাষাবিজ্ঞান আখ্যায়িত করেছেন এবং তাঁরা মানব সংস্কৃতির বিস্তারিত ব্যাখ্যায় ভাষার গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তাঁদের আলোচনায় ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রপঞ্চ সংশ্লিষ্ট হয়েছে। এ অর্থে নৃ-ভাষাবিজ্ঞানের মূল আলোচনা হলো ভাষাতাত্ত্বিক নিয়ম শৃঙ্খলা যথাযথভাবে প্রয়োগ করা বরং সাংস্কৃতিক আবহে ভাষার ব্যবহারকে গুরুত্ব দেওয়া এবং সংস্কৃতির বিকাশ, সামাজিক-রীতি ও সাংস্কৃতিক সংশ্রয়ের সাহচর্য এবং মানুষের অস্তিত্বের বস্তুগত সম্পর্ক নিরূপণ করা।

নৃ-ভাষাবিজ্ঞানকে বর্তমানে স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নৃবিজ্ঞানে তথ্য সংগ্রহ করার রীতিকে জাতিতত্ত্ব (Ethnography) বা অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ (Participant Observation) বলে। নৃ-ভাষাবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য হলো অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা। এ প্রসঙ্গে Danesi (2004:1) বলেন,

> The real goal of Anthropological Linguistics (AL) is to study language by gathering data directly from native speakers, known as ethnography or participant observation, the central idea behind this approach is that linguist can get a better understanding of a language and its relation to the overall culture by witnessing the language used in its natural social context.

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নৃ-ভাষাবিজ্ঞানে আলোচনা করা হয় ভাষা ও সংস্কৃতি, মানব-জীববিজ্ঞান, বোধ ও ভাষার মধ্যকার সম্পর্ক। ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানকে (যা নৃবিজ্ঞানের একটি শাখা) এটি ছাড়িয়ে যায় এবং মানষের ব্যবহৃত ভাষা নিয়ে তা আলোচনা করে।

৪.৩ নৃ-ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাস

নৃ-ভাষাবিজ্ঞান চর্চার উদ্ভব ঠিক কবে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। তবে এ কথা বলা যেতে পারে যে, মানুষের আবির্ভাব কাল থেকেই তার সংস্কৃতির যাত্রা শুরু হয়েছে। তাই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এ শাস্ত্রের উদ্ভব বিশ শতকে হলেও ভাষা, সংস্কৃতি ও মানুষের বিবর্তন সম্পর্কিত চিন্তা ভাবনা শুরু হয়েছে অতি প্রাচীনকাল থেকেই। মানব সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রথম আলোচনা করেন গ্রীক ও রোমানরা। গ্রিক মনীষী হেরোডটাস (৪৮৪-৪২৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) পঞ্চাশটিরও বেশি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন আশ্রিত গোষ্ঠিগুলির ভাষা, বস্তুগত সংস্কৃতি, বিয়ে ও বিবাহ-বিবাহ বিচ্ছেদের নিয়ম-কানুন, আইন সরকার, যুদ্ধের ধরন ও ধর্মের পরিচয় প্রভৃতি বিষয় (সুলতানা, ২০০৩)। এরপর পিথাগোরাস ও তাঁর শিষ্যরা সমাজ সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। 'তাঁরা সমাজকে বিভিন্ন উপাদানের তৈরি এক সিস্টেমের বলে উল্লেখ করেছিলেন' (উদ্ধৃত, নাসিমা, ২০০৩: ৬৪)। 'সম্ভবত নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয় জেনোফেইনস (৫৭০-৪৭৫ খ্রি.পূ.) দ্বারা। গ্রীক এই মানুষটি বহু স্থানে ভ্রমণের উদ্দেশে যান; দার্শনিকদের মধ্যে তিনিই প্রথম যিনি এ ধারণাটি প্রকাশ করেন যে, সমাজ হচ্ছে মানুষের সৃষ্টি' (আহমেদ ও চৌধুরী, ২০০৩: ৮)। মানব সমাজের প্রকৃতি ও বিকাশ সম্পর্কে নানান ভাবনা প্রাচীনকালে সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল, হেরোডেটাস প্রমুখ মানুষের মধ্যে মিল অমিল নিয়ে যে চিন্তা ভাবনা করেছেন তা নৃবিজ্ঞানের প্রাথমিক পর্ব বলে গণ্য করা যেতে পারে। মানুষের স্বরূপ অন্বেষণে তাঁরা মানষের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে গভীর অন্তর্জাত প্রেরণার স্বাক্ষর রেখেছেন। কাজেই তাঁদের আলোচনাকে নৃ-ভাষাবিজ্ঞানের প্রাথমিক আলোচনা বললে একেবারে অত্যুক্তি হবে না।

মধ্যযুগীয় লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আলবিরুণী। অনেকে তাঁকে প্রথম নৃবিজ্ঞানী বলে অভিহিত করেছেন। 'নৃবিজ্ঞান চর্চার দুটি মূল পদ্ধতি ব্যবহারের সচেতন প্রাথমিক প্রয়াস লক্ষ করা যায় আলবিরুণীর লেখায়। এই দুটি পদ্ধতি হল তুলনামূলক পদ্ধতি (comparative method) এবং পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (observational method)' (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১৩: ২১)। অপর একজন মধ্যযুগীয় পণ্ডিত হলেন ইবন খালদুন। তিনি ছিলেন চতুর্দশ শতকের আরব দার্শনিক ও ঐতিহাসিক। তার এ ধারার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো 'কিতা আল-ইবার (kita al-ibar), যা তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশের নাম মুকাদ্দিমা, যার ইংরেজি শিরোনাম prolegema to universal history, বাংলায় 'সর্বজনীন ইতিহাসের ভূমিকা' (সেন, ২০০৮: ৩২)। এতে তিনি সামাজিক সংহতি (social cohesion), আদিবাসিত্ব (tribalism), গোষ্ঠি সংবদ্ধতা (group solidarity) ইত্যাদি ধারণা প্রদান করেন।

ভাষার জন্ম রহস্য উদঘাটনে মানুষ আজীবন সচেষ্ট থেকেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৭৮৬ সালে ভাষার জন্ম রহস্য ভিত্তিক আলোচনা নতুন দিগন্তের সূচনা করে। এ সালে প্রভাবশালী ইংরেজ পণ্ডিত স্যার উইলিয়াম জোন্স (১৭৪৬-১৭৯৪) সংস্কৃত, গ্রিক ও লাতিন ভাষা একই উৎস থেকে জাত বলে মন্তব্য করেন। Beeman (2012: 531) উল্লেখ করেছেন– 'Sir William Jones in the late 18th century set the stage for intensive work in comparative historical linguistics that continues to the present days'। ভাষাবংশের আলোচনার মাধ্যমে ভাষার বংশ শ্রেণিকরণ তখন থেকেই শুরু হয়; এরই ধারাবাহিকতায় উনিশ শতকে ভাষাবিজ্ঞানের যাত্রা সূচিত হয়। তখন থেকেই ভাষাকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক আলোচনার প্রেক্ষাপট তৈরি হয় এবং নৃবিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটে। ভাষাবিজ্ঞানে এ সংক্রান্ত নানাবিধ প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচিত হয়েছে। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ভাষাবিজ্ঞানে ভাষা ও সংস্কৃতির আলোচনা-পর্যালোচনা লক্ষ করা যায়। এরই ধারাবাহিকতায় আলাদা শাস্ত্র হিসেবে ভাষাবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা 'নৃ-ভাষাবিজ্ঞান'- এর যাত্রা শুরু হয় ১৯৫০ এর দশকে (Danesi, 2004)। এ শাস্ত্রে তুলনামূলক ভাষা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আদিম ভাষার উৎপত্তি, বিকাশ ও বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণ প্রণালির ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে অর্থাৎ এ আলোচনায় জাতিতত্ত্ব সংশ্লিষ্ট হয়। 'কিসিং তাঁর 'Cultural Anthropology' গ্রন্থে ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান (linguistic anthropology) কথাটি ব্যবহার করেছেন। দেখা যায় যে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান অনেক ক্ষেত্রে ভাষাতত্ত্ব থেকে প্রচুর তত্ত্ব সংগ্রহ করে থাকে (নকী ও রহমান, ১৯৮০:৬)। নৃ-ভাষাবিজ্ঞান অর্থে পূর্বে জাতি ভাষাতত্ত্ব (ethnolinguistics) অভিধা ব্যবহার করা হতো। ক্ষুদ্রজাতিসত্তার সমস্যা উদঘাটন ও বাস্তব সমস্যা নিরসনে এ অভিধা প্রয়োগ করা হয়েছে। কালক্রমে ক্ষুদ্রজাতিসত্তার ভাষাবিশ্লেষণে ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে এবং কোনো ভাষিক সম্প্রদায়ের ভাব ও ভাষা নিয়ে সূক্ষাতিসূক্ষ্ম গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। এভাবে বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নৃতাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞান (ethno linguistics) পরিচিতি লাভ করে নৃ-ভাষাবিজ্ঞান (anthropological linguistics) হিসেবে (Crystal, 1971)। Anthropological Linguistics বা নৃভাষাবিজ্ঞানকে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন অভিধা দেওয়া হয়েছে, যেমন-ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ethno linguistics এর সমার্থক শব্দ হিসেবে রুশ ভাষায় ethnolingvistika, ফরাশিতে ethnolinguistique, জার্মানে Ethnolinguistk, স্প্যানিশে Ethnolinguistca এবং পোর্তগিজে ethnolinguistca ইত্যাদি। ১৯৪০ ও ১৯৫০ এর দশকে আমেরিকায় নৃ-ভাষাবিজ্ঞান বলতে নৃতাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞান (ethnolinguistics) অভিধা ব্যবহৃত হত। তবে ইউরোপ মহাদেশে এ শব্দের প্রয়োগ প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান অবধি পরিলক্ষিত হয়। ইউরোপ মহাদেশে নৃবিজ্ঞানের সমার্থক শব্দ হিসেবে নৃতত্ত্বের (anthropology) প্রচলন এর একটি প্রধান কারণ হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে নৃতাত্ত্বিক ভাষাতত্ত্ব/

নৃভাষাবিজ্ঞান (anthropological linguistics/linguistic anthropology) ভাষা ও সংস্কৃতির অধ্যয়নে নৃবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। (Duranti (1997: 2) এর আলোচনায়ও এর পরিচয় পাওয়া যায়-

> Linguistic anthropology, over both anthropological linguistics and ethnolinguistics is part of a conscious attempt at consolidating and redefining the study of language and culture as one of the major subfields of anthropology.

সব মিলিয়ে নৃ-ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে-

ক) আমেরিকার নৃ-ভাষাবিজ্ঞান চর্চা

খ) ইউরোপের নৃ-ভাষাবিজ্ঞান চর্চা

ক) *আমেরিকার ন-ৃভাষাবিজ্ঞান চর্চা*: আমেরিকার নৃ-ভাষাবিজ্ঞানের পুরোধা হিসেবে যাঁদের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন- ফ্রানজ বোয়াস, এডওয়ার্ড সাপির, বেনজামিন লি হোর্ফ, হ্যারি হোযার, লিওনার্দো ব্লুমফিল্ড, ক্রোবার, ভজেলিন প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানী। নৃবিজ্ঞানে ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব প্রথম পরিচিত করে তোলেন ফ্রানজ বোয়াস। তিনি ১৮৫৮ সালে জার্মানির ওয়েস্টফালিয়াতে জনগ্রহণ করেন এবং ১৮৯২ সালে আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভ করেন। তিনি হাইডেলবার্গ, বন ও কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র ও ভূগোলে পড়াশুনা করেন। তিনি সাংস্কৃতিক, দৈহিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানের সমন্বয়ে একটি অধি-শৃঙ্খলা (sub-discipline) গঠন করেন। মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত বিশ শতকের আমেরিকান নৃবিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে ফ্রান্স বোয়াস প্রশ্নাতীত অবদান রেখেছেন। ফ্রান্জ বোয়াসের আলোচনায় নৃ-ভাষাবিজ্ঞানের কয়েকটি দিক প্রাধান্য পেয়েছে; যেমন- ফিল্ডওয়ার্ক (fieldwork), অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ (participant observation), ভাষা-আপেক্ষিকতা (linguistic realitivity) ও সার্বিকতত্ত্ব (theory of holism), প্রকৃতি ও সংস্কৃতির (nature and culture) পার্থক্য, সংস্কৃতি আলোচনায় ভাষার গুরুত্ব প্রভৃতি। নিচে এসব বিষয়সমূহ সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হল।

ফিল্ডওয়ার্ক (fieldwork): প্রাথমিক পর্বে নৃ-ভাষাবিজ্ঞানে মাঠ গবেষণার উদাহরণ হিসেবে ফ্রান্জ বোয়াসের (১৮৫৮-১৯৪২) গবেষণাকর্ম গুরুত্বের সঙ্গে স্মরণীয়। ''তাঁর মতে, মাঠ-গবেষণা ছাড়া নৃবিজ্ঞানের কোন তত্ত্বই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বোয়াসের ভাষায়- ... there must be based upon objective empirical data'' (উদ্ধৃত, সরকার, ২০০৯: ১৫)। ফ্রান্জ বোয়াস তাঁর প্রথম ফিল্ডওয়ার্ক

শুরু করেন ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ব্যাফিন দ্বীপে (Baffin Island) একদল এস্কিমোদের মধ্যে। কারণ তিনি প্রথম উপলব্ধি করেন অন্যকে জানতে হলে প্রথমে দরকার অন্য মানুষের জীবনপ্রণালি সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এর জন্য প্রয়োজন ফিল্ড ওয়ার্ক বা অন্য মানুষের জীবন প্রণালি সম্পর্কে গবেষণার উপাদান সংগ্রহ করা। উপাদান সংগ্রহ করতে হলে নৃবিজ্ঞানীকে অন্য মানুষের সঙ্গে দীর্ঘকাল বাস করতে হয়। মন্তাজ (২০১৩: ৬৩) এ প্রসঙ্গে বলেছেন–

> অন্য কোনো সমাজে বা নিজের সমাজেই, সমাজের একজন হয়ে গবেষণার উপাদান সংগ্রহ করার যে রীতি তার প্রচলন শুরু হয় বোয়াসের সময়কাল থেকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে বোয়াস এই রীতির প্রবর্তক। এজন্য অনেকেই তাঁকে আধুনিক নৃবিজ্ঞানের জনকরূপে অভিহিত করেন।

বোয়াস এস্কিমোদের জীবনপ্রণালি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে উপলব্ধি করলেন যে, গবেষণা করতে হলে কোন যন্ত্রপাতির প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধু এস্কিমোদের উপস্থিতি। এস্কিমোদের সংস্কৃতির যে ধারা, তা লিপিবদ্ধ করতে হলে প্রয়োজন এস্কিমোদের সঙ্গে থেকে তা ভালভাবে লক্ষ করা। ইসলাম (১৯৮৯: ১৭) বলেছেন–

> সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি পালন করে, অংশগ্রহণ করে, সমাজে প্রচলিত ব্রতাদি উদযাপন করে, এক কথায় সমাজের মানুষের সঙ্গে মিশে যেয়ে তাদের জীবনযাত্রা প্রণালীর প্রত্যক্ষ অংশীদার হয়ে মানববিজ্ঞানীকে বিবরণ সংগ্রহ করতে হয়। আর এই রীতিই মানববিজ্ঞানের সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ রীতি। এই প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে রীতির ওপর ভিত্তি করেই মানববিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র (theroies) গড়ে উঠেছে।

অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ (participant observation): মানুষের সংস্কৃতি বুঝতে হলে তাঁদের সঙ্গে মিশতে হয়। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে তাদের স্বরূপ অবগত হতে হয়। এ জন্য মাঠগবেষণা বা ফিল্ডওয়ার্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফিল্ড ওয়ার্ক একটি বিশেষ নিয়ম (method) নয় বরং কতকগুলো রীতির সমষ্টি। এই রীতিগুলোর মধ্যে সর্বাগ্রে স্থান পায় অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ। এই রীতিতে মানববিজ্ঞানীকে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হয়। ইসলাম আবারও (১৯৮৯: ২০) উল্লেখ করেছেন-

> সমাজের মানুষ তাদের প্রতিদিনকার আচার-অনুষ্ঠানে, আহারে-বিহারে, আনন্দ-উৎসবে, নাচ-গানে ঝগড়া-বিবাদে, সুখে-দুঃখে যেভাবে সময় অতিবাহিত করে, মানববিজ্ঞানী তাতে পরিপূর্ণভাবে যোগ দিয়ে তা শুধু অবলোকনই করেন না, বস্তুত অনুধাবনও করেন। এর ফলে

> মানববিজ্ঞানী প্রতিটি অনুষ্ঠানের বা রীতিনীতির নিগূঢ় বা অন্তর্নিহিত ভাবটিকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়।

ভাষা আপেক্ষিকতা (linguistic relativity): ভাষা ও চিন্তার সম্পর্ক রয়েছে। ভাষা চিন্তাকে যেমন প্রভাবিত করে তেমনই চিন্তার মধ্য দিয়েও ভাষা প্রকাশিত হয়। চিন্তা ও ভাষার এই সম্পর্কে ভাষা আপেক্ষিকতা বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কোনো গোষ্ঠি সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বিচারের ক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট সেই গোষ্ঠির সংস্কৃতির মূল্যবোধ, আদর্শ দিয়ে তা বিচার করাই সমীচীন। কারণ প্রত্যেক সমাজের নিজস্ব নিয়ম কানুন ও প্রথা বিদ্যমান থাকে। কাজেই ঐ সমাজকে জানতে হলে তার নির্দিষ্ট মূল্যবোধ, আদর্শ ও প্রচলিত প্রথাকে গুরুত্ব দিয়েই বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয়। ইসলাম (১৯৮৯: ২০) বলেছেন–

> আমরা প্রাচ্যের অধিবাসী পাশ্চাত্য দেশের সংস্কৃতিকে বিচার করার ক্ষেত্রে প্রাচ্যের মূল্যবোধ দিয়ে দেখলে অবিচার করা হবে। যেমনি অবিচার পাশ্চাত্য দেশের অনেকেই প্রাচ্যের সংস্কৃতিকে করে গেছে। মনে রাখতে হবে যে অন্যের সংস্কৃতির মূল্য নিরূপণ করার ক্ষেত্রে তাদের মূল্যবোধকেই মাপকাঠি করে নিতে হবে, আমাদের নিজস্ব মূল্যবোধের মাপকাঠি দিয়ে নয়।

সংস্কৃতি সম্পর্কে এরূপ চেতনাকে বলা হয়ে থাকে সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদ (cultural relativism)। ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক নিবিড়। বোয়াস মনে করেন, ভাষা ও সংস্কৃতি অন্তরঙ্গ সম্পর্কে যুক্ত: ভাষার সঙ্গে একটা সংস্কৃতির আচার, প্রথা, বিশ্বাস ও জীবনধারার গভীরতর সম্পর্ক রয়েছে। সঙ্গত কারণেই ভিন্ন সংস্কৃতির বিশদ ও গভীর পর্যালোচনার জন্য নৃবিজ্ঞানীর অনুসন্ধানের ক্ষেত্র হওয়া উচিত ভাষা (উদ্ধৃত-সালাহউদ্দীন, ২০০৮)। বোয়াস দেখিয়েছেন যে, গঠনগত ও সামাজিক দিক থেকে প্রত্যেক সমাজের নির্দিষ্ট একটি প্যাটার্ন থাকে। ভাষার মাধ্যমে সমাজের এই প্যাটার্ন প্রতিফলিত হয়। বোয়াসের এই মতবাদ 'ভাষিক আপেক্ষিকতাবাদ' (linguistic realitivism) নামে পরিচিত (Beeman, 2012)।

সার্বিকতত্ত্ব (theory of holism): কোন সংস্কৃতিকে বিচার করতে গিয়ে তা আংশিকভাবে দেখলে চলবে না, তা দেখতে হবে সামগ্রিকভাবে। ইসলাম (১৯৮৯: ২২) বলেছেন–

> অর্থাৎ গ্রহণকারী পর্যবেক্ষক তার বিবরণ সংগ্রহ পর্যায় থেকে তার বিবরণ বিশ্লেষণ পর্যায় পর্যন্ত (Ethnography to Ethnology) সর্বদাই সংস্কৃতিকে খণ্ড খণ্ড করে না দেখে একটি সামগ্রিক বা সার্বিক রূপ দেখার চেষ্টা করবে। ধর্ম, অর্থনীতি বা অন্য কোন অংশকে এককরূপে বিবেচনা না করে তাদের মধ্যে যে এক পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে সে বিষয়ে পর্যবেক্ষককে ওয়াকিবহাল হতে হবে।

প্রকৃতি ও সংস্কৃতি (nature and culture) : মানুষের জীবনের সার্বিক জীবনব্যবস্থাই হলো তার সংস্কৃতি। সংস্কৃতি অর্জিত, আহরিত বা শিক্ষালব্ধ, আর প্রকৃতি সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত। তাই প্রকৃতি ও সংস্কৃতির পার্থক্য সহজেই অনুমেয়। 'প্রকৃতি ও সংস্কৃতির বৈপরীত্যকে মার্কিন নৃবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় কৌতূহল করে তোলার কৃতিত্ব জর্মনি থেকে আগত ফ্রানস বোয়াসের' (সালাহউদ্দীন, ২০০৮: ১৮-৫৫)।

সংস্কৃতি আলোচনায় ভাষার গুরুত্ব: ভাষা মানুষকে অন্য প্রাণী থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। ভাষার মাধ্যমে মানুষ এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে অথবা তার সমকালীন প্রজন্মেরর সঙ্গে সংজ্ঞাপন করে থাকে। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে শব্দ সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে একটি সভ্যতা টিকে থাকে। কোন জনগোষ্ঠির সবাই যদি রাতারাতি তাদের ভাষা ভুলে যায় তাহলে পরের দিন থেকে ঐ জাতির নতুন পৃথিবী শুরু হবে। তাই আক্ষরিক অর্থে নতুন শব্দই নতুন জ্ঞান পুনর্নির্মাণে সহায়তা করে (Danesi, 2004)।

সংস্কৃতি আলোচনায় ফ্রান্জ বোয়াস ভাষার আলোচনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এ বিষয়ে আইয়ুব (২০০৮: ১৮) উল্লেখ করেছেন–

> উত্তর পশ্চিম উপকূলের এস্কিমো ও কাওয়াকিউল ইন্ডিয়ানদের ভেতর গবেষণার ভিত্তিতে মার্কিন নৃবিজ্ঞানের প্রতিভু ফ্রান্যস বোয়াস (১৮৫৮-১৯৪২) এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ভিন্ন একটা সংস্কৃতি বুঝবার প্রথম শর্ত ওই ভাষার ওপর সরাসরি অধিকার। শুধু যে প্রাকটিক্যাল কারণে তা নয়, বোয়াসের মতে, ভাষা ও সংস্কৃতি অন্তরঙ্গ সম্পর্কে যুক্ত: ভাষার সঙ্গে একটা সংস্কৃতির আচার, প্রথা, বিশ্বাস ও জীবনধারার গভীরতর সম্পর্ক বিদ্যমান। তাঁর মতে, ভিন্ন সংস্কৃতির বিশদ ও গভীর পর্যালোচনার জন্য নৃবিজ্ঞানীর অনুসন্ধানের ক্ষেত্র হওয়া উচিত তার ভাষা; কারণ ভাষার প্রশ্নকে প্রধান করে না দেখলে ভিন্ন সংস্কৃতির অন্তর্লোক অনাবিষ্কৃত থেকে যাবে।

আমেরিকায় নৃ-ভাষাবিজ্ঞানের যাত্রা বোয়াসের মাধ্যমে শুরু হলেও বোয়াসের পূর্বে এ নিয়ে কেউ আলোচনা করেননি এমন সিদ্ধান্তে সহজেই উপনীত হওয়া যায় না। কারণ ভাষাবিজ্ঞানী হুমবোল্ডট অনেক আগেই নৃভাষাবিজ্ঞানের ধারণা দিয়েছিলেন। জন ওসলি পাউয়েল (John Osley Pawel) নৃ-ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় অবদান রেখেছেন। তিনি উত্তর আমেরিকার আদিবাসীদের কাজে ভাষা ও সংস্কৃতি গবেষণায় বোয়াসকে উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। পাউয়েল আদিবাসীদের ভাষা নিয়ে গবেষণা করে তাদের বংশগত সম্পর্ক নির্ণয় করতে চেয়েছিলেন। আমেরিকার নৃতাত্ত্বিক ব্যুরোও তাঁর কাজে সহায়তা করেছিলেন। এ সংগঠনটি ভাষা ও সংস্কৃতির সমতা নির্ধারণে সচেষ্ট ছিলেন। তাই বোয়াস অনুভব করেছিলেন যে, ভাষার উপরিতলের সঙ্গে সংস্কৃতির কোন সম্পর্ক নেই, তবে ভাষা আলোচনা ছাড়া

সংস্কৃতি বোঝা যায় না কোন মতেই। সংস্কৃতির কিছু বিষয় থাকে যা মনোগত ব্যাপার, উপরিতলের হিসেব নিকেশ দিয়ে বিচার করা চলে না। বোয়াস পাউয়েলের মত পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেন। পাউয়েল মনে করতেন, সংস্কৃতি ও ভাষা এ দ্বিবিধ অভিধা বিবর্তনমূলক; তাই বোয়াস এর বিপরীতে অবস্থান নেন। তিনি মনে করেন, ভাষা ও সংস্কৃতি বিবর্তনমূলক অভিধা নয় বরং কোনো সংস্কৃতি ও ভাষার মধ্যে অধিকাংশ মিল থাকলেও তাদের মধ্যে অমিলও কম নয়। ভাষা ও সংস্কৃতিকে দেখতে হবে নির্দিষ্ট সংস্কৃতির বিশ্বাস, প্রথা ও মূল্যবোধ দিয়ে।

ভাষাকে সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রাথমিক শর্ত হিসেবে বিবেচনা করেছেন বোয়াসের শিষ্য ভাষাতাত্ত্বিক এডওয়ার্ড স্যাপির। ভাষার বিকাশ ও সংস্কৃতির বিকাশকে তিনি সমান্তরাল হিসেবে বিবেচনা করেছেন। সাপিরের কাজের বৃহত্তর অংশ ছিল নৃ-ভাষাবিজ্ঞান নিয়ে, তাঁর নৃতাত্ত্বিক গবেষণার কেন্দ্রভাগও ভাষাকেন্দ্রিক। ভাষা গবেষণায় সাপিরের কাজের পরিধি বিস্তৃত। ভাষা বিশ্লেষণে তিনি মনোগত ও সাংস্কৃতিক–এই দ্বিবিধ বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি গুরুত্ব দিয়ে ধ্বনিমূলের আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'The psychological reality of the phoneme' এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ প্রবন্ধে তিনি ধ্বনিমূলকে কেবল ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের উপাদান হিসেবে ভাবেননি বরং এটিকে তিনি বোধগত দিক থেকে বিচার করেছেন। তিনি 'A study in phonetic symbolism' প্রবন্ধে বিশুদ্ধ ধ্বনি ও মানুষের ব্যবহৃত ধ্বনির অর্থ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া স্যাপির ভাষা ও লিঙ্গ, ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব, মনোভাষাতত্ত্ব এবং আমেরিকার নেটিভদের ভাষা আলোচনায় পথিকৃৎ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। Beeman (2012: 533) বলেছেন–

> তাঁর এই কাজ হোর্ফিয়ান হাইফোথিসিস বা স্যাপির-হোফ হাইপোথিসিস (Sapir-Whorf Hypothesis) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। স্যাপির ভাষাকে ভেবেছেন সংস্কৃতির প্রতীকী গাইড (the symbolic guide to culture) হিসেবে। এ সম্পর্কিত তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ হলো 'The Grammarian and his Language'। তিনি বলেন, ভাষা হলো এক ছাঁকনির মতো যার মধ্য দিয়ে মানুষের জগৎ ও তার সকল বোধ, উপলব্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি অনবরত পরিশোধিত হয়ে চলেছে। ভাষার ছাঁকনির মধ্য দিয়ে যেপরিশোধিত সাংস্কৃতিক জগতের জন্ম, তার মাধ্যমে আমরা সংজ্ঞাপন করে থাকি (গবেষক কর্তৃক অনূদিত)।

আইয়ুব (২০০৮: ১৮) উল্লেখ করেছেন–

> ১৯৩১ সালে প্রকাশিত *Encyclopedia of social Sciences* নামক প্রবন্ধে তিনি সংজ্ঞাপনে আচরণবাদী তত্ত্বের অবতারণা করেন। এ প্রবন্ধে স্যাপির প্রতিটি সাংস্কৃতিক ছাঁচ (pattern) এবং প্রত্যেক একক সামাজিক আচরণে সংজ্ঞাপন অন্তর্ভুক্ত হয়- তা হতে পারে অন্তর্গত ও

> বহির্গত ধারণা এই মত প্রতিষ্ঠা করেন। 'শাপির - হোর্ফ বারবার বলার চেষ্টা করেন যে, চিন্তা বলে আমরা যেসব জিনিসকে শনাক্ত করি, ভাষাকে বাদ দিয়ে, অগ্রাহ্য করে কিংবা তার পরপারে, ওর কোন স্বতন্ত্র অন্তঃসার নেই।

জার্মান ভাষাবিজ্ঞানী কার্ল বুইলার ১৯৩৪ সালে তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধে ভাষাতাত্ত্বিক তত্ত্ব প্রচার করেন। তিনি দেখান যে, ভাষা চারটি উপাদানে গঠিত- কথক (speaker), শ্রোতা (hearer), চিহ্ন (sign) ও বস্তু (object) এবং এর আছে তিনটি কাজ- প্রকাশ (expessive- চিহ্ন ও কথকের সমন্বয়), আবেদন (appeal-চিহ্ন ও শ্রোতার সমন্বয়), বস্তুগত (referential-চিহ্ন ও বস্তুর সমন্বয়)। পূর্ববর্তী এসব প্রত্যয় সমালোচনা করে ক্লদ শ্যানন (Klaude Shannon) ও ওয়ারেন ওয়েভার (Warren Weaver) যৌথভাবে ১৯৪৮ সালে সংজ্ঞাপনে গাণিতিক মডেল (mathematical model) আবিষ্কার করেন। এ তত্ত্ব খুব প্রভাব বিস্তার করে এবং সংজ্ঞাপনে যে কোন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়াদি বাদ দেয়া হয়। তাঁরা এ ক্ষেত্রে ছয়টি উপাদান দেখান- একটি উৎস (a source), একজন এনকোডার (an encoder), একটি বার্তা (a message), একটি চ্যানেল (a channel), একজন ডিকোডার (a decoder) এবং একজন গ্রাহক (a receiver)। রোমান ইয়াকবসন বুইলার ও শ্যানন-ওয়েভারের মডেলকে একই বলে মন্তব্য করেন।

সাপিরের সাংস্কৃতিক ধারণাকে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন তাঁর ছাত্র বেনজামিন লি হোর্ফ (Benjamin Lee Whorf)। তিনি হোপিদের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। হোর্ফ স্যাপিরের সংস্কৃতি ও ভাষা আলোচনাকে সুদৃঢ় সংগঠনের ভিত্তি তৈরি করেন। হোর্ফ মনে করেন যে, ভাষা চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। ভাষার ব্যাকরণিক সূত্র কেবল জগতের বস্তকে প্রকাশ করে তাই নয়; তা মানুষের চিন্তাকেও রূপান্তর করতে সহায়তা করে- একে বলা হয় linguistic relativity। হোর্ফের এসব চিন্তা ভাষা ও সংস্কৃতির অধ্যয়নে সবিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশেষ করে স্যাপির-হোর্ফ অনুকল্প (Sapir-Whorf Hypothesis) ভাষা, চিন্তা ও সংস্কৃতি গবেষণায় অনন্য সাধারণ কাজ বলে বিবেচিত হয়েছে। ১৯২০-১৯৬০ সাল পর্যন্ত আমেরিকার নৃভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে এডওয়ার্ড স্যাপির ও বেনজামিন লি হোর্ফ প্রভাব বিস্তারকারী হিসেবে গণ্য হয়েছিলেন। তাঁদের আলোচনা ব্যাপৃত ছিল আমেরিকার নেটিভদের ভাষা ও সংস্কৃতি অন্বেষণে। তাঁদের ভাষা আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে ভাষার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়-ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্ব। হোর্ফের নৃ-ভাষাবৈজ্ঞানিক চিন্তাকে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর ছাত্র হেরি হোয়ার (Harry Hojer)।

আমেরিকায় সাপির হোর্ফের প্রচেষ্টায় নৃ-ভাষাবিজ্ঞানের বিকাশলগ্নে ইংল্যান্ডে এ শাস্ত্রের বিকাশ ঘটান সমাজ-নৃবিজ্ঞানী ব্রনিস্লো কাসপার ম্যালিনোস্কি। তিনি পোল্যান্ডের ক্রাকোতে ৭ ই এপ্রিল ১৮৮৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৮ সালে তিনি পদার্থবিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রে পি.এইচ.ডি লাভ করেন। জেসম

ফ্রেজারের 'The Golden Bough' পাঠ করে তিনি নৃবিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য ১৯১০ সালে লন্ডনে যান। ম্যালিনোস্কি ট্রবিয়ান্ড দ্বীপবাসীদের সমীক্ষা করার জন্য নিউগিনিতে কয়েকবার গমন করেন। এ মাঠকর্ম ভাষাবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে সমধিক পরিচিত। 'তিনি ছিলেন মূলত সমাজবিজ্ঞানী এবং তাঁর হাতে নৃভাষাবিজ্ঞানের এরূপ বিকাশকে অনেকে দেখেছেন 'অপ্রত্যাশিত উৎস হিসেবে' (Beeman, 2012: 533)। ম্যালিনোস্কির পূর্বে নৃবিজ্ঞানীগণ মাঠ গবেষণা সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করলেও তাতে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ছিল এ কথা বলার অবকাশ নেই। ম্যালিনোস্কিই প্রথম নিবিড় প্রত্যক্ষানুসন্ধানমূলক (intensive field work) একটি বিজ্ঞানসম্মত সুশৃঙ্খল ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেন। তিনি একজন স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকারী হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার ট্রবিয়ান্ড (Trobriand) দ্বীপপুঞ্জের আদি মানুষের উপর এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। 'তিনি কেবল মাঠ গবেষণা পরিচালিত করেননি, মাঠ গবেষণার রীতিনীতিও পরিচালনা করেছেন। সামাজিক নৃবিজ্ঞানে তাঁর জরিপ-পদ্ধতি জাতিতাত্ত্বিক (ethnographic) জরিপ পদ্ধতি নামে সমধিক পরিচিত' (সরকার, ২০০৯: ১৬)।

ম্যালিনোস্কি মনে করেন, জাতিতত্ত্ব হলো সংস্কৃতির বিবরণ মাত্র। তাই ম্যালিনোস্কির মূল কথা হলো একটি সমাজের সংস্কৃতির নানাবিধ উপাদান ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা করাই হচ্ছে নৃবিজ্ঞানীর প্রধান কাজ। তিনি মনে করেন, intensive field work এ উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হওয়া উচিত। একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠির মৌল বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে হলে নৃবিজ্ঞানীকে ঐ জনগোষ্ঠির সঙ্গে মিশে গিয়ে একজন বাস্তব বিশ্বজনীন (true cosmoplitan) হয়ে উঠতে হবে। তিনি বলেন, এ উদ্দেশ্যে একজন নৃবিজ্ঞানীর কর্তব্য হলো- অর্থাৎ স্থানীয় জনগোষ্ঠির সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়া। এজন্যে ম্যালিনোস্কি প্রশ্নোত্তর নয়, বরং পর্যবেক্ষণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। কারণ প্রশ্নোত্তরের সময় একজন মানুষ বাস্তব সত্য ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যেতে পারেন। কিন্তু পর্যবেক্ষণের সময় তার আচার-আচরণ-সংস্কৃতি অবচেতনভাবেই ধরা পড়ে যাবে। এ পর্যবেক্ষণই হচ্ছে নৃবিজ্ঞানীর তথ্য-উৎস। আধুনিক নৃবিজ্ঞানে গবেষণা-পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এটিকে ম্যালিনোস্কির যুগান্তকারী অবদান বলে উল্লেখ করা হয় (সরকার, ২০০৯)।

নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় সাফল্য অর্জনের জন্য ম্যালিনোস্কি মনে করেন গবেষককে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে–

১. আদিবাসী কোনো জনসমষ্টির সংগঠন ও তাঁদের সংস্কৃতির মৌল বৈশিষ্ট্যসমূহ সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে রেকর্ড করতে হবে। এজন্য পরিসংখ্যানমূলক তথ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহ করাও প্রয়োজন।

২. আদিম জনগোষ্ঠির প্রাত্যহিক জীবনাচারণের সঙ্গে গবেষককে ঘনিষ্ঠ হয়ে তাদের জাতিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যাবলি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তের সুস্পষ্ট ও বিস্তৃত বিবরণ জাতিতাত্ত্বিক দিনপঞ্জির পাতায় নিয়মিতভাবে লিখে রাখতে হবে। কেবল এভাবেই নিবিড় গবেষণার মৌল উদ্দেশ্য সাধনকল্পে একটি আদিম জনগোষ্ঠির জীবনচিত্র তুলে ধরা সম্ভব।

৩. দেশীয় জনগোষ্ঠির মানসদৃষ্টি দিয়ে জাতিতাত্ত্বিক বিবরণ, জনগোষ্ঠির বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র আচার-আচরণ, বিশ্বাস, তাদের লোকায়ত সংস্কৃতির উপাদানসমূহ, এবং জাদু ও ধর্মীয় বিশ্বাসগত মৌল বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যবেক্ষণ করতে হবে' (মন্তাজ, ২০১৩: ৩২)।

১৯৫০-১৯৭০ সাল পর্যন্ত সময়কে ভাষাবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীগণ নৃভাষাবিজ্ঞানের বিকাশ কাল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ সময় ভাষাবিজ্ঞানী ও ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীগণ যৌথ প্রয়াসে নৃভাষাবিজ্ঞান গবেষণার জন্য পদ্ধতি প্রচলন করেন যা জাতিতাত্ত্বিক অর্থবিজ্ঞান (ethnographic semantics), নব জাতিতত্ত্ব (new ethnography) ও জাতিবিজ্ঞান (ethnoscience) ইত্যাদি নামে পরিচিত। তাঁরা মনে করেন, জাতিতাত্ত্বিক গবেষক যদি জনগণের মধ্যে ব্যবহৃত শ্রেণিকরণ (categorization) অনুধাবন করতে পারেন, তাহলে তাদের সাংস্কৃতিক আচরণ সহজেই বোঝা যাবে। এ গবেষণা দ্রুত সময়ের মধ্যেই জনগণের মধ্যে নানা প্রশ্নের অবতারণা করলো, তবে সাংস্কৃতিক কর্মপরিচালনায় শ্রেণিকরণের জন্য এসব অভিধার যৌক্তিকতা তাঁরা মেনে নিলেন। ফলে নৃতাত্ত্বিক উদ্ভিদবিজ্ঞান (Ethno-botany), নৃতাত্ত্বিক প্রাণিবিজ্ঞান (Ethno-Zoology) প্রভৃতি শ্রেণিকরণ প্রক্রিয়া তখন থেকেই শুরু হলো আনুষ্ঠানিকভাবে (Beeman, 2012)।

ভাষাবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী ও সমাজভাষাবিজ্ঞানীগণ ভাষা ও সংস্কৃতি আলোচনায় অভিনিবিষ্ট হন। এই ধারাবাহিকতায় নৃভাষাবিজ্ঞানে সূত্রপাত হয় এই ষাটের দশকেই।

এর পরবর্তী দশকগুলোতে সমাজভাষাবিজ্ঞানীগণ সমাজ, ভাষা, সংস্কৃতিকেন্দ্রিক নিরন্তর চর্চা অব্যাহত রেখেছেন। ১৯৭০-১৯৯০ সাল পর্যন্ত সময়ে নৃভাষাবিজ্ঞান, ভাষা-আন্তঃক্রিয়া ও সামাজিক জীবনের উন্নত মডেল নিয়ে গবেষণায় রত হন। ১৯৫০ এর দশকে নৃভাষাবিজ্ঞানীগণ ভাষাবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা সমাজভাষাবিজ্ঞানের (socilolinguistics) উদ্ভব ঘটান। পরবর্তীকালে ডেল হাইমস ও জন গাম্পার্য জাতিতাত্ত্বিক সংজ্ঞাপন (the ethnography of communication) ধারণা প্রদান করেন। সমাজভাষাবিজ্ঞানকে ডেলহাইমস অভিহিত করেছেন 'সামাজিকভাবে বাস্তব ভাষাবিজ্ঞান' (socially

realistic linguistics) নামে, কারণ এটি সামাজিক জীবনে ব্যবহৃত ভাষার সংগঠন নিয়ে আলোচনা করে (Beeman, 2012)।

আমেরিকার নৃভাষাবিজ্ঞানী ডেল হাইমস ১৯৭০ সালে the ethnography of communication অভিধা প্রদান করেন। এটিকে আবার ethnography of speaking নামেও অভিহিত করা হয়। সমাজভাষাবিজ্ঞানের মূল আলোচনার বিষয় হলো কোন নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠির ভাষা, সংস্কৃতি, ভাষাবৈচিত্র্য প্রভৃতি। উদাহরণস্বরূপ, চার্লস ফার্গুসন (Charles Ferguson) ও জন গাম্পার্য (John Gumperz) ভাষা আলোচনায় গুণাত্মক পদ্ধতিকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তথ্যদাতা, আনুষ্ঠানিক পর্যবেক্ষণ এবং প্রশ্নমালা প্রণয়নের মাধ্যমে ভাষা গবেষণায় মনোনিবেশ করেছেন। এরপর উইলিয়াম লেবোভ ভাষার পরিবর্তন ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞাতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করেছেন এবং তিনি তাতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রাম্য ভাষাকে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। সমাজভাষাবিজ্ঞানে লেভোবের গবেষণার ধরনকে বলা হয় সংখ্যাতাত্ত্বিক (quantitative), ম্যাক্রো বা আরবান (macro or urban)। আর গাম্পার্যের ভাষা গবেষণা নির্ভরশীল গুণাত্মক (qualitative), মাইক্রো বা মিথস্ক্রিয়া সংক্রান্ত (micro or interactional)। ১৯৬০ এর দশকে গাম্পার্য ও হাইমস সমাজভাষাবিজ্ঞান বুঝাতে নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের নানা প্রত্যয় ব্যবহার করেছেন। সমাজভাষাবিজ্ঞানীগণ ১৯৭০ সালের পূর্ব পর্যন্ত জাতিতাত্ত্বিক ভাষা আলোচনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। ১৯৭৪ সালে ডেল হাউমসের প্রবন্ধ Foundatinons in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach' প্রকাশের পর এ ধারণার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ডেলহাইমস দীর্ঘদিন 'Language in Society' নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন; এ পত্রিকায় তিনি সমাজভাষাবিজ্ঞান ও নৃ-ভাষাবিজ্ঞানকে স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে আলোচনা না করে একত্রে আলোচনা করেন। ১৯৮০ সালের মধ্যভাগের পূর্বপর্যন্ত এ দুটি শাস্ত্রের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নির্ণিত হয়নি। ১৯৮০ সালের পর থেকে এ দুটি শাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য সূচনা করেন ভাষাবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীগণ। এ বিভাজনে গুরুত্ব পেয়েছে তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত দিক। অধিকাংশ সমাজভাষাবিজ্ঞানী যাঁরা সংখ্যাত্মক (qualitative) পদ্ধতিকে গুরুত্ব দেন তাঁরা এখনও ১৯৬০ এর দশকে উত্থাপিত লেবভের পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন। সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে ভাষীর কাছ থেকে সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহ করা হয় এ পদ্ধতিতে। এ গবেষণার ফলে সংজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব কাজ সম্পাদিত হয়েছে; বিশেষ করে সমাজভাষাবিজ্ঞানের সামাজিক শ্রেণি, লিঙ্গ, বয়স ইত্যাদি বিষয় বিশদ আলোচিত হয়েছে। এরূপ গবেষণা অবশ্য নৃভাষাবিজ্ঞানীগণকে আকৃষ্ট করতে পারেনি, নৃ-ভাষাবিজ্ঞানীদের অনেকেই তা সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁরা সমাজভাষাবিজ্ঞানীদের গবেষণা পদ্ধতির যেসব সমস্যা নির্দেশ করেছেন, তা দুরান্তি (Duranti) (2009: 7) দেখিয়েছেন এভাবে–

১। সমাজভাষাবিজ্ঞানীদের সামাজিক স্তর বিন্যাস, লিঙ্গ, সেক্স, বংশ এবং প্রজন্মের স্বতন্ত্র বৈচিত্র্য সামাজিক বিজ্ঞানে গৃহীত হয়নি; নৃবিজ্ঞানে তা আরো বেশি প্রযোজ্য।

১৯৮০ এর দশকে সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এ সংক্রান্ত প্রচুর প্রবন্ধ লেখা হয় যা ছিল মূলত সংস্কৃতিকে আশ্রয় করে। এর অধিকাংশই সংখ্যাত্মক সমাজবিজ্ঞানের বিপরীতধর্মী লেখা।

২। প্রসঙ্গকে বিচার করা হয় পরিবর্তিত অবস্থার ভিত্তিতে কিন্তু তাতে সংখ্যাত্মক সমাজবিজ্ঞানের ধারণা অনুপস্থিত।

৩। সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ভাষীর তথ্য রেকর্ড করে নিয়ে আসা, যা সমাজভাষাবিজ্ঞানের প্রধান গুরুত্বের বিষয়, নৃ-ভাষাবিজ্ঞানীরা মানতে নারাজ; কারণ তাঁরা মনে করেন, এভাবে তাৎক্ষণিক সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে সঠিক ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন, এটি মূলত একভাষী বিশিষ্ট সাক্ষাৎকার হয়ে থাকে। এর পরিবর্তে মাঠ গবেষণার গুরুত্ব বেশি বলে তাঁরা মত দিয়েছেন (৭, গবেষক কর্তৃক অনূদিত)।

তবে ভাষা ও সংস্কৃতি এবং জাতিতাত্ত্বিক সংজ্ঞাপনের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয় এ সময় থেকে। এ দিকটি বিচার করে ভাষাবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীগণ সমাজভাষাবিজ্ঞানকে নৃ-ভাষাবিজ্ঞানের পরিপূরক শাস্ত্র হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

নৃ-ভাষাবিজ্ঞানীগণ বর্তমানে উপলব্ধি করেছেন যে, ভাষাকে বুঝতে হলে তা সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গকে গুরুত্ব দিয়ে আলোকপাত করতে হবে; এতে প্রয়োজন জটিল ভাষাতাত্ত্বিক ব্যবহার জানা। সমাজভাষাবিজ্ঞানীগণ বিষয়টিকে কথামালা (discourse) বলে অভিহিত করেছেন। জন গাম্পার্য যিনি এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন; তিনি বলেছেন যে এ সময়ে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতার কারণে ডিসকোর্সের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সম্ভব ছিল না। এ কারণে স্যাপিরের সময়ে রেকর্ডিং, লিপ্যন্তর এবং মৌখিক বচনের বিশ্লেষণ বর্তমানের ন্যায় এতটা সহজ ছিল না। একই সমাজের নানা সামাজিক গ্রুপের কথামালার বিভিন্ন স্টাইল থাকতে পারে। এই পার্থক্য অনেক সময় ঐ গ্রুপের সংজ্ঞাপনে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। এমনকি একজন উপলব্ধি করতে পারেন যে, একই ভাষায় কথা বললে এ সমস্যার সৃষ্টি হয় না। মার্কিন সমাজের নারী-পুরুষের ভাষার বৈচিত্র্য অন্বেষণে জনপ্রিয় নাম দেবোরা টেনেন (Deborah Tannen)। তাঁর পথ অনুসরণ করে জেন হিল (Jane Hill) আমেরিকার দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের দ্বিভাষিক স্প্যানিশ/ ইংরেজ সম্প্রদায়ের ডিসকোর্সের সংগঠনের বৈচিত্র্য অনুসন্ধান করেছেন। জে জে গাম্পার্য, ডেল হাইমসের পথ অনুসরণ করে বিভিন্ন ভাষার ভদ্রতা, আন্তরিকতা, উচ্চমানতার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন বিভিন্ন নৃ-ভাষাবিজ্ঞানী। প্রকাশিত সংজ্ঞাপন, যেমন- কবিতা, রূপক, বাচনিক শিল্প মানবজীবনের সংজ্ঞাপন-দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সংজ্ঞাপনে কাব্যিক-সংগঠন অনুসন্ধানে অগ্রণী হলেন পল ফেডরিখ

(Paul Friedrich)। এ বিষয়ে রোমান ইয়াকবসনের ১৯৬০ সালে সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ পাঠ দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। ধর্মীয় ও প্রাত্যহিক জীবনে এই রূপক ও প্রতীকের গুরুত্ব রয়েছে। তবে এ সময়ে নৃবিজ্ঞানীগণের আলোচনা কেন্দ্রীভূত ছিল ডিসকোর্সের মাধ্যমে রূপক কীভাবে সৃষ্টি করা যায় তা নিয়ে। George Lakoff ও Mark Johnson এর *Metaphors we live by* প্রকাশের পর এসংক্রান্ত আলোচনার পথ আরো প্রসারিত হয়। নৃভাষাবিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ভাষাবিজ্ঞানের মধ্যে যে দূরত্ব ছিল তা সাংস্কৃতিক জীবনের আবশ্যকতা গবেষণা করে কিছুটা হ্রাস করেন জেমস ফার্নান্দেজ (James Fernandez)। প্রকাশিত সংস্কৃতি হচ্ছে সংস্কৃতির প্রধান অনুঘটক এবং তা নৃ-ভাষাবিজ্ঞানীদের মূল আলোচনার বিষয় (উদ্ধৃত, Beeman, 2012)।

উল্লেখ্য যে, বাচনিক শিল্প যেমন বক্তৃতা, বিবৃতি, নাটকের পারফরমেন্স, দর্শক প্রভৃতি মানবজীবনের সবচেয়ে জটিল এবং প্রত্যক্ষ ডিসকোর্স। রিচার্ড বাউমেন (Richard Bauman) ২০০৩ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধে সংস্কৃতির দৃষ্টিতে বাচনিক শিল্পের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। তিনি মনে করেন, মানুষের সংজ্ঞাপন খুবই জটিল এবং কৌতূহলের ব্যাপার; এর মধ্যে বাচনিক শিল্প বেশি আনন্দদায়ক। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নির্দিষ্ট অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে তা সমাপন হয়ে থাকে। সঙ্গত কারণেই ডিসকোর্সের আলোচনা এসব ক্ষেত্রে অতীব গুরত্বপূর্ণ বলে ভাষাবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীদের নিকট বিবেচিত হয়েছে। এ কারণে এ বিষয়ের আলোচনাও সুলভ। বর্তমানে কাব্যিক-কৃতি, কাব্যিক ডিসকোর্স, এবং রাজনৈতিক অলঙ্কার যা সমাজ জীবনে প্রায়োগিক প্রভাব বিস্তার করে সেসব বিষয় নিয়ে অনেক কাজ পরিলক্ষিত হয়।

৪.৪ উপসংহার

বর্তমান যান্ত্রিক যুগ এবং যন্ত্রের কল্যাণে ভাষাবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের আলোচনা আরও প্রসারিত হয়েছে। তাই নৃ-ভাষাবিজ্ঞান মানুষের সংজ্ঞাপনের বহুবিধ বৈচিত্র অন্বেষণে ব্যাপৃত হয়েছে। ভাষার রীতিনীতি বিষয়ক আলোচনায় ভাষাবিজ্ঞানে ব্যবহৃত হচ্ছে নতুন প্রযুক্তি ও কৌশল; আর নৃবিজ্ঞানে আলোচিত হচ্ছে সংস্কৃতির ভিত্তিতে এসব কৌশলের সুবিস্তৃত প্রয়োগ। ফলে নতুন প্রযুক্তি ও কৌশল কেবল ভাষা অধ্যয়ন ও অন্বেষণে ব্যবহৃতই হচ্ছে না, তা প্রায়োগিক জীবনে মানুষের সংজ্ঞাপনের ধরনও পাল্টে দিয়েছে। প্রাসঙ্গিক কারণেই নৃ-ভাষাবিজ্ঞানীগণ এসব বিষয় নৃ-ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এমনকি সংজ্ঞাপনে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার ন-ৃভাষাবিজ্ঞানে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়ে আসছে। অদূর ভবিষ্যতে এ সংক্রান্ত আলোচনায় নৃ-ভাষাবিজ্ঞানের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশে নৃ-ভাষাবিজ্ঞান চর্চা

সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির সম্মিলন ঘটেছে। এ কারণে বাাংলাদেশের সংস্কৃতি 'সংকর সংস্কৃতি' নামে অভিহিত। বিশেষ করে, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব বাংলাদেশী সংস্কৃতিতে সংযোজিত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশের নৃ-ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় তাই প্রাচীন ভারতীয় নৃ-ভাষাবিজ্ঞান চর্চার বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে। পরিশেষে বাংলাদেশে নৃ-ভাষাবিজ্ঞান চর্চার দিক-দিগন্ত তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এ অধ্যায়ে।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশে নানা জাতি ও বর্ণের বসবাস ছিল। আর্যরা এ উপমহাদেশে আসার আগে অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয় সম্প্রদায়ের লোক এখানে বাস করতেন। তাঁদের ভাষা, সংস্কৃতি ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় অন্বেষণে বিভিন্ন সময় নিয়োজিত হয়েছেন ভাষাবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী ও ভাষাগবেষকগণ। বিশেষ করে, নৃবিজ্ঞানীগণ এ উপমহাদেশের মানুষের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় উদঘাটনের নিমিত্তে এ অঞ্চলে বসবাসরত মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার দ্বার উন্মোচন করেছেন। এ প্রসঙ্গে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের আলোচনা উল্লেখযোগ্য। রহিম ও অন্যান্য (২০০৬: ২১) এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন-

> কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র মানুষের ব্যবহার ও বৈশিষ্ট্য নানাভাবে বোঝার চেষ্টা করেছে। সেই সঙ্গে এই সমস্ত ব্যবহারের, গোষ্ঠীর কোথাও কোথাও শ্রেণিকরণ করেছেন কৌটিল্য। সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে বাংলা সম্বন্ধে বিধৃত তথ্যই এতদঞ্চল সম্পর্কে প্রাচীনতম তথ্য।

এরপর উল্লেখযোগ্য নাম হলো বাণভট্ট। আলবিরুণীর পূর্বে তাঁর নাম পাওয়া যায়। তিনি হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক ছিলেন। বাণভট্ট ছিলেন সভাকবি ও ঐতিহাসিক। তাঁর আলোচনায় সমাজ-সংস্কৃতির উল্লেখ আছে। এ প্রসঙ্গে বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৩: ২১) এক্ষেত্রে লিখেছেন–

> হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক ঐতিহাসিক ও সভাকবি বাণভট্টের লেখায় নৃবিজ্ঞানের তথ্যাবলির সচেতন ও উৎকৃষ্ট সমাবেশ রয়েছে। এজন্য তাঁকে ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম নৃবিজ্ঞানী বলতেও দ্বিধা করা হয়নি। এবং কালের বিচারে তিনি আলবিরুণীর পূর্ববর্তী। তাহলে কি বাণভট্টই প্রথম নৃবিজ্ঞানী- এ বিষয়ে আরও আলোচনা ও বিশ্লেষণ ব্যতীত কোনো শেষ সিদ্ধান্ত করা উচিত নয়। তা সত্ত্বেও বাণভট্টের অবদান আমাদের স্বীকার করতেই হবে।

ইউরোপ ও আমেরিকায় যেভাবে নৃবিজ্ঞানের তথা নৃ-ভাষাবিজ্ঞানের চর্চা হয়েছে, ভারতবর্ষে সে বিচারে কম চর্চা হয়নি। ভারতবর্ষে নৃ-ভাষাবিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসনের হাত ধরে এবং তাতে অংশ নিয়েছেন বিদেশি প্রশাসক ও মিশনারি। ক্রমে ক্রমে এ চর্চা দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে। কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা এ অঞ্চলের নৃ-ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পর মনে করা হয় যে, এদেশে নৃবিজ্ঞান চর্চার বীজ বপন করা হল। সেজন্য সব নৃবিজ্ঞানীই ভারতে এ বিষয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের সূচনা এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা কাল থেকেই বলে মনে করেন (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১৩)। ফলে গবেষকগণ প্রতিষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে মানুষের কল্যাণধর্মী নানা বিষয় নিয়ে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় এই সোসাইটি থেকে সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। জোনস এবং তাঁর সতীর্থরা মিলে এশিয়াটিক সোসাইটিকে কেন্দ্র করে প্রাচ্যচর্চার যে দ্বার উন্মোচন করেছিলেন, 'তার ফলে আমরা আমাদের প্রাচীন সভ্যতার সন্ধান পেয়েছি। আমরা তাঁর মাধ্যমেই জানতে পেরেছি যে, ভারতীয় সভ্যতা পশ্চিম ইউরোপীয় সভ্যতার চেয়ে অনেক পুরনো এবং অনেক এগিয়ে' (ইসলাম, ২০০৮: ২৩৭-২৪০)।

এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালের দ্বিতীয় সংখ্যায় নেপালের সামরিক আদিবাসী গোষ্ঠি নিয়ে হাউটন যে প্রবন্ধ লিখলেন তাতে বাংলাদেশের নৃ-ভাষাবিজ্ঞান চর্চার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে নিচের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য-

> হাউটনই সর্বপ্রথম এদেশে পরিভাষাগত অর্থে এথনোগ্রাফি শব্দটি ব্যবহার করেন। হিমালয় পাদদেশে অঞ্চলের এথনোগ্রাফি আলোচনা করেন তিনি। ভারতে নৃবিজ্ঞান চর্চার সূচনায় বিদেশি গবেষক, প্রশাসক এবং মিশনারিদের অবদান অনস্বীকার্য। ভারতের আদিবাসী ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর উপর এবং উল্লেখযোগ্য গবেষণা তাঁরা করেছেন। এ প্রসঙ্গে ডালটন, থার্সটন, রাসেল, রিসলে, হান্টার প্রমুখ ব্যক্তির করতে হয়। এ ক্ষেত্রে হার্বার্ট হোপ রিসলের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৩ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে তিনি 'Notes on Anthropology' নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ প্রকাশ করেন। ইতিপূর্বে তিনি যে জাতিগোষ্ঠি নিয়ে আকর-প্রতিম আলোচনা করেন তারই পদচিহ্ন ধরে বলা যায় নৃবিজ্ঞানে অনুপ্রবেশ ঘটে এল. কে. অনন্তকৃষ্ণ আইয়ারের। এইকুস্টেড যাকে 'Father of Indian Anthropology and Ethnology' বলে অভিহিত করেছেন (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১৩: ২৮)।

অধ্যাপক ডি, এন মজুমদার, অধ্যাপক ললিতপ্রসাদ বিদ্যার্থী, ড. বিমানকুমার দাশগুপ্ত প্রমুখ ভারতীয় নৃবিজ্ঞানের ইতিহাস অন্বেষণে নিয়োজিত হয়েছেন। তাঁরা ভারতীয় নৃবিজ্ঞানের

ইতিহাসের প্রারম্ভকাল দেখিয়েছেন ১৭৮৪ সাল। ঐ বছর কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি গঠন করেন স্যার উইলিয়াম জোনস। বসু ভারতীয় নৃবিজ্ঞানের বিষয়গত বিভাজন করেছেন নিম্নোক্তভাবে-

'১ আদিবাসী ও জাতি গোষ্ঠীগুলিকে নিয়ে রচিত কোষ গ্রন্থ

২ বিবরণাত্মক রচনা (monograph)

৩ পরিবার, বিবাহ, আত্মীয়তা, গ্রাম ইত্যাদির বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা' (উদ্ধৃত, বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১৩: ২৭)।

১৯০১ সালে রিজলে (H H Risely) সর্বভারতীয় এথনোগ্রাফিক সার্ভে করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সেই অনুযায়ী দেশীয় রাজাদের শাসিত রাজ্যগুলিতেও (princely states) এই সমীক্ষা সংঘটিত হবে স্থির হয়। বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৩: ২৮-২৯) আবার বলেছেন–

> অনন্তকৃষ্ণ সে সময় তাঁর নিজের রাজ্য কোচিনে এই সমীক্ষা কর্মের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। ১৯০২ সাল থেকে এই সমীক্ষা কার্য শুরু হয়। নিবিড় ক্ষেত্র সমীক্ষার মধ্য দিয়ে এই রাজ্যের জাতি ও জনজাতি গোষ্ঠীগুলির বিবরণ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করতে থাকেন অনন্তকৃষ্ণ। বলা যায়, তাঁর হাতেই ভারতবর্ষে নৃবিজ্ঞানে প্রথম ক্ষেত্র সমীক্ষার (fieldwork) সূচনা।

বিশ শতকের শুরুতেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞানের পঠন পাঠন শুরু হয়েছিল। ১৯১৭ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক দর্শনের পাঠক্রমে নৃবিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত হয়। আবার ১৯১৮ সালে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে পড়ানো হত নৃবিজ্ঞান। ভারতবর্ষে প্রথম স্বতন্ত্র নৃবিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয় ১৯২০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। রমাপ্রসাদ চন্দ্র বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। কেবল ভারতে নয়, এশিয়া মহাদেশেও এটি বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে প্রথম নৃবিজ্ঞান বিভাগ (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১৩)। রমাপ্রসাদ চন্দ্রের পর ১৯২২ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত ১১ বছর অনন্তকৃষ্ণ আইয়ার এই বিভাগের প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন। এরপর নৃবিজ্ঞানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে এ বিভাগে যোগ দেন ক্ষিতিশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৩: ২৯) বলেছেন–

> অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রখ্যাত নৃবিজ্ঞানী রিভার্সের কাছে নৃবিজ্ঞানের পাঠ লাভ করেন। ১৯৩৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি। পরবর্তী সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন বিশিষ্ট পণ্ডিত অধ্যাপকেরা নৃবিজ্ঞান বিভাগে পড়িয়েছেন, তেমনি এখান থেকে পাস করা বহু ছাত্রছাত্রী নৃবিজ্ঞানে দিকপাল ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। এর পাশাপাশি আরও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞান বিভাগের সূচনা হয়েছে; কলেজ স্তরে এর পঠন পাঠন শুরু হয়েছে। তাছাড়া ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত

‘Anthropological survey of India’র সার্ভের মতো পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সরকারের অধীনস্থ নৃবিজ্ঞানের গবেষণা সংস্থা, ভারতে এ বিষয়ে চর্চাকে প্রসারিত করেছে।

এভাবে ভাষা ও সংস্কৃতির যে চর্চা শুরু হয়েছিল এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়। ১৯৫০ সালে এর সূচনা হয় লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যলয়ে আর ১৯৫২ সালে এর সূচনা গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। কলেজ স্তরে এর সূচনা বঙ্গবাসী কলেজে ১৯৩৬ সালে (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১৩)।

বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি আলোচনায় অনেকেই অবদান রেখেছেন। এ গবেষণায় উল্লেখযোগ্য নাম হচ্ছে ‘সুকুমার সেন, ডি এন বসু, আফিয়া দিল, মঞ্জুলী ঘোষ, নির্মল দাস, রাজীব হুমায়ুন, মনসুর মুসা, পবিত্র সরকার, মনিরুজ্জামান, উদয় নারায়ন সিংহ, খন্দকার আজিজুল হক, মৃণাল নাথ প্রমুখ’ (হুমায়ুন, ২০০১: ১৬)। বাংলাভাষী অঞ্চলে নারী ও পুরুষের ভাষা নিয়ে আগ্রহ দেখিয়েছেন অনেকেই। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম সুকুমার সেন। তিনি ১৯২৭ সালে ‘বাঙলায় নারীর ভাষা’ শীর্ষক একটি প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ রচনা করেন। সমাজভাষাবিজ্ঞানের উদ্ভবের পর ‘word’ পত্রিকায় আফিয়া দিল এর সুবিখ্যাত প্রবন্ধ ‘Bengali baby talk’ প্রকাশিত হয় ১৯৭১ সালে। এই ধারাবাহিকতায় সমাজ, সংস্কৃতি ও নৃবিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন পঠন পাঠনের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৪০ সালে বিনয় ঘোষ রচনা করেন ‘শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সমাজ’ নামে একটি গ্রন্থ। ১৯৬৮ সালে মহেন্দ্রকুমার সিংহ ‘মণিপুরের প্রাচীন ইতিহাস’ নামে গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯৩৮-১৯৩৯ সাল পর্যন্ত লেখক যেসব প্রবন্ধ রচনা করেন তা সংকলন করে তিনি এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এতে মোট তেরোটি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধের বিষয়গুলি নন্দনতত্ত্ব, সাহিত্য, কবিতা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ভুক্ত। ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের ‘অপরাধ জগতের ভাষা’র প্রকাশ কাল ১৯৭৩ সাল। ১৯৭৫ সালে ডি.এন বসুর ‘A Socio-linguistic study of the Bengali kinship terms’ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় *ইন্ডিয়ান লিঙ্গুইস্টিক* পত্রিকায়। একই বছর প্রকাশিত হয় মঞ্জুলি ঘোষের (প্রভাকর সিনহাসহ) চমৎকার প্রবন্ধ ‘Bilingualism and the Bengali of Bhagalpur’। ১৯৭৭ সালে রাজীব হুমায়ুনের পি-এইচ.ডি অভিন্দর্ভ ‘Descriptive analysis of Sandvipi in its sociocultural context’ রচিত হয় (পুনা বিশ্ববিদ্যালয়)। অভিসন্দর্ভটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালে ‘Socilinguistics and descriptive study of Sandvipi a Bangla dialect’ শিরোনামে। ১৯৮০ সাল থেকে সমাজভাষাবিজ্ঞান সহ রাজীব হুমায়ুনের সমাজভাষাবিজ্ঞান কেন্দ্রিক বিভিন্ন রচনা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৮০ সালে প্রকাশিত হয় মনসুর মুসার গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ভাষাপরিকল্পনা। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ হচ্ছে: *ভাষা পরিকল্পনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ* (১৯৮৪), *ভাষা পরিকল্পনার সমাজভাষাতত্ত্ব*

(১৯৮৫) ইত্যাদি। ১৯৮৩ সালে উদয় নারায়ন সিংহ এবং মনিরুজ্জামানের 'Diglossia in Bangladesh' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পবিত্র সরকারের *ভাষা দেশকাল* (১৯৮৫) এবং *লোক ভাষা লোকসংস্কৃতি* (১৯৯১) গ্রন্থ দুটি উল্লেখযোগ্য। এ দুটি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গোপন ভাষার গোপন কথা, ভাষার ঘাটতিত্ত্ব ও বার্নস্টাইনের বিভ্রান্তি, সমাজভাষাবিজ্ঞান, বাংলা ভাষা, পূর্ব পাকিস্তান, বাংলাদেশ, বাংলা গালাগালের ভাষাতত্ত্ব এবং লোকভাষা ও লৌকিক ভাষাতত্ত্ব প্রবন্ধসমূহ নিঃসন্দেহে মূল্যবান। মনিরুজ্জামানের 'Studies in the Bangla dialect' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'Language development and government policy in Bangladesh: Language planning of an ethnic minority group of Bangladesh: the Chakma' এবং বাংলা একাডেমী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রান্তিক সীমায় ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ভাষার অবস্থান ও সংযোগ প্রকৃতি: রাখাইন প্রসঙ্গ (১৯৮৭) গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন' (হুমায়ুন, ২০০১: ১৭-১৮)। ১৯৭৮ সালে ড. আশরাফ সিদ্দিকী রচনা করেন 'লোকায়ত বাংলা' নামে একটি গ্রন্থ। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিবাহ উৎসব, নৌকাবাইচ, খোলা হাওয়ার নাটক, পল্লীমেলা, লোক-গল্প, খেলাধুলা, ঘাটুগান, পাটকাটার গান, ঈদ উৎসব, দুর্গোৎসব, নাইওর যাওয়া প্রভৃতি লোকজ সংস্কৃতির বিশদ বর্ণনা আছে এ গ্রন্থে।

লোকজ সাহিত্যের একটি স্বাভাবিক মাধুর্য আছে, যার ফলে এটি যে কোন শ্রোতা বা পাঠককে আকর্ষণ করতে পারে। লোকসাহিত্যের ইতিহাস, বাংলার সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিচয়ের বিভিন্নকালীন যেসব কলা ছড়িয়ে আছে পাঠকদের কাছে সেগুলির উল্লেখেই আতোয়ার রহমান রচনা করেছেন *লোকসাহিত্যের কথা*। জ্ঞানের সর্বত্র বাংলাদেশের অবাধ বিচরণ আজও আমাদের স্বপ্ন। এ স্বপ্ন বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে আমাদের লোকজ সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে বাংলা ভাষার প্রতিনিধিত্ব থাকুক এ প্রত্যাশা আমাদের সবার। কাজেই লোকজ সংস্কৃতি সম্পর্কে পাঠ অধ্যয়ন ব্যতিরেকে তার বাস্তবায়ন অসম্ভব। আতোয়ার রহমান এ সব দিক বিবেচনা করেই রচনা করেছেন উৎসবের উদ্ভব ও বিকাশ, এর সামাজিক সাংস্কৃতিক রূপ ও রূপান্তর, এর সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও লৌকিক প্রাণময়তার এক মনোজ্ঞ বিবরণ সংবলিত গ্রন্থ উৎসব।

রাজীব হুমায়ুন রচনা করেছেন *সন্দ্বীপের ইতিহাস-সমাজ ও সংস্কৃতি* নামে গ্রন্থ ১৯৮৭ সালে। সন্দ্বীপের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, সন্দ্বীপের নিজস্ব ভাষা, সমাজ ও সংস্কৃতির কাঠামো, বিকাশ ও বিবর্তনের নিরন্তর ধারা বর্তমান গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে। ড. তারাচাঁদ সুবিখ্যাত ইতিহাসবিদ। তাঁর বিখ্যাত গবেষণাসন্দর্ভ *The influence of Islam on Indian culture*- গ্রন্থটি *ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব (১৯৮৮)* নামে বাংলায় অনুবাদ করেছেন ড. করুণাময় গোস্বামী। ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিতে যে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে সে বিষয়টি তিনি এ গ্রন্থে সুচারুরূপে

তুলে ধরেছেন। ভারতীয় দর্শন, ধর্মচিন্তা, সাহিত্য, স্থাপত্য, চিত্রকলা প্রভৃতি বিষয়ে ইসলামী সংস্কৃতির সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে এবং এসব ক্ষেত্রে এর ফলে গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়। বর্তমান গ্রন্থে লেখক বিষযগুলি বিশদ বর্ণনা করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. পারেশ ইসলাম রচনা করেন 'সভ্যতার উৎস' নামে একটি প্রবন্ধ। ১৩৯৯ সালে বাংলা একাডেমী থেকে তা প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধে তিনি সভ্যতার প্রাথমিক উৎসের বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা করেছেন। কোন্ কোন্ অঞ্চল সভ্যতার উষালগ্নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে তা তিনি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন। লেখনরীতির উদ্ভব নিয়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত হয়েছে এ প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন 'যাতায়াত ব্যবস্থা ও স্থাপত্যের পর সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে লেখনপদ্ধতি। আগেই আলোচিত হয়েছে সুমেরুর উক্ত মন্দিরে গচ্ছিত দ্রব্যাদির হিসাব রাখতে গিয়েই সর্বপ্রথম লিখনপদ্ধতির উদ্ভব হয়' (ইসলাম, ১৩৯৯: ৬৪)। উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র থেকে ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয় রাজীব হুমায়ুনের 'পুরনো ঢাকার ভাষা' নামক প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধে তিনি পুরনো ঢাকার অধিবাসীদেরকে কুট্টি/সুখবাসী- এ দ্বিবিধ শ্রেণিতে বিভাজন করে তাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হয় *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১* (দ্বিতীয় খণ্ড) নামক গ্রন্থ। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের সম্পাদনায় বইটি এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইতিহাস বিধৃত হয়েছে।

বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় হিসেবে নৃবিজ্ঞানের যাত্রা বেশি দিনের নয়। ১৯৮৫ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে নৃবিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৯২ সালের ৫ই ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়। তবে এর আগে প্রায় তিন দশক ধরে এ বিষয়ের চর্চা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞানের পাঠক্রমে এবং কলেজের স্নাতক পর্যায়ে চালু ছিল। বাংলাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ বিজ্ঞানের পাঠক্রমের সাথে এ বিষয়ের পঠন পাঠন চলে এসেছে। তবে পাঠক্রমে থাকা সত্ত্বেও সেখানে নৃবিজ্ঞানের চর্চা খুব কমই হয়েছে। বিশেষ করে নৃ-ভাষাবিজ্ঞানের চর্চা হয়নি বললেই চলে। তবে নৃবিজ্ঞানের আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় যেহেতু মানুষ এবং তার পঠন পাঠন, কাজেই এ আলোচনায় মানুষের সাংস্কৃতিক দিকের বিভিন্ন বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলাদেশে এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন হেলালউদ্দিন খান আরেফিন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক ছিলেন। আরেফিন কানাডার মেমোরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগে পড়াশুনা

করেছেন। এখানে তিনি সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান বিষয়ে পড়ালেখা করেন। নৃবিজ্ঞান কী এ প্রশ্নের জবাবে আরেফিন (১৯৮৯: ২) বলেন

> খুব সহজ ভাষায় বলতে গেলে বলা যায় যে নৃবিজ্ঞান হল মানব সমাজ বা সংস্কৃতির পঠন পাঠন। সংস্কৃতি বলতে আমরা শুধুমাত্র নন্দন চর্চাই বুঝি না বরং একটি সমাজের পূর্ণাঙ্গ জীবন ধারার কথাই বুঝি। নৃবিজ্ঞান তাই সমাজের জীবনযাত্রাকে গভীর ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বুঝতে চায়।

ডক্টর মোমেন চৌধুরী রচনা করেছেন *বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলন-৫৯ বারমাসী গান-৩* নামে একটি গ্রন্থ। বাংলা সংস্কৃতিতে বারমাসী গানের নানা দিক নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন এ গ্রন্থে। সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিনির্মাণের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্তের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমাজ সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক, বাংলাদেশের বিভিন্ন উৎসবের আলোচনা সংক্রান্ত গ্রন্থ হলো মুনতাসীর মামুন রচিত *বাংলাদেশের উৎসব (১৯৯৪)*। ১৯৯৪ সালে *শিল্পকলা* পত্রিকায় (প্রধান সম্পাদক মোবারক হোসেন) প্রকাশিত হয় জামিল আহমেদের 'cultural interaction in theatre through Directors and Designers: A third world view' প্রবন্ধ। এতে তিনি সংস্কৃতির ইতিহাস, গণমাধ্যমের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক, বাংলা সংস্কৃতিতে নাটকের প্রভাব প্রভৃতি বিষয় তিনি তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। একই পত্রিকার উক্ত সংখ্যায় লায়লা হাসান রচনা করেন `The cultural heritage of Bangladesh in folk-Dance'। এ প্রবন্ধে তিনি লোক- নৃত্যের ধরন, বাংলা লোক- নৃত্যের প্রকারভেদ, বাংলাদেশে এর প্রসার, বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে এর গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করেছেন। ১৯৯৬ সালে আবদুল মমিন চৌধুরী ও ফকরুল আলম সম্পাদনা করেন *বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে নগর* নামে গ্রন্থ। মানব সভ্যতার সঙ্গে নগরের সম্পর্ক, সমাজবিকাশের উষালগ্নে গ্রামীণ সংস্কৃতির স্বরূপ, নগরায়ন, বাংলা ভাষা ও নগরায়ন প্রভৃতি বিষয় এখানে স্থান পেয়েছে। ১৯৯৭ সালে রামচরণ শর্মা রচনা করেন *আর্যদের অনুসন্ধান* নামে একটি গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি আর্যদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, আর্যসম্পর্কিত ধারণা, প্রাচীন বস্তুতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক পুনর্গঠনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। ১৯৯৯ সালে প্রফেসর ড. আবদুল করিম রচনা করেন *বাংলার ইতিহাস* নামক গ্রন্থ। মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্রমবিবর্তনের আলোচনা এখানে স্থান পেয়েছে। ১৯৯৯ সালে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা করেন *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু*। লেখক বা সংস্কৃতিকর্মীর দায়িত্ব, উপন্যাসে সমাজবাস্তবতা, সংস্কৃতির ভাঙা সেতু, আদিবাসীদের জীবন ও সাহিত্য প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি সংস্কৃতির নানদিক তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। মুস্তফা নূর উল ইসলাম সম্পাদিত *আবহমান বাংলা* প্রকাশিত হয় ১৯৯৯ সালে। আমাদের এই স্বদেশ মাতৃভূমিকে নিয়ে, দেশের স্বজন মানুষদেরকে নিয়ে হাজার বছরের

বাংলা, হাজার বছরের বাংলা গান, কবিতা, হাজার বছর ধরে আবহমান বাঙালি সংস্কৃতির ধারা। বাঙালির উদ্ভব, পূর্বের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ইতিহাস, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, অর্থজীবন, ভাষা আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ- বাংলাদেশের সাহিত্য, চিত্রকলা-ভাস্কর্য, সঙ্গীত, মুকাভিনয়, বাঙালির আপন সত্তার পরিচিতি সন্ধান প্রভৃতির অন্বেষণ করা হয়েছে এ গ্রন্থে।

২০০০ সালে মিখাইল নেস্তর্খ রচিত *Races of Mankind* গ্রন্থটি অনুবাদ করেন দ্বিজেন শর্মা। মানুষের জাতিসমূহের সংজ্ঞার্থ, জাতিসমূহ ও মানুষের উদ্ভব, জাতি ও জাতিবৈষম্যবাদ প্রভৃতি বিষয় স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থে। *বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসীদের সমাজসংস্কৃতি ও আচারব্যবহার* গ্রন্থ রচনা করেন সুগত চাকমা ২০০০ সালে। প্রাচীনকাল থেকে বসবাসরত পশ্চাৎপদ, অবহেলিত, অনুন্নত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ইতিহাস, সমাজ, সংস্কৃতি, আচার ব্যবহার বিশ্লেষিত হয়েছে এ গ্রন্থে। এ সালেই মুহাম্মদ আবদুল কাদির রচনা করেন *ইতিহাস ঐতিহ্য ধর্ম সংস্কৃতি জাতীয়তা ও আমাদের রাস্তা*। এ গ্রন্থে তিনি ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম ও জাতীয়তার সম্পর্ক নিরূপণ করেছেন। সঞ্জীব দ্রং রচনা করেন *বাংলাদেশের বিপন্ন আদিবাসী* নামে একটি গ্রন্থ ২০০১ সালে। ৮৪ টি প্রবন্ধের সমবায়ে রচিত হয়েছে গ্রন্থটি। এতে তিনি বিভিন্ন আদিবাসীর ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোকপাত করেছেন। এ সালেই ওয়াকিল আহমদ রচনা করেন *লোককলা* (২০০৭) নামে গ্রন্থটি। গ্রন্থটি লোককলা বা ফোকলোর বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন। প্রবন্ধগুলো লোকসাহিত্য, লোকশিল্প, লোকাচার এবং বিবিধ শ্রেণিতে বিন্যস্ত করে লেখক আলোচনা করেছেন। জাহাঙ্গীর আলম জাহিদ রচনা করেন 'কুমারখালির প্রাচীন অধিবাসীদের ভাষা' (২০০১) নামে একটি প্রবন্ধ। তিনি এতে কুমারখালির প্রাচীন ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধকার আলোচ্য অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীদের ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন। লেখকের মতে, 'কুমারখালির প্রাচীন অধিবাসীদের ভাষা বিষয়ে জানতে হলে কুমারখালির ইতিহাস বিষয়ে ধারণা থাকা প্রয়োজন' (জাহিদ, ২০০১: ১৭৩)। ২০০২ সালে গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া রচনা করেন *বাংলাদেশের সমাজ রাজনীতি ও সংস্কৃতি* নামে গ্রন্থ। তেরটি প্রবন্ধ ও সাতটি সমালোচনা প্রবন্ধের সমারোহ আছে গ্রন্থটিতে। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আলোচনায় বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রয়াস ও উদ্যোগের প্রয়াস আছে এতে। মং, বা অং (মং বা) রচিত *বাংলাদেশের রাখাইন সম্প্রদ্রায় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জীবনধারা* শীর্ষক গ্রন্থ ২০০৩ সালে প্রকাশিত হয়। রাখাইন সম্প্রদায়ের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জীবনধারা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা আছে এ গ্রন্থে। মহিউদ্দিন খালেদের প্রবন্ধ *Indigenous Art: Traditions, Identity and challenges (২০০৩)*। আদিবাসী শিল্পের নানা দিক, তাদের কৃষ্টি, তাদের যাপিত জীবন, বাংলাদেশে আদিবাসী শিল্পের প্রসার প্রভৃতি বিষয় প্রবন্ধকার সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন এ প্রবন্ধে। বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসী অধিকাংশের

বসবাস পাবর্ত্য চট্টগ্রামে। এ অঞ্চলের একটি ক্রমক্ষয়িষ্ণু ক্ষুদ্রজাতিসত্তা হচ্ছে খুমি। সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ রচনা করেছেন Introduction to Khumi: An indigenous language of Bangladesh (২০০৪) নামে একটি প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধে তিনি খুমিদের ভাষা ও সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। *ভারত সংস্কৃতি* (১৯৬৪) নামক গ্রন্থ রচনা করেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থটি ১৪টি প্রবন্ধের সমন্বয়ে রচিত হয়েছে। প্রথম প্রবন্ধের নাম হিন্দু সভ্যতার পত্তন। এ প্রবন্ধে তিনি আর্যজাতির ভারতবর্ষে আগমন এবং পরে এ অঞ্চলে তাদের বসতি নির্মাণের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। পরবর্তীকালে এ গ্রন্থে তিনি ভারতবর্ষে হিন্দু সভ্যতার পত্তনের ইতিহাস নির্মাণের প্রয়াস পেয়েছেন। এর পরের অধ্যায়ে তাঁর আলোচনার বিষয় হলো দ্রাবিড়। এ প্রবন্ধে তিনি দ্রাবিড় সংস্কৃতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। দ্রাবিড় শব্দের অর্থ, উৎপত্তি, আর্যদের সঙ্গে দ্রাবিড়দের সাংস্কৃতিক যোগসূত্র প্রভৃতি বিষয় তাঁর আলোচনা স্থান পেয়েছে। এরপর তিনি আলোচনা করেছেন 'হিন্দু ধর্মের স্বরূপ'। হিন্দু ধর্মে সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় তিনি এ প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। প্রত্যেকটি ধর্মের স্বাধীন অস্তিত্বের কথা এখানে স্বীকার করা হয়েছে। চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁহার পরিচিত সকল ধর্মের বিশিষ্ট অনুভূতি ও আস্বাদন করিয়াছিলেন এবং পূর্ণ বিশ্বাসের ও উপলব্দির সহিত বলিয়াছিলেন, যত মত, তত পথ'' (১৯৬৪: ৩৩)। এরপর তিনি আলোচনা করেছেন 'হিন্দু আদর্শ ও বিশ্ব-মানব'। এ প্রবন্ধে তিনি হিন্দু সংস্কৃতির মৌলিক উপাদান হিন্দু আদর্শ নিয়ে আলোকপাত করেছেন। 'ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধ বিহার' নামক প্রবন্ধে তিনি বার্মার বৌদ্ধ মন্দির সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এরপর তিনি লিখেছেন 'হিন্দুধর্ম কাহাকে বলে'। এখানে তিনি হিন্দুধর্মের মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থের আরেকটি অধ্যায় হলো 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য'। এ প্রবন্ধে তিনি ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে জাতি ও সাহিত্যের অন্তর্গত সম্পর্ক বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও আর্যজাতির সংমিশ্রণে বাঙালি জাতি সৃষ্টির বিষয়েও আলোচনা আছে এ প্রবন্ধে। এরপরের আলাচনায় স্থান পেয়েছে 'কাশী', 'গোসাঁই তুলসীদাস', 'কবি তানসেন', 'ভূদেব মুখোপাধ্যায়' প্রভৃতি অধ্যায় লেখক এখানে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। 'পুরাণ ও হিন্দু সংস্কৃতি' প্রবন্ধে লেখক হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে পুরাণের সম্পর্ক সুনিপুণভাবে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় *ভারত সংস্কৃতি* গ্রন্থের আলোচ্য চৌদ্ধটি অধ্যায়ে সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন। ২০০৩ সালে প্রকাশিত হয় নীহাররঞ্জন রায়ের *ভারতেতিহাস* নামে একটি গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে দশটি প্রবন্ধ রয়েছে। বাঙ্গালি সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক এতে আলোচিত হয়েছে। ২০০৩ সালে প্রকাশিত হয় রেহনুমা আহমেদ ও মানস চৌধুরী রচিত নৃবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ *নৃবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ সমাজ ও সংস্কৃতি* নামে। বইটির অধিকাংশ অধ্যায়ে নৃবিজ্ঞানের আলোচনা গুরুত্ব পেলেও প্রথম অধ্যায়ে নৃবিজ্ঞানের যে তাত্ত্বিক দিকের আলোচনা

আছে সেখানে নৃ-ভাষাবিজ্ঞানের প্রচ্ছন্ন আলোচনা পাওয়া যায়। এ ছাড়া অন্যান্য অধ্যায়ে মাঠ গবেষণার তত্ত্ব ও তথ্যে নৃ-ভাষাবিজ্ঞানের গবেষণার স্বরূপ সহজেই অন্বেষ করা যায়। ঢাকার সাংস্কৃতিক বিবর্তন, মধ্যযুগে বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন মাহবুবুর রহমান *বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য* নামক গ্রন্থে (২০০৫)। অধ্যাপক হাসান আইয়ূব রচনা করেন *ইসলামী দর্শন ও সংস্কৃতি* নামে গ্রন্থ (২০০৪)। ইসলামের দৃষ্টিতে সংস্কৃতির ভিন্নতা দেখিয়েছেন তিনি তাঁর গ্রন্থে। সংস্কৃতির সংজ্ঞা নামের অধ্যায়ে তিনি সংস্কৃতির স্বরূপ অন্বেষণ করেছেন। খন্দকার মাহমুদুল হাসান রচনা করেন *মানবজাতির ক্রমবিকাশ (২০০৫)*। পৃথিবীতে বসবাসরত মানুষের তাদের কথা এবং কী করে তারা এই চেহারায় এসেছে সে কথার বর্ণনা রয়েছে এই গ্রন্থে। ঐ একই সালে তিনি আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন *মানুষের উৎপত্তি ও জাতিসমূহের সৃষ্টি নামে*। মানষের বিবর্তন, জীবজগতের সৃষ্টি ও বিবর্তন, আদি মানবজাতির অনুসন্ধান প্রভৃতি দিক স্থান পেয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। ২০০৫ সালে দিলরুবা শারমিন রচনা করেন *বাংলাদেশের প্রত্নবস্তু: প্রাচীন যুগ*। বাংলাদেশের নতুন নতুন অধিবাসী, তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও সেই সঙ্গে বাংলাদেশের ঐতিহ্য ইত্যাদি বিষয়ের সম্যক ধারণা পাওয়া যায় আলোচ্য গ্রন্থে। ফিলিপ গাইন ও পার্থ শঙ্করের সম্পাদনায় ২০০৭ সালে প্রকাশিত হয় *বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি*। আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। এতে মোট দশটি প্রবন্ধ রয়েছে। প্রায় এক দশক সময় ধরে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের সাংস্কৃতিক ভুবন নিয়ে যেসব চিন্তাভাবনা, তথ্য-উপাত্ত, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, তৈরি হয়েছে তারই সংকলনের ফসল এই বই। *বাংলার সংস্কৃতি বাংলার সভ্যতা* নামক গ্রন্থটি রচনা করেন একে এম শাহনেওয়াজ ২০০৭ সালে। প্রাচীন ও মধ্যযুগব্যাপী বাঙালি যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়েছে, যেভাবে বাংলা সভ্যতার বিস্তার ঘটিয়েছে-সেসবের আলোচনা বিধৃত হয়েছে এ গ্রন্থে। ঐ একই সালে খান মোঃ লুৎফর রহমান রচনা করেন *উন্নয়নশীল দেশে জাতিগঠনের সমস্যা*। এটি একটি অনূদিত গ্রন্থ। জাতিগঠনের উপর সচরাচর যেসব সংহতিমূলক সমস্যা প্রভাব বিস্তার করে সেগুলো পরিচিতি সংহতি, এলিট-জনতা সংহতি, রাজনৈতিক সংহতি, সাংস্কৃতিক সংহতি, ভূ-খণ্ডনগত সংহতি এবং অর্থনৈতিক সংহতির আলোচনা বিধৃত আছে এ গ্রন্থে। রাশেদা ইরশাদ ও সুমাইয়া হাবিব রচনা করেন 'সংস্কৃতি ও ব্যক্তিত্ব: নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ' (২০০৭) নামে প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধে প্রবন্ধকারদ্বয় সংস্কৃতি ও ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক অন্বেষণে নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে গুরুত্ব দিয়েছেন। সংস্কৃতির পটভূমি, বিভিন্ন নৃবিজ্ঞানীদের সাংস্কৃতিক গবেষণার স্বরূপ অন্বেষণ করতে গিয়ে নৃভাষাবিজ্ঞানের নানা দিক সম্পর্কে তাঁরা আলোকপাত করেছেন। ওয়াকিল আহমেদের সম্পাদনায় *লোকসংস্কৃতি* প্রকাশিত হয় এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে। লোকসংস্কৃতি বলতে সাধারণত গ্রামের মানুষের আবহমান জীবন প্রবাহ ও জীবনের ঐতিহ্যবাহী ফসলকে বুঝায়। বিপুল জনগোষ্ঠির দীর্ঘস্থায়ী এই লোকজ সংস্কৃতি একদিকে যেমন

অতি সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ, অন্যদিকে তেমনি বিনোদনমুখী ও শিল্পসৌন্দর্যমণ্ডিত। সহস্র বছর ধরে জাতির জীবনের লালিত ও সঞ্চিত দেশের এরূপ লোকজ সংস্কৃতির একটি জরিপভিত্তিক পরিচয়দান ও মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে এই গ্রন্থটি। ২০০৭ সালে আলী আহাম্মদ খান আইয়োব *গারো পাহাড় অঞ্চলের আদিবাসী* নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন শোভা প্রকাশ থেকে। এ গ্রন্থে তিনি গারো সম্প্রদায়, হাজং সম্প্রদায়, বানাই সম্প্রদায়, ডালু সম্প্রদায়, হদি সম্প্রদায়, কোচ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের নৃতাত্ত্বি পরিচয়, ভাষা, সংস্কৃতি, সামাজিক প্রথা রীতি নীতি প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এইড.এম.এ রহিম *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* গ্রন্থটি রচনা করেন ২০০৮ সালে। এ গ্রন্থে ১২০১-১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির চিত্র রূপায়ণ করা হয়েছে এবং জীবনধারা ও ইতিহাসের ওপর ভৌগোলিক প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে, বাংলার প্রাকৃতিক ও সহজাত বৈশিষ্ট্য এবং জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং এর অধিবাসীদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ওপর এগুলোর প্রভাব নিরূপণ করা হয়েছে। অতুলসুরের গ্রন্থ *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন* প্রকাশিত হয় ২০০৮ সালে। এ গ্রন্থে তিনি প্রতিভাশালী বাঙালি জাতির চিন্তাধারা, জাতিবিন্যাস, সমাজগঠন ও সংস্কৃতির স্বকীয়তার নানা দিক আলোচনা করেছেন। ঐ একই সালে এম এস দোহা রচনা করেন *বাংলাদেশের আদিবাসী সমাজের ইতিবৃত্ত*। বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন জাতির আচার-আচরণ, কৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে এ গ্রন্থে। গারো ও হাজংদের রীতিনীতি, আচার-আচরণ ও তাদের ঐতিহ্য নিয়ে মাযহারুল ইসলাম রচনা করেন *গারো ও হাজং সম্প্রদায়ের লোকসাহিত্য*। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন দিক যেমন লোকসঙ্গীত, লোকনাট্য, লোককাহিনী, লোকনৃত্য. ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, লোকসংস্কার ইত্যাদি লোক উপাদান দৃষ্টান্ত সহযোগে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি তুলে ধরেছেন আলোচ্য গ্রন্থে। সিলেট অঞ্চলের আদিবাসী সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ে তথ্যবহুল বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন মাহফুজুর রহমান। তাঁর গ্রন্থের নাম *সিলেট অঞ্চলে নৃ-তাত্ত্বিক ও ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী (২০০৯)*। আদিবাসী উপজাতি, জনগোষ্ঠীর আদিনিবাস, কোন জনগোষ্ঠির রক্তধারা প্রবহমান, নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, ভাষা, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, পৌরাণিক-লৌকিক রীতিনীতি, উৎসব, বর্তমান অবস্থান, অর্থনীতি, বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি জীবনবোধসহ নানা বিষয় তথ্য পরিবেশন ও তা ব্যাখ্যা করেছেন। একই সালে একে এম শাহনাওয়াজ রচনা করেছেন *সাম্প্রতিক প্রত্ন গবেষণায় বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনর্গঠনের সম্ভাবনা* শীর্ষক গ্রন্থ। এ কথা আমরা সবাই অবগত যে, ইতিহাস চর্চা জীবন্ত জাতির পরিচায়ক। পুরাতাত্ত্বিক উপাদান হচ্ছে ইতিহাসের প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। পূর্বসূরীদের রেখে যাওয়া বস্তু-সংস্কৃতির ভেতর প্রতিবিম্বিত হয় ঐতিহ্যের স্বরূপ। সমকালীন সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি ছড়িয়ে থাকে প্রত্নসূত্রে। এ সমস্ত পুরাবস্তু সে যুগের মানুষের রুচি ও দক্ষতার ছবি উন্মোচন করে। এ সব দিক স্থান পেয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। 'আদিবাসী

সাস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও লালনে উপজাতীয় কালচারাল একাডেমীর ভূমিকা' (২০০৮) শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করেন মাযহারুল ইসলাম তরু। এ প্রবন্ধে তিনি বাংলাদেশে আদিবসীদের সংখ্যা, আদিবাসীদের আঞ্চলিক অবস্থান, আদিবাসী সংস্কৃতি রক্ষার প্রয়াসে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা, আদিবাসীদের নিয়ে রচিত বিভিন্ন গবেষণা পত্রিকা ও স্মরণিকার তালিকা প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন-

> বাংলাদেশে বসবাসরত প্রতিটি আদিবাসী নৃ-গোষ্ঠীর রয়েছে নিজস্ব ভাষা, সামাজিক কাঠামো, ধর্মীয় বিশ্বাস, পোশাক পরিচ্ছদ, অলংকার, গহনা, গোষ্ঠীগত, সমষ্টিগত ধ্যান ধারণা, চিন্তা চেতনা, রীতি নীতি, খাদ্যাভ্যাস, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। বিভিন্ন কারণে আদিবাসীদের এই মূল্যবান ও বর্ণিল সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে, দিনে দিনে হারিয়ে যাচ্ছে তাদের বস্তগত সংস্কৃতি তথা তাদের বিভিন্ন ব্যবহার সামগ্রী, হারিয়ে যাচ্ছে তাদের ভাষাগত সংস্কৃতি তথা নৃত্যকলা ও লোকসাহিত্যের বিভন্ন নিদর্শন (তরু ২০০৮: ৫৩-৫৪)।

২০০৯ সালে সেলিনা খন্দকার রচনা করেন *মহিলা সমাজ ও আমাদের সংস্কৃতি* নামে একটি গ্রন্থ। বাঙালি সংস্কৃতিতে ব্যক্তি ও সমাজের ভূমিকার বিশদ বর্ণনা দেয়া হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। সিকদার মনোয়ার মুর্শেদের 'খাসিয়াদের অবস্থান-নির্দেশ ও খাসি ভাষা-পরিস্থিতি বিশ্লেষণ' (২০০৮) প্রবন্ধ এখানে উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধে আদিবাসীদের সংখ্যা, খাসিয়া সংস্কৃতি, খাসি ভাষা, খাসি ভাষার ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরেছেন। ঐ একই সংখ্যায় মোহাম্মদ মনযুর-উল-হায়দারের 'চাকমা নৃগোষ্ঠীর ভাষা: নৃবৈজ্ঞানিক ও ভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধে তিনি বাংলাদেশের ভাষাবৈচিত্র্য, চাকমা ভাষা এলাকা, চাকমা-ভাষীর মনোভাব এবং দ্বিভাষিকতা, চাকমা ভাষাসংযোগ এবং ভাষামিশ্রণ, চাকমা ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চা, চাকমা ভাষা ও স্থায়িত্বকরণ, সংরক্ষণ ও পরিকল্পনা, চাকমা ভাষার সংকট ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করেছেন। এছাড়াও প্রবন্ধে গুরুত্ব পেয়েছে নৃ-ভাষাবিজ্ঞানের উদ্ভব বিষয়ক মতবাদ। হায়দারের (২০০৮: ৬৭) উক্তিটি এখানে প্রণিধানযোগ্য,

> বিশ শতকের প্রথম ভাগে ফ্রাঞ্জ বোয়াস (১৮৫৮-১৯৪২) থেকে শুরু করে এডওয়ার্ড সাপির (১৮৮৪-১৯৩৯), লেভি-স্ট্রস (জন্ম ১৯০৮), নোয়াম চমস্কির প্রমুখের হাত ধরে বর্তমানের আলোসসান্দ্রো দুরান্তি, এনপি হাইকারসহ আরও অনেকে অবদান রাখছেন নৃবৈজ্ঞানিক ভাষাতত্ত্ব (Anthropological Linguistics) প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে। এ কারণে এটি নৃবিজ্ঞানে ফোর ফিল্ডস এপ্রোচ-এর একটি হতে পেরেছে।

মঙ্গলকুমার চাকমা ও অন্যান্যদের সম্পাদনায় *বাংলাদেশের আদিবাসী* নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ২০১০ সালে। বাংলাদেশ একটি বহু জাতির, বহুভাষার, বহুসংস্কৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ একটি দেশ। এদেশের বহু জনগোষ্ঠি ছাড়াও প্রায় ৪৫ টির অধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিবাসী জাতি অতি প্রাচীনকাল থেকে এদেশে বাস করে আসছেন। এসব জাতির ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজ, রীতিনীতি, ধর্ম, নৃতাত্ত্বিক পরিচয় আছে এ গ্রন্থে।

খুরশীদ আলম সাগর রচিত *বাংলাদেশের আদিবাসীদের কথা (২০১০)* গ্রন্থটিতে এদেশে বসবাসরত ২০টিরও অধিক জাতি ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির বিভিন্ন দিক বিধৃত হয়েছে। বাংলাদেশে রয়েছে লোকসংস্কৃতি ও সংস্কৃতির বিশাল ভাণ্ডার। যুগ যুগ ধরে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে পোশাক পরিচ্ছদে, আচার-ব্যবহারে, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে ও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। এসব সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতির ধারক, বাহকের কথা বিধৃত হয়েছে ২০১০ সালে রচিত সালমা জোহরা ও অন্যান্যদের রচনায়। ঐ একই সালে সোনিয়া নিশাদ আমিনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *ঢাকার নগর জীবনে নারী (২০১০)* নামক গ্রন্থ। বিগত চারশ বছরব্যাপী ঢাকায় নারী জীবনের বহুমাত্রিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এ গ্রন্থে। ঐ একই সালে শাহিদা খাতুনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *ফোকলোর সংগ্রহমালা-২ বিচারগান* নামে একটি গ্রন্থ। স্মতব্য যে, সাবেক পূর্ববাংলা ও পরবর্তীকালের বাংলাদেশ সমৃদ্ধ লোকজ-সাংস্কৃতিক অঞ্চল হিসেবে বিশ্ববিখ্যাত। এই সংস্কৃতির ভাবসম্পদ আঙ্গিকগত বিপুল বৈচিত্র্য এবং মানবিক উপাদানের গভীরতা যে কোন সংস্কৃতি-ভাবুক এবং ঐতিহ্য গবেষককে সহজেই আকৃষ্ট করে। বাংলাদেশে বিচারগান একটি স্বতন্ত্র সঙ্গীত ঘরানা হিসেবে স্বীকৃত। ঐ একই বছর প্রকাশিত হয় ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন ও মো: রবিউল হকের প্রবন্ধ 'দিনাজপুরের সাঁওতালদের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন: একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা'। এ প্রবন্ধে প্রবন্ধকারদ্বয় দিনাজপুরের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রথাগত আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। এ আলোচনায় তাঁরা দিনাজপুরের সাঁওতালদের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে বৃহত্তর জনগোষ্ঠির প্রভাব, নগরায়ন, আধুনিকায়ন, খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রভাব সহ যেসব নিয়ামক কাজ করছে তা সমাজতাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। নাজমুন নাহার লাইজা রচনা করেন *বাংলাদেশের বেদে সম্প্রদায় (২০১১)* নামে গ্রন্থ। বাংলাদেশে বহু পেশাজীবী সম্প্রদায় রয়েছে। ফজলুল আলম তাঁর 'সংস্কৃতি ও শ্রেণিসম্পর্ক' (২০১১) প্রবন্ধে তিনি সংস্কৃতির সংজ্ঞা, সংস্কৃতি প্রকাশ ও বিকাশে ঐতিহাসিক কারণ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সম্পর্ক প্রভৃতি আলোচনা করেছেন। বেদে সম্প্রদায় তার মধ্যে অন্যতম। এ জনগোষ্ঠি গ্রাম বাংলার লোকচিকিৎসক, চিত্তবিনোদনকারী ও ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত। এসবের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। ঐ একই সালে প্রকাশিত হাকিম আরিফের গুরুত্বপূর্ণ 'উপভাষাতত্ত্ব ও বাংলা উপভাষা চর্চার সম্ভাবনা' শীর্ষক প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধে তিনি ভাষা ও উপভাষাকে অভিন্ন প্যারাডাইম উল্লেখ করে তা সুবিন্যস্ত আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন। এতে তিনি আদিবাসী ভাষা সম্পর্কে ভাষাপরিকল্পনার নির্দেশনা দিয়েছেন। আরিফ (২০১১: ৬৮-৬৯) বলেছেন–

> বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আদিবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে পাশ্ববর্তী বাঙালি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে দৈনন্দিন জীবন-যাপনের জন্য এক ধরনের নিরবচ্ছিন্ন মিথষ্ক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে ঐ আদিবাসীরা স্থানীয় বাঙালি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য যে ভাষারূপটির আশ্রয় নিচ্ছে তার অন্তর্নিহিত স্বরূপটি কী তা এখনও বিশ্লেষিত হয়নি। ধারণা করা যায়, বাঙালি জনগোষ্ঠী যেহেতু এ ভূখণ্ডে জনবিন্যাসের কেন্দ্রীয় শক্তি (main stream) হিসেবে সুবিধাপ্রাপ্ত, তাই এ ক্ষেত্রে আদিবাসী জনগোষ্ঠী তাদের সঙ্গে ভাববিনিময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট বাংলা উপভাষাটি আয়ত্ত করে নিচ্ছে। কিন্তু এই আয়ত্তকরণের ক্ষেত্রে কোনো নতুন ভাষা সৃজন প্রক্রিয়া বা পিজিনিকরণে ও ক্রেয়লীকরণ ঘটছে কিনা তা বাংলা উপভাষাতত্ত্বে গবেষণার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে।

আমিনুল ইসলাম রচনা করেন *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি (২০১২)* নামে একটি গ্রন্থ। জীবনের বিভিন্ন সমস্যা ব্যাখ্যায় ইসলামের নীতি আদর্শ চর্চা হয়ে আসছে প্রাচীনকাল থেকেই। ইসলামের ধর্মবেত্তা, দার্শনিক, শিল্পী, সাহিত্যিক ও সুফি-সাধকদের আপ্রাণ চেষ্টায় বাংলাদেশে এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রচনা সম্ভব হয়েছে। ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান, মুসলিম মনীষীদের বহুমুখী ধ্যান-ধারণা তথা মুসলিম সংস্কৃতির উত্থান-পতনের গতি- প্রকৃতির ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করা হয়েছে এই গ্রন্থে। ২০১৪ সালে সৌমিত্র শেখরের সম্পাদনায় রচিত হয় *লোক-উৎসব নবান্ন* নামে একটি গ্রন্থ। হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান নির্বিশেষে সবার অংশগ্রহণ ও গ্রহণযোগ্যতার বিচারে ধীরে ধীরে নবান্ন আজ পার্বণ থেকে উৎসবে পরিণত হয়েছে। ঢাকায় জাতীয়ভাবে উদযাপিত হয় নবান্ন। এসবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। সৌরভ সিকদার রচনা করেন বাংলাদেশের *আদিবাসী ভাষা-সংস্কৃতি ও অধিকার (২০১৪)* শীর্ষক গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি বাংলাদেশের আদিবাসীদের ভাষা, সংস্কৃতি, বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষা-পরিচিতি, ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় বাংলাদেশের আদিবাসী, বাংলাদেশের আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি, গণমাধ্যমে আদিবাসী সংস্কৃতির প্রতিফলন, আদিবাসী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি বিতর্ক প্রভৃতি সুচারুরূপে আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন।

বর্তমানে নৃবিজ্ঞান তথা নৃ-ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্র-পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। এ বিষয়ের গবেষণা শুরু হয়েছিল আদিম সমাজকে কেন্দ্র করে। কিন্তু বর্তমানে তা আলোচনাতেই স্থির না হয়ে আধুনিক শহর বা নগর সমাজকেও তা সংযোগ করেছে (মন্তাজ, ২০১৪)।

বাংলাদেশে নৃ-ভাষাবিজ্ঞান প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক এই দুভাবেই নৃভাষাবিজ্ঞান চর্চা শুরু হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী, ভাষাবিজ্ঞানী ও ভাষাগবেষকদের ভূমিকা এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। গবেষণার এই যাত্রা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ধারাবাহিক বিকাশ লাভ করেছে। এই চর্চার অংশ হিসেবে

ইতোমধ্যেই বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছে। এটা সহজেই অনুমেয় যে, ভবিষ্যতেও বাংলাদেশে নৃ-ভাষাবিজ্ঞান চর্চার এই যাত্রা অব্যাহত থাকবে এবং তাতে নিয়োজিত হবেন গবেষকবৃন্দ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পাত্র সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

পৃথিবীতে বাস করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ। তাঁদের ভাষা, সাহিত্য, বর্ণ, শ্রেণি তথা সংস্কৃতিতে পার্থক্য বিদ্যমান। এই পার্থক্য বিশ্বকে নানা বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে। পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকে বর্তমান অবধি মানুষের মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এসব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পৃথিবীতে বাসরত মানুষকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ভাগ করা হয়েছে। কোনো দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠির পাশাপাশি নৃতাত্ত্বিকভাবে পার্থক্য অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি রয়েছে। বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান এসব জনগোষ্ঠির সংখ্যা নিরূপণে সচেষ্ট হয়েছেন। অনুমান করা হয়, সারা বিশ্বে কমপক্ষে ৫,০০০ ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের প্রায় ৩০ কোটি লোক বাস করছে। সমাজবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী ও ভাষাবিজ্ঞানীগণ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির সংখ্যা নিরূপণে উদ্যোগী হয়েছেন এবং পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে তাঁদের শতকরা হারও নির্ণয় করেছেন। এ প্রসঙ্গে মন্তাজের (২০১৪: ১১) মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য-

> বিশ্বের সর্বত্র প্রায় সব দেশেই জনগোষ্ঠীর উন্নত বৃহৎ অংশ বা শাসক জাতি (ব্যতিক্রম বাদে) বা মূল ধারার পাশাপাশি শাসিত বিভিন্ন অনুন্নত ক্ষুদ্র অংশ বা জাতি বা অপ্রধান ধারা বিদ্যমান। জনসংখ্যার দিক দিয়ে এরা প্রায় ২০০ মিলিয়ন বা তার অধিক যা বিশ্ব জনসংখ্যার ৪ শতাংশ।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠিরা পৃথিবীর সাতটি মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের মধ্যে এশিয়া মহাদেশ একটি। এ মহাদেশ বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠির মিলনমেলা রূপে গণ্য হয়েছে। 'অন্যান্য মহাদেশের মতো এই মহাদেশেও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে প্রতিনিয়ত লিপ্ত। ইতিহাসবিদদের মতে, আর্যদের আগমনের বহু পূর্ব থেকেই এরা ভারতবর্ষে বসবাস করত' (ঘোষ, ২০০০: ১১)। ব্রিটিশরা এসব জনগোষ্ঠির জীবনাচরণ জানার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং এ লক্ষ্যে তাঁরা এসব জাতি গোষ্ঠির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় উন্মোচনে সচেষ্ট হন। তাঁরা এসব জাতিগোষ্ঠিকে চিহ্নিত করেছেন 'ট্রাইব' শব্দ দিয়ে (বিশ্বাস, ২০০৫)। তবে জাতিসংঘ ১৯৯৩ সালকে 'International Year of the world's Indigenous People' ঘোষণার পর থেকে এসব ক্ষুদ্র জাতিসমূহ অভিহিত হচ্ছে 'আদিবাসী' নামে। পরবর্তী পর্যায়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠি থেকে আলাদা করার জন্য তাঁদেরকে 'নৃগোষ্ঠি', 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়', 'পাহাড়ি', 'জুম্মা', 'উপজাতি' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক আমলে ব্রিটিশরা অর্থনৈতিক ও শিক্ষার দিক থেকে অনগ্রসর জনগোষ্ঠিকে পৃথক করার জন্য 'aboriginal' ও 'aboriginal tribes' শব্দগুলো ব্যবহার করেছে। বাংলাদেশের সরকারি নথিপত্রে এই অনগ্রসর জাতিগোষ্ঠীকে 'উপজাতি' শব্দ দ্বারা অভিহিত করা

হয়েছে। কিন্তু বেসরকারি পর্যায়ে অনেক ক্ষেত্রেই এই জনগোষ্ঠিকে 'আদিবাসী' বলা হচ্ছে (হাসান ও অন্যান্য, ২০১১)। ইংরেজি 'Indigenous' ও 'aborigin' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'আদিবাসী' শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু 'উপজাতি' শব্দের একটি গ্রহণযোগ্য বিকল্প হিসেবে এটি গণ্য করা যায় না এবং আন্তর্জাতিকভাবে 'Indigenous people' বলতে তাদেরকে বোঝানো হয়, যাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে। Ali ও Shafie (2005: 69) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'The group of people we define as indigeneous as adibashi is representational human category based on some perceived common properties shared by its members'। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি বা আদিবাসীদের সংজ্ঞায়নের সঙ্গে তাদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি, অঞ্চল, সাংস্কৃতিক ঐক্য প্রভৃতির একটি যোগ সাযুজ্য রয়েছে। মোটামুটি একই অঞ্চলে যাঁরা বাস করেন এবং যাঁদের একই সাংস্কৃতিক বলয় রয়েছে তাঁদেরকে আদিবাসী বলে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ সমজাতীয় সংস্কৃতিই এই আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে কামালের (২০০৭: xiv) উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য–

> আদিবাসী বলতে বোঝায় এমন একটি জনগোষ্ঠী যারা মোটামুটিভাবে একটি অঞ্চলে সংগঠিত, যাদের মধ্যে রয়েছে সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং যার সদস্যরা মনে করেন যে তারা একই সাংস্কৃতিক এককের অন্তর্ভুক্ত। এখানে মূলত সংস্কৃতির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, কেননা সমজাতীয় সংস্কৃতিই আদিবাসীদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য, এরা হচ্ছেন এক-একটি সাংস্কৃতিক একক।

উল্লেখ্য ২০১০ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন পাস হয়েছে, যেখানে এসব ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠিকে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে (হাসান ও অন্যান্য, ২০১১)। ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠির স্বরূপ উদঘাটন করে Risely (1981); Dalton (1872); Hunter (1876) প্রমুখ নৃবিজ্ঞানীগণ তাঁদের নিম্নলিখিত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন–

১। একটি বসত এলাকা: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠিগণ যাযাবর নয়। তাদের জীবনে আর্থিক অনিশ্চয়তার কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে বসবাস করলেও তারা আবার ঘরে স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে ফিরে আসে।

২। ঐক্যের ধারণা: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠিরা একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাঁদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি প্রবল।

৩। তাঁদের রয়েছে একটি বিশেষ জীবনধারা ও সংস্কৃতি। এরা ঐতিহ্য-প্রিয়, সহজ সরল অথচ বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধিকারী। সব ধরনের পরিবর্তনকে তাঁরা মেনে নিতে আগ্রহী হন না।

৪। তাঁরা একই পূর্বপুরুষ থেকে এসেছে বলে তাঁদের বিশ্বাস।

অন্যদিক, 'আদিবাসী সংক্রান্ত সংজ্ঞা পর্যালোচনা করে গবেষক বাস্কে আদিবাসীদের কতগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। যেমন-

১. আদিবাসীরা সরল জীবন যাপন করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।
২. একই ভাষায় কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করে।
৩. তাদের আকৃতি ও সংস্কৃতিগত সাদৃশ্য আছে।
৪. নিজেদের আইন-কানুন রক্ষার জন্য নিজস্ব পঞ্চায়েত আছে এবং একই রকম বিবাহভিত্তিক ও পেশাভিত্তিক ধর্মীয় বাধা-নিষেধ মেনে চলে;
৫. প্রয়োজন হলে গোষ্ঠী সচেতন মনেবৃত্তি নিয়ে সংগ্রাম করে' (উল্লেখ, মন্তাজ, ২০১৪: ২২)।

তবে আদিবাসীদের সংজ্ঞা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়:

১. আদিবাসীরা এমন একটি এলাকায় বাস করেন যা প্রায় নির্দিষ্ট। খাদ্য সংগ্রহ শেষে প্রায়ই এরা একটি নির্দিষ্ট এলাকায় আসেন, অথবা নতুন কোন এলাকায় গিয়ে আপেক্ষিক অর্থে স্থায়ী বাস শুরু করেন।
২. আদিবাসীরা একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধিকারী। এ জনগোষ্ঠীতে সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রমাণ মেলে।
৩. প্রত্যেক আদিবাসীর অর্থনৈতিক জীবন প্রণালি, উৎপাদন বা সংগ্রহ পদ্ধতি এক ধরনের। এদের অর্থনৈতিক জীবন প্রণালিতে তেমন বৈচিত্র্য দেখা যায় না এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যও তেমন প্রবল নয়। তাদের সবার খাদ্য সংগ্রহ এবং উৎপাদন কৌশল একই মানের।
৪. আদিবাসী সদস্যদের মধ্যে একটা ঐক্যের অনুভূতি বিদ্যমান। সংহতিবোধ তীব্র (কামাল, ২০০৭: xiv)।

৬.১ ইতিহাস

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হলেও প্রাচীন বাংলা বলতে যে জনপদ নির্দেশিত হয় তার ইতিহাস দীর্ঘদিনের। বিভিন্ন যুগ ও কালের পরিক্রমায় বাংলা জনপদের বিবর্তিত রূপ হচ্ছে বর্তমান বাংলাদেশ। সুর (১৯৯০: ১৫) এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

> বাঙলা অতি প্রাচীন দেশ। ভূতাত্ত্বিক গঠনের দিক দিয়ে বাঙলাদেশ গঠিত হয়েছিল প্লাওসিন যুগে (প্রায় দশ থেকে পঁচিশ লক্ষ বৎসর পূর্বে)। পৃথিবীতে নরাকার জীবেরও বিবর্তন ঘটে এই প্লাওসিন যুগে। এর পরের যুগকে বলা হয় প্লাইস্টোসিন যুগ। এই যুগেই মানবের আবির্ভাব ঘটে।

কামাল (২০০৭: xviii) এর উক্তিতে এ বক্তব্যের সমর্থন রয়েছে–

> ভূতাত্ত্বিক আলোড়ন ও চঞ্চলতার ফলে বঙ্গদেশ গঠিত হয়েছিল প্লাওসিন যুগে-দশ থেকে পঁচিশ লক্ষ বছর আগে। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর আগে। তবে যে ধরনের মানুষ থেকে আধুনিক জাতিসমূহ উদ্ভূত হয়েছে- যাদের আমরা

> ক্রো-ম্যাগনন (cro-magnon) মানুষ বলি-তাদের আবির্ভাব ঘটে আনুমানিক চল্লিশ হাজার বছর পূর্বে। তবে খুব প্রাচীনকালের মানুষের কোনো কঙ্কাল, সম্ভবত অনুসন্ধানের উদ্যোগের অভাবেই, এখনও বঙ্গদেশ বা ভারতবর্ষের কোথাও পাওয়া যায়নি। রাঢ় এর অন্তর্ভুক্ত অধুনা পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার রামগড়ের নিকটবর্তী সিজুয়ায় ১৯৭৮ সালে পাওয়া গেছে জীবাশ্মভূত এক ভগ্ন-মানব চোয়াল; রেডিও কার্বন ১৪ পদ্ধতিতে যার বয়স নির্ণীত হয়েছে ১০,৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। অর্থাৎ প্রাচীন প্রস্তর (paleolithic) যুগের প্রায় শেষ পর্যায়ের মানব অস্থি এটি। তবে প্রাচীন প্রস্তর যুগের গোড়ার দিকের মানুষের কঙ্কাল না পাওয়া গেলেও তাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন হাতিয়ার (Tools) বঙ্গদেশের নানান জায়গায় পাওয়া গেছে। অর্থাৎ নিশ্চিতভাবেই বলা যাচ্ছে যে, প্রাচীন প্রস্তর যুগের গোড়ার দিক থেকেই এদেশে মানুষের বসবাস রয়েছে।

এরপর নানা ধাপ ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানব ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে এবং বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতি এই বিবর্তন ধারার ব্যতিক্রম নয়। বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষা আমাদের অস্থিমজ্জার সঙ্গে মিশে গেছে। বিভিন্ন জনধারার সংস্কৃতির মিশ্রিত রূপ লক্ষ করা যায় বাংলা ভাষাকেন্দ্রিক বাঙালি জাতির। এই ধারায় যুক্ত হয়েছে বহু বছর ধরে বাসরত মূলধারা বাঙালি জনগোষ্ঠির সঙ্গে বাসরত এদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি। তাঁরা এদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁদের সমন্বয়েই তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের নতুন ইতিহাস। এ প্রসঙ্গে সুর (১৯৯০: ১৩) উল্লেখ করেছেন-

> একশো বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে, বাঙালীর ইতিহাস নেই। আজ এ ধারণার ব্যত্যয় ঘটেছে। নানা সুধীজনের প্রয়াসের ফলে আজ বাঙলার ও বাঙালীর এক গৌরবময় ইতিহাস রচিত হয়েছে।

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো সিলেটের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গৌরবময়। হযরত শাহজালালসহ ৩৬০ আউলিয়ার কর্মভূমি, শ্রীচৈতন্যের পিতৃভূমি এবং সৈয়দ সুলতান, হাসনরাজা, শীতালং, তশ্নাসহ অসংখ্য মরমী কবি ও সাধকের জন্মভূমি এ সিলেট বিশ্বের প্রাচীনতম জনপদের একটি। বাংলাদেশের তিন ধরনের ভূ-প্রকৃতির মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের পাহাড়ী অঞ্চল প্রায় এক কোটি বছর আগে টারশিয়ারী যুগের শেষের দিকে সৃষ্টি হয়। তবে এখানে কবে থেকে জনবসতি শুরু হয় তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। এ কথা বলা যায় যে, অতি প্রাচীন কাল থেকেই সিলেটে জনবসতি গড়ে ওঠে। এখানে জনবসতি শুরু হলে জীবনের তাগিদে আরম্ভ হয় এখানে কর্মতৎপরতা; ক্ষুধানিবারণের পর মানসিক চাহিদা পূরণের তাগিদ দেখা দেয়। এভাবে সিলেটে জীবন ও সংস্কৃতির চর্চা শুরু হয় সেই অতীত প্রাচীনকাল থেকেই। একথা স্বীকার্য যে, সমাজ যত প্রাচীন তার সংস্কৃতিচর্চাও তত ব্যাপক সমৃদ্ধ এবং

বিস্তৃত। সংস্কৃতিতেও তাই আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য এবং কিছু বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠেছে। মানুষের আত্মিক ও মানসিক বিকাশের স্তর নির্দেশ করে সংস্কৃতি। আবার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মানুষকে উচ্চতর স্তরে উত্তরণের শক্তি ও প্রেরণা যোগায়। বিভিন্ন সময়ে সিলেট অঞ্চলের জনগণের কৃতিত্বপূর্ণ তৎপরতার পেছনে বিস্তৃত এই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব অপরিসীম। হাসন-লালন যেমন একটি অঞ্চলের সম্পদ, তেমনি একই সঙ্গে গোটা জাতিরও সম্পদ। বিভাজনের মাধ্যমে তাই আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য অনুসন্ধান করা হয়। আজ যা আঞ্চলিক গণ্ডিতে আবদ্ধ, কাল তাই হয়ত জাতীয় বৃহৎ পরিসরে বিস্তৃত হয়। হালদার (২০০৮: ৪২) বলেছেন–

> কালচার জাতিগত, দেশগত বা ধর্মগত, তাহাও যেমন একটি অর্ধসত্য, তেমনি সাধারণভাবে আমরা যে মনে করি কালচার অর্থ কাব্য, গান, চারুকলা, বড়জোর দর্শন বা বিজ্ঞান পর্যন্ত, তাহাও তেমনি আর একটি অর্ধ-সত্য। কথা এই যে, সংস্কৃতি সমাজ দেহের শুধু লাবণ্যছটা নয়,তাহার সমগ্র রূপ। তাই সমাজের পরিচয় দিয়াই সংস্কৃতির পরিচয়- এইটিই আসল কথা।

বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চল স্বতন্ত্র ভৌগোলিক অবস্থান ও সংস্কৃতিতে সমুজ্জ্বল। এরূপ আঞ্চলিক বৈচিত্র্য বাংলাদেশের সংস্কৃতির নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য। আঞ্চলিক বৈচিত্র্যকে উপেক্ষা করে সে দেশের সঠিক ইতিহাস রচিত হতে পারে না। সমাজবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী ও ভাষাবিজ্ঞানীগণ তাই নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তাঁরা এই সংস্কৃতি অন্বেষণের মধ্য দিয়েই বৃহত্তর জনগোষ্ঠির তথা দেশের পুরো সংস্কৃতির প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে সমর্থ হন। আমাদের দেশের এ আঞ্চলিক সংস্কৃতি নিরূপণে বাংলাদেশকে যে কটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে তার মধ্যে সিলেটের গুরুত্ব অপরিসীম। সিলেটের ভৌগোলিক অবস্থান ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক উর্বর এবং বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে এর আলাদা একটি গুরুত্ব রয়েছে। মানিক (২০০১: ৪১) উল্লেখ করেছেন-

> এ জন্য আঞ্চলিক সংস্কৃতির গুরুত্ব সব সময় স্বীকৃত। উপরন্তু সিলেট অঞ্চলের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য অনুসন্ধান এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের স্বাতন্ত্র্য অনুধাবনের জন্য প্রয়োজন। এ উপলব্ধি থেকেই জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন-সিলেটীরা বাঙালি, তবে with a difference।

বিশ্বের কোন রাষ্ট্রই একক কোন সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠি নিয়ে গঠিত নয়, বরং যে কোন দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠির পাশাপাশি অনেক ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠির সহাবস্থান লক্ষ করা যায়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের ফলে একটি রাষ্ট্রে একই সময়ে একাধিক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জনগোষ্ঠির উপস্থিতি লক্ষণীয়। 'এটি সম্ভবত নৃতত্ত্ব-গবেষণায় অন্যতম স্বতঃসিদ্ধ যে, সংস্কৃতিগত বিভিন্নতা সত্ত্বেও মানবপ্রজাতির বিভিন্ন অংশে মানবমন অভিন্ন ও সমান ক্ষমতার ধারক'

(স্ট্রাউস, ২০১১: ২২)। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় একটি ভৌগোলিক অঞ্চলের আদি জনগোষ্ঠি ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। পক্ষান্তরে অভিবাসী কোন জনগোষ্ঠি সে অঞ্চলের প্রধান জনগোষ্ঠিতে পরিণত হয়েছে। ধারণা করা হয় যে, বিশ্বের পাঁচটি মহাদেশের সত্তরটিরও বেশি দেশে কমপক্ষে পাঁচ হাজার ক্ষুদ্র জাতির তিনশত মিলিয়ন লোক বাস করে। এদের জীবন পদ্ধতি, জীবিকা, ধর্ম ও সংস্কৃতি তাদের নিজস্ব পরিবেশের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যুগে যুগে এসব ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠি তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষা করার চেষ্টা করেছে এবং এখন পর্যন্ত তাদের সে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সুদূর অতীত কাল থেকে বিভিন্ন ক্ষুদ্র-জাতিসত্তা বা নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠির উপস্থিতির বিষয়টি ইতিহাসবিদেরা নিশ্চিত করেছেন এবং বর্তমানেও এ ধারা অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ। আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও বহু জাতি, ভাষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির বিচিত্র সমাহার এখানের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য। বাংলাদেশের আদি বা মূল জনগোষ্ঠি কারা এ বিষয়ে বিতর্ক থাকলেও স্মরণাতীত কাল থেকে এখানে বিভিন্ন ভাষী জাতিগোষ্ঠির উপস্থিতির প্রমাণ রয়েছে। সময়ের পরিক্রমায় কোন কোন ক্ষেত্রে তার পরিবর্তন এসেছে, কিংবা কোন সংস্কৃতি তার স্বকীয়তা হারিয়েছে অথবা পরিবর্তিত রূপ পরিগ্রহ করেছে; তথাপি আজ-অবধি বহুজাতির মিলনক্ষেত্র হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী পরিচিত। বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে বাস করে আসছে। তাদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যবাহী জীবনাচরণ আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলেছে। 'আমাদের দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা নির্ধারিত না হলেও অনুমান করা হয়ে থাকে যে, তাদের সংখ্যা প্রায় ৫০টি' (বিশ্বাস ও আসাদুজ্জামান, ২০০৭: ১২৪)। এসব জনগোষ্ঠি রংপুর,দিনাজপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, সিলেট ও বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় বাস করে। তাঁদের রয়েছে নিজস্ব সমাজ ও সংস্কৃতি। তাঁদের ধর্মীয় আচার, জীবনধারণ পদ্ধতি, পরিবার ব্যবস্থা, গৃহের ধরন, স্থানীয় ও লোকায়ত জ্ঞান প্রভৃতিতে স্বাতন্ত্র্যের ছাপ বিদ্যমান। হাসান ও অন্যান্য (২০১১: ১৩) এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

> ঐতিহাসিকভাবে জানা যায়, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের স্বীকৃতি লাভের বহু পূর্ব থেকে এই ভূখণ্ডে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা বসবাস করে আসছে। বাঙালি জনগোষ্ঠীর সাথে একই এলাকায় পাশাপাশি বসবাস করলেও তাদের রয়েছে ভিন্ন ভাষা, আচার-বিশ্বাস, পরিবারব্যবস্থা ও স্থানীয় জ্ঞান বা লোকায়ত জ্ঞান।

অন্যদিকে চন্দ (২০০৬: ১৯) বলেছেন–

> নৃতত্ত্বের উদ্যান নামে খ্যাত শ্রীহট্ট বা সিলেট অঞ্চলের জনবিন্যাসে রয়েছে বিস্ময়কর বৈচিত্র্য। কারণ সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত এই অঞ্চলকে (সুরমা, বরাক ও মেঘনা

> উপত্যকা) আমরা একটি সাংস্কৃতিক বলয় (cultural zone) বলয় বলে অভিহিত করতে পারি, যদিও রাজনৈতিক ইতিহাসে এ-অঞ্চল কখনো স্বাধীন হরিকেল রাজ্য, কখনো বা কামরূপ শাসনের অধীন, কখনো বাংলার অংশ, কখনো আসামে অন্তর্ভুক্ত। যদিও বরাক ও সুরমা উপত্যাকা মেঘনা উপত্যাকারই (ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, ঢাকা) উত্তরাংশ মাত্র এবং উভয়ের মধ্যেই সাংস্কৃতিক আদান প্রদান বেশ নিবিড়, তথাপি শ্রীহট্ট অঞ্চলের একটি স্বকীয়তা আছে। অধ্যাপক সুজিৎ চৌধুরী শ্রীহট্ট-কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে এ-অঞ্চলের বিভিন্ন জাতির সংঘর্ষ-সহাবস্থান-সমন্বয়ের ধারাকে সার্থকভাবে চিহ্নিত করেছেন। অস্ট্রিক ও মঙ্গোলয়েড সংস্কৃতির প্রভাব, বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব এবং সবশেষে ইসলামের আগমন-সব মিলিয়ে এই অঞ্চলের লোকজীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রভাবের জন্য বিশেষভাবে সমৃদ্ধ ও নিজ বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ।

আবার, একথা সহজেই প্রতিভাত যে, ভারতীয় আর্য, মঙ্গোলীয়, অস্ট্রিক. দ্রাবিড় জাতির অন্তর্ভুক্ত মণিপুরী, খাসিয়া, ত্রিপুরী, গারো, হাজং, পাত্র ইত্যাদি নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির মানুষ প্রাচীনকাল থেকে সিলেট অঞ্চলে বাস করে আসছেন (সিংহ, ২০০৯)। বাংলাদেশে পাত্রদের আগমন ও বসবাস নিয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য না থাকলেও বিভিন্ন গবেষক ও ঐতিহাসিকদের মতে, প্রাচীনকাল থেকে পাত্ররা সিলেট অঞ্চলে বাস করে আসছে। 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত গ্রন্থে' পাত্রদেরকে 'লাংলু' বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং তাদের সম্পর্কে তত্ত্বনিধি (২০০২: ৫৭) উল্লেখ করেছেন–

> লাংলু- ইহারা খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড় হইতে শ্রীহট্টের সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া বসতি করিতেছে। কথিত আছে যে, প্রাচীনকালে ইহারা ডিমাপুরের (কাছাড়ের) নিকট বাস করিত, তথাকার রাজা মানবদুগ্ধ পান করিতেন এবং ইহাদিগকে প্রত্যহ ছয়সের দুগ্ধ যুগাইতে আদেশ করেন। ইহারা রোজ ছয়সের নারীদুগ্ধ যুগান অসাধ্য ভাবিয়া, ভয়ে পলায়ন পূর্ব্বক জয়ন্তীয়ায় আসিয়া বাস করে। ইহারা বিবাহান্তে স্ত্রীর পিতৃবংশভুক্ত হয়, কিন্তু স্ত্রী মরণান্তে আবার নিজবংশত্ব পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রীহট্ট জিলায় ইহাদের সংখ্যা ৬৩৯ জন; (তন্মধ্যে পুং ১০৫ এবং স্ত্রী ৩২৪ জন)।

হযরত শাহজালালের সঙ্গে সিলেটের তথা পাত্র সম্প্রদায়ের ইতিহাস সংশ্লিষ্ট। হযরত শাহজালালের সিলেটে আগমন সম্পর্কে চন্দ (২০০৬: ৩২) নিম্নোক্ত লোক- কাহিনিটি উল্লেখ করেছেন–

> শাহ জালাল শৈশবেই পিতৃ-মাতৃহীন হওয়ায় তাঁর মাতুল, বিখ্যাত সুফী সৈয়দ আহমদ কবীর সোহরাওয়ার্দীর কাছে পালিত হন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর তত্ত্বাবধানে শাহ জালাল আধ্যাত্মিক সাধনার উচ্চমার্গে পৌঁছালে মামা তাঁর হাতে এক মুঠো মাটি দিয়ে তাঁকে ভারতে ধর্মপ্রচারের জন্য পাঠান এবং বলেন যেখানে ঠিক একইরকমের রঙ ও গন্ধের মাটি পাবেন, তিনি যেন সেখানেই স্থায়ীভাবে বাস করেন, কারণ সে স্থান পবিত্র। লখনৌতির সুলতান ফিরোজশাহের সৈন্যসামন্তের সঙ্গে শাহজালাল তাঁর ৩৬০ জন আউলিয়া নিয়ে সিলেটে উপস্থিত হন; তাঁর

> অলৌকিক শক্তি দিয়ে সিলেট জয় করেন। সিলেটের মাটি দেখে শাহ জালাল অভিভূত হন এবং কারণ তিনি লক্ষ করেন সিলেটের মাটির রঙ ও গন্ধ তাঁর মামার দেওয়া মাটির অনুরূপ। শাহজালাল তাঁর শিষ্যদের নানাদিকে পাঠিয়ে তিনি নিজে সিলেটেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

পাত্র সম্প্রদায়ের ইতিহাস এখনও সঠিকভাবে নির্ণীত হয়নি। চক্রবর্তী (২০০০: ২৩) বলেছেন–

> পাত্র সম্প্রদায়ের একাংশ নিজেদের সিলেটের রাজা গৌরগোবিন্দের প্রধান সভাসদ মনারায়-এর বংশধর হিসেবে পরিচয় দেয়। তের-চৌদ্দ শতকে সিলেটের রাজা ছিলেন গৌরগোবিন্দ। পাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ কেউ মনে করে যে, তারা রাজা গৌরগোবিন্দেরই বংশধর। এই উভয় বিষয় সম্পর্কে কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই।

ইতিহাস ও বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় যে, খ্রিস্ট্রীয় চতুর্দশ শতাব্দীরও আগে সিলেট অঞ্চলের বিশাল এলাকা জুড়ে পাত্র জনগোষ্ঠির বসবাস ছিল। কথিত আছে, চতুর্দশ শতাব্দীতে সিলেট অঞ্চলটি গৌর রাজ্য নামে পরিচিত ছিল এবং সেই রাজ্যের অধিপতি ছিলেন রাজা গৌরগৌবিন্দ। প্রচলিত কাহিনী, কিংবদন্তি তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, রাজা গৌড়গৌবিন্দ ছিলেন পাত্র জনগোষ্ঠির। এ জনগোষ্ঠির প্রবীণদের মতে, খ্রিস্ট্রীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে সিলেটের রাজা গৌড়গৌবিন্দ ছিলেন তাদের সমাজভুক্ত। মৌলভীবাজার জেলার ভাটেরায় প্রাপ্ত তাম্রসনোক্ত গোবিন্দকেশবদেব এবং ঈশানদেব আর্যীকৃত বোড়ো অধিপতি ছিলেন বলে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমতের সাথে সুজিৎ চৌধুরী ও তাঁর 'শ্রীহট্ট কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস' গ্রন্থে সহ মত প্রকাশ করেছেন (মোহান্ত, ১৯৯৮)। উল্লেখ্য যে. গৌড় রাজ্যের রাজধানী ছিল সিলেট। গৌড় রাজ্য বর্তমান সিলেট জেলার জৈন্তিয়া, কানাইঘাট এবং গোয়াইনঘাট এবং গোয়াইনঘাট থানা ছাড়া সমগ্র জেলা এবং সুনামগঞ্জ জেলার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। গৌড় রাজ্যের প্রথম রাজা গোরকের পর উল্লেখযোগ্য রাজাগণ হলেন: ক্রমানুসারে গোহক, শ্রীহস্ত, কীর্তিপাল, ভূজবীব্রবন্ত, গোকুল, কিশোর, নব নারায়ণ, গোবিন্দ নারায়ণ, কেশব যাদব সেন, ঈশান দেব, প্রবীর ভূজাবীর ও ক্ষেত্রপাল। রাজ্যের শেষ রাজা ছিলেন গৌড় গোবিন্দ। ফিরোজশাহ তুঘলক (ফিরোজ শাহের শাসনকাল ১৩৫১ থেকে ১৩৮৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রেরিত সেনাবাহিনীর হাতে গৌড় রাজ্যের পতন হলে ভীত স্বতন্ত্র পাত্ররা তৎকালীন সিলেট নগরের উত্তর-পূর্ব দিকে বনভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পরবর্তীকালে এ আশ্রয়স্থলই পাত্র গ্রামরূপে গড়ে ওঠে।

কিংবদন্তি আছে যে, গৌড় রাজ্যের টুলকিটুকর মহল্লার একজন অপুত্রক মুসলমান পুত্র সন্তান কামনায় গরু শিরনি 'মানত' করেন। যথারীতি তার সে মনবাসনা পূর্ণ হলে তিনি সে শিরনি আদায় করেন গরু জবাই করে; যা ছিল পাত্রদের নিকট দেবতুল্য। দুর্ঘটনাবশত একটি কাক গোমাংশের একখণ্ড

গৌড়গোবিন্দ রাজার পূজামণ্ডপের আঙিনায় ফেললে ক্রোধান্বিত রাজা দোষীকে খুঁজে বের করেন এবং নবজাতকের হাত কেটে ফেলেন। বিপন্ন বুরহান উদ্দীন দিল্লীর দরবারে বিচার প্রার্থী হলে দিল্লীর সম্রাট রাজা গৌড়গোন্দিকে শায়েস্তা করার নিমিত্তে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু মায়া বলে বলিয়ান গৌড় গোবিন্দের সাথে যুদ্ধে দিল্লী সম্রাটের বাহিনী পরাজিত হয়। এ সময় ইয়েমেন দেশ থেকে ইসলাম প্রচারার্থে আগত একজন সুফি দরবেশ হজরত শাহজালাল দিল্লীতে অবস্থান করছিলেন। তিনি বোরহান উদ্দীনের করুণ কাহিনী শ্রবণে সহানুভূতিবশত ৩৬০ জন অনুগামী দরবেশসহ সিলেট নগরীর প্রান্তে সুরমা নদীর তীরে এসে উপস্থিত হন। দরবেশের আগমনে ভীত সন্তস্ত্র গৌরগোবিন্দ সুরমা নদী থেকে সব নৌযান সরিয়ে ফেলেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন দরবেশ একখণ্ড গোচর্মনির্মিত জায়নামায নদীর পানিতে বিছিয়ে অনুগামী দরবেশগণসহ অলৌকিকভাবে নদী পাড়ি দেন। দরবেশের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দর্শনে ভীত গৌড়গোবিন্দ রাজবাড়িতে আত্মগোপন করেন। যথারীতি রাজবাড়ির নিকটবর্তী একটি উঁচু টিলায় দাঁড়িয়ে আযানের ধ্বনি উচ্চারণ করলে বিশিষ্ট রাজালয় ভেঙ্গে পড়তে থাকে। এরূপ অলৌকিক কাজে রাজা গৌরগোবিন্দ ভীত হয়ে নগরী থেকে খানিক দূরে অরণ্যে পলায়ন করেন। তার স্বজাতি পাত্ররা তাকে অনুসরণ করে অরণ্যের দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু প্রাণভয়ে রাজা গৌড়গোবিন্দ তখন বনের গভীরে চলে যায়। নিশ্চিদ্র ঘন অরণ্যের গাছ বাঁশ বিশেষত রামকলার গাছ ইত্যাদি কেটে কেটে রাজা তার পলায়নের পথ বের করেন। অনুগামী পাত্ররা সে পথ অনুসরণ করে নৃপতির সন্ধান চালায়। কিন্তু পাত্ররা রাজাকে না পেয়ে হতাশ হয়ে অনুসন্ধানে বিরত হয়। প্রাণভয়ে ভীত পাত্র সম্প্রদায় উক্ত অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে যা পরবর্তী যুগে তাদের বাসস্থান হিসেবে গড়ে ওঠে।

উইলিয়াম হান্টার প্রমুখ ইংরেজ ঐতিহাসিকের মতানুযায়ী ১৩৮৫ সালে হযরত শাহজালাল সিলেট বিজয় করেন। সে সময় দিল্লীর সম্রাট ছিলেন ফিরোজশাহ তুঘলক। ফিরোজশাহ তুঘলকের রাজত্বকাল ১৩৫১ থেকে ১৩৮৮ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উল্লেখ্য যে, ফিরোজশাহ তুঘলক সিলেট অভিযানে প্রথমত সেনাপতি সিকান্দর শাহকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন; কিন্তু তিনি সিলেট বিজয়ে ব্যর্থ হন। পরবর্তীকালে আবার প্রেরিত হন সিপাহশালার সৈয়দ নাসির উদ্দিন। 'তারিখ ফিরোজশাহী' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, এক হাজার অশ্বারোহী ও তিনহাজার পদাতিক সৈন্য নিয়ে সৈয়দ নাসির উদ্দিন সিলেটের পথে রওনা হন। হজরত শাহজালাল তাঁর দরবেশ বাহিনীসহ সৈয়দ নাসির উদ্দিনের সৈন্যবাহিনীর সাথে সম্মিলিত হন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, সুলতান ফিরোজশাহের শাসনকালে ১৩০৩ শতাব্দীতে দরবেশ হযরত শাহজালাল ও তাঁর অনুসারীগণের কাছে গৌর রাজ্যের পতন হলে পাত্র আদিবাসীদের একটি অংশ রাজা গৌড় গোবিন্দকে অনুসরণ করে পার্শ্ববর্তী ভারতে চলে যান এবং কিছু অংশ তৎকালীন সিলেট নগরীর

উত্তর পূর্ব দিকে গহীন বনভূমিতে আশ্রয় নেন। এভাবে সিলেটে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটে। এ প্রসঙ্গে নিচের উদ্ধৃতি গুরুত্বপূর্ণ-

> Many historians think that Sylhet or Sreehatta (enriched market place) was an expanded commercial centre from the ancient period. A large number of Bengalis migrated to sylhet. In the 14th century, Muslim saint from Yemen Hazrat Jalal (R) triumphed Sylhet and preach islam' (Population and Housining cencus, 2011: x).

এভাবে সিলেটে মুসলমান বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির নতুন ধারা শুরু হয়। পূর্বের একচ্ছত্র হিন্দু সংস্কৃতির বিকাশের স্থান দখল করে মুসলমান সংস্কৃতি। 'মুসলমান রাজশক্তির বিজয়ালাভে হিন্দু শাসকশ্রেণি যে দেড় শত দুই শত বৎসরের মত (খ্রিঃ ১২০০-খ্রিঃ ১৪০০) মুহ্যমান হইয়া যায় তাহাতে সন্দেহ নাই' (হালদার, ২০০৮: ১৭৫)। এই পটভূমিতে সিলেট অঞ্চলে ইসলামের আবির্ভাব একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ইসলাম এখানে একটি শক্তিশালী সামাজিক-সাংস্কৃতিক ধারা হিসেবে গড়ে ওঠে (চন্দ, ২০০৬)। এছাড়া এখানে এমন এক ধরনের জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল 'যাঁরা দীর্ঘদিন যাবত বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সংমিশ্রিত আচার-প্রথার মধ্যে জীবন-যাপন করতেন এবং দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যারা গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার ঘটনাকে সহজে মেনে নেননি' (চৌধুরী, ১৯৯৯: ৫২২-২৩)।

লালেং থেকে কীভাবে তারা পাত্র নামধারণ করল তার একটি বিশদ বিবরণ আছে ম্রি (২০০৭: ৪৩১)-এর নিম্নোক্ত উক্তিতে–

> লালেং লোকেরা কিভাবে পাত্র হলো সে সম্পর্কে লক্ষণ লাল পাত্র প্রচলিত কিংবদন্তির উল্লেখ করে বলেন যে, রাজা গৌড় গোবিন্দের সময় পাত্ররা লালেং হিসেবেই পরিচিত ছিল। শাহজালাল যখন এ দেশে ইসলাম প্রচার করার জন্য আসেন তখন রাজা গৌড়গোবিন্দের সাথে বিভিন্ন সময় যুদ্ধের পর এক সময় তারা দুজনেই মুখোমুখি হন। এ সময় শাহজালাল রাজা গৌড়গোবিন্দের কাছে জানতে চান যে, তিনি (গৌড় গোবিন্দ) সিলেট ছেড়ে যাবেন, যুদ্ধ করে না অন্য কোন শর্তে। রাজা তখন উত্তরে বলেন যে, তিনি শর্ত সাপেক্ষেই সিলেট ছেড়ে যাবেন। রাজা গৌড়গোবিন্দ ছিলেন যাদুবিদ্যায় পারদর্শী। তার ধারণা ছিল যে, তার যাদু শক্তি দিয়ে তিনি শাহজালাল এর আধ্যাত্মিক শক্তিকে পরাভূত করতে পারবেন। তাই তিনি আধ্যাত্মিক শক্তির সাথে তার যাদুকরি শক্তির প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েন। অন্যদিকে কথা ছিল যে, তিনি শর্ত সাপেক্ষে সিলেট ছেড়ে চলে যাবেন। তার শর্তের মধ্যে ছিল, আরবরা তাদের তীর দিয়ে রাজার লোহার ঘণ্টা ভাঙতে পারলে এবং তাদের আযান দিয়ে তাঁর দেবমন্দির ভাঙতে পারলে তিনি বিনা বাক্যে তাঁর রাজ্য সিলেট ছেড়ে চলে যাবেন। যাদুকরি

শক্তির প্রতিযোগিতায় গৌড়গোবিন্দ পরাজিত হন। অপরপক্ষে আরবদের তীরের আঘাতে রাজার ঘণ্টা এবং তাদের আযানের প্রভাবে মন্দির ভেঙ্গে যায়। তাই শর্তানুযায়ী তিনি সিলেট ছেড়ে অজানা দেশে চলে যান। যাওয়ার সময় তিনি তার লোকদেরকে তার সাথে সিলেট ছেড়ে যেতে আহবান করেছিলেন। কিন্তু তিনি কখন এবং কোথায় চলে যাবেন সে সম্পর্কে কিছু বলেননি। তাই প্রজারা তাঁর পলায়নের সময় তাঁকে অনুসরণ করতে পারেননি। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও যখন তারা তাঁর আর সন্ধান পেলেন না তখন তারা আরও ভীত হয়ে পড়েন এবং এবং মুসলমানদের ভয়ে তারা পাহাড়ে পালিয়ে গেলেন। সেখানে তারা পাহাড়ের গোহায় বা পাথরের আড়ালে মুসলমানদের দৃষ্টি এড়িয়ে দীর্ঘদিন বসবাস করতে থাকেন। এভাবে তারা প্রায় দেড়শ থেকে দুশ বছর ধরে পাহাড়ে লুকিয়ে থাকার পর তাদের পরবর্তী বংশধরেরা সমতল ভুমিতে বেরিয়ে আসতে থাকেন। এ সময় তাদের কয়েকজন বাঙালির সাথে দেখা হলে তারা নিজেদেরকে 'লালেং' বলে পরিচয় না দিয়ে নিজেদেরকে 'পাথর' সম্প্রদায় বলে পরিচয় দেন। কারণ তাদের সত্যিকার পরিচয় দিতে ভয় ছিল। সরকারি নথিপত্রেও তাদেরকে 'পাথর' সম্প্রদায় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। 'পরবর্তী সময়ে সিলেটে রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপিত হলে পাত্ররা সনাতন ধর্মে দীক্ষিত হন। তখন রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন প্রধান অধ্যক্ষ পদ্ম মহারাজ তাদেরকে পাথর থেকে পাত্র নামে আখ্যায়িত করেন। এভাবেই পাত্ররা লালেং থেকে পাথর এবং তারপর পাত্র হিসেবে সবার কাছে পরিচিত হয়ে আসছেন।

বিগত দুই-তিনশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, পাহাড় টিলাঘেরা সিলেট অঞ্চলে পাত্ররা বেশির ভাগ পাহাড়েই বাস করতেন। ব্রিটিশ শাসনামলে যখন সিলেটে চা উৎপাদন শুরু হয়, সেই থেকেই পাত্রদের জায়গা সম্পত্তি বেদখল হতে থাকে। এরপর ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পাত্ররা সর্বস্ব হারান। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় আবার তাঁরা নির্যাতিত হন। বাঙ্গালিদের মত তাঁরাও পাকিস্তানি ও তাঁদের দোসরদের শিকারে পরিণত হন। মক্তিযুদ্ধে শহীদ হন ফতেহপুরের গোবিন্দ পাত্র। তখন পাত্রদের অনেকেই সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যান। তাঁরা ভারতের আসাম, মেঘালয়, কাছাড়, প্রভৃতি স্থানে আবাসন গড়ে তুলেন। পাত্রদের এসব পরিবার তখন শিলং- এর ভাউকি, আসামের তেলিছড়া, মেঘালয়ের তেজপুর, ওজাই, লঙ্কা, যমুনার মুখ, কাছাড়, বিখাড়া, পাত্রাকান্দি এলাকায় বসবাস করতেন।

৬.২ নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

বাংলাদেশে রয়েছে বহু বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি। 'এই সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের মূলে রয়েছে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বসবাস ও জীবন প্রণালির ভিন্নতা' (হাসান ও অন্যান্য, ২০১১: ১৩)। 'বাঙালি জাতির বৈশিষ্ট্য হলো, ব্যতিক্রম বাদে মাঝারি গোছের চেহারা অর্থাৎ মাথার গড়ন লম্বা নয়, নাক

অতিরিক্ত লম্বা বা একেবারে চ্যাপ্টার মাঝামাঝি, উচ্চতায়ও মাঝামাঝি; এক কথায় সবই মাঝারি ধরনের-এই হলো খাঁটি বাঙালি আকৃতি' (মন্তাজ, ২০১৪: ৩১)। রিজলি, গুহ, চ্যাটার্জী, চন্দ, চৌধুরী প্রমুখের নৃপরিমাণের ভিত্তিতে নির্ধারিত বাঙালির নৃতাত্ত্বিক উপাদানগুলো হলো:

১. 'আদি-অস্ট্রোলয়েড বা ভেড্ডিড বা নব্য নিষাদ
২. দ্রাবিড় বা মেলানাইড
৩. ইউরোশীয়:
   ক. মধ্যম বিস্তৃত শিরস্ক ইন্দো-ভূমধ্য নৃজাতিরূপ বা হোমো আলপিনাস বা প্রতীচ্য বিস্তৃত শিরস্ক ও ব্রাকিড।
   খ. দীর্ঘ শিরস্ক ইন্দো-ভূমধ্য বা যথার্থ ও উত্তর ইন্ডিড বা ইন্দো-আর্য' (মন্তাজ, ২০১৪: ৩৩)।

বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে স্যার হারবার্ট রিজলি (Sir H. Risely) বিশ শতকের প্রথম দিকে বলেছেন, বাঙালিরা প্রধানত দ্রাবিড় ও মোঙ্গলীয় এই দুই রক্তধারার সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়েছে (যাকারিয়া, ২০০৯)। ভারতীয় উপমহাদেশের আদিবাসীদের দৈহিক রূপের ইতিহাস আলোচনা করে নৃতাত্ত্বিকরা প্রমাণ করেছেন এই অঞ্চলের আদিবাসীরা প্রধানত নেগ্রিটো (negrito), প্রায় অস্ট্রেলীয় (proto-austroloid) এবং মঙ্গোলীয় (mongoloid) এই তিন নরবংশের মানুষ। বাঙালির দেহে মঙ্গোলীয় রক্তধারার প্রভাব অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এর ঐতিহাসিক কারণও বিদ্যমান। যাকারিয়া (২০০৯: ৪৬) বলেছেন–

> খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গে মাৎস্যন্যায়ের তিব্বতরাজ স্রংসান গ্যাম্পো (Srong-Tsan Gampo) উত্তরবঙ্গ এবং সেই সঙ্গে বাঙলার অন্যান্য সামান্য কিছু অঞ্চল অধিকার করে কিছুকাল রাজত্ব করেছিলেন বলে জানা যায়। যে সময় মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর মানুষ উত্তরবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে এবং হিমালয়ের কাছাকাছি অঞ্চল এবং সেই সঙ্গে কামরূপসহ আসামের অন্যান্য অঞ্চলেও হয়তো বসতি স্থাপন করেছিলেন। এর আগেও হয়তো মোঙ্গলীয় নরগোষ্ঠীর আবির্ভাব হিমালয় অঞ্চলে থাকতে পারে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের সমতলভূমিতে তাদের বসতি স্থাপন তিব্বতরাজের অধিকারের সময়েই হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়।

এই অঞ্চলের যোগাযোগ রয়েছে চীন, তিব্বত, নেপাল, বার্মা প্রমুখ দেশের সঙ্গে। এর ফলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠির প্রভাব লক্ষ করা যায় সিলেটী জনধারার ওপর। তাই বলা যায়, নৃতত্ত্বের উদ্যান নামে খ্যাত শ্রীহট্ট বা সিলেট অঞ্চলের জনবিন্যাসে রয়েছে বিস্ময়কর বৈচিত্র্য। ভারতীয় আর্য, মঙ্গোলীয়, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় জাতির অন্তর্ভুক্ত মণিপুরী, খাসিয়া, ত্রিপুরী, গারো, হাজং, পাত্র ইত্যাদি নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির লোকেরা প্রাচীনকাল থেকে সিলেট অঞ্চলে বসবাস করে আসছেন। এদেরকে বাদ দিয়ে সিলেটের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা প্রণয়ন সম্ভব নয়। বর্তমানে এসব জনসগোষ্ঠি সিলেটের

ইতিহাস-ঐতিহ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ পরিগণিত হয়েছে (সিংহ, ২০০৯)। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় সিলেটে রয়েছে বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ। এসব জনসমষ্টি সিলেটের প্রাচীন ঐতিহ্যের সারথি। তাঁরা অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয়দের সংমিশ্রণে তৈরি হয়েছে। তবে এসব জনগোষ্ঠির ওপর আর্যজাতির প্রভাব রয়েছে। চন্দ (২০০৬: ১৫)-এর উক্তিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়–

> কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতিতে অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর চিহ্ন আজও রয়ে গেছে। সিলেটের আদি অধিবাসীদের মধ্যে এরাই এককালে প্রধান ছিল বলে মনে করার কারণ আছে। পরবর্তীকালে অপেক্ষাকৃত উন্নত সভ্যতার অধিকারী দ্রাবিড়রা এদেশে প্রভাব বিস্তার করে এবং ধীরে ধীরে অস্ট্রিক জনগোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বলা যেতে পারে, অস্ট্রিকদের সমাজ-সংস্কৃতির অনেক উপাদান-উপকরণ এই দ্রাবিড়দের মধ্যে মিশে গিয়ে মিশ্র জনগোষ্ঠীতে পরিণতি লাভ করে। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির প্রতীক পূজা দ্রাবিড় অস্ট্রকদের কাছ থেকে গ্রহণ করে বলে ধারণা করা হয়। পরবর্তীকালেও প্রজনন-প্রতীক লিংগ পূজা অস্ট্রিক প্রভাবকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। নিগ্রেটো, প্রটো-মঙ্গোলীয় বা ভোট-চীনা তিব্বতীয় জনগোষ্ঠীর প্রভাবের কথাও নৃতাত্ত্বিকরা বলে থাকেন। যোগ-তন্ত্র বিশ্বাসী, দারু- টোনা মারণ উচাটনকারী এই জাতির প্রভাব... সিলেটের উপর গভীরভাবেই পড়েছে।... উত্তর ভারতীয় মিশ্র আর্যগোষ্ঠীর প্রভাবে ... সিলেটে সমাজ কাঠামো এবং ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। ... পরবর্তীকালে সেমেটিক আরব, পশ্চিম এশিয়ার ইরান-তুরাগ-তুর্কী, উত্তর-পশ্চিম ভারতের পাঠান-আফগান জাতির মিশ্রণে ও প্রভাবে এক সঙ্কর জনতার জন্ম হয়... সিলেটের।

বহু জাতির রক্তপ্রবাহে সিলেটের জনধারার সৃষ্টি হয়েছে। সিলেটের পাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। এ কারণে এখানের পাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র সহজেই উপলব্ধি করা যায়। 'জাতিগতভাবে স্বল্প পরিচিত পাত্ররা বোড়ো জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে গবেষকদের ধারণা' (Mohanto, 1999: 805)। অন্যত্রও তিনি পাত্রদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় প্রদানে ঐ একই মত পোষণ করে বলেছেন নৃতাত্ত্বিকভাবে স্বল্প পরিচিত পাত্ররা বোড়ো জনগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত (মোহান্ত, ১৯৯৯)। এরা মাঝারি উচ্চতাসম্পন্ন, দীর্ঘ কপাল এবং এদের বর্ণ বাদামী। মঙ্গোলীয় জাতির বৈশিষ্ট্য ধারণ করলেও নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় এরা মিশ্র জাতিরূপে প্রমাণিত হয়েছে। কেননা, এশিয়ার পূর্বভাগ থেকে সৃষ্ট এই মঙ্গোলীয় জাতির প্রধান তিনটি ভাগ রয়েছে-

০১.উত্তর বা এশিয়া মহাদেশীয় মঙ্গোলয়েড

০২.দক্ষিণ বা এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় মঙ্গোলয়েড।

০৩.আমেরিকান মঙ্গোলয়েড বা আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান ।

এই তিনটি মঙ্গোলীয় জাতির বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ

উত্তর মঙ্গোলীয় বা এশিয়া মহাদেশীয় বা আদর্শ মঙ্গোলীয়:

এ জাতির গায়ের রং হলদে, মুখমণ্ডল চ্যাপ্টা, দাড়ি-গোঁফ রয়েছে সামান্য, হালকা চোখবিশিষ্ট এবং চুল সব সময় দৃঢ় নয়।

দক্ষিণ মঙ্গোলীয় বা এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয়

এদের গায়ের রং তামাটে বা কালচে, মুখমণ্ডল নিচু ও সরু। ঠোঁট মাঝারি বা হালকা। নাক থ্যাবড়া, উত্তর মঙ্গোলীয়দের চেয়ে খাটো, মাথার চুল কখনও কখনও ঢেউ খেলানো। নৃতাত্ত্বিকগণ বলেছেন, মঙ্গোলীয় জাতির রয়েছে বিরল শ্মশ্রু, চোয়াল, চ্যাপ্টা নাক ও ভারি ভুরু। তাদের চোখ বাদামী এবং এ বৈশিষ্ট্যই তাদেরকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। দৈহিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাদেরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে- ১) আদি মঙ্গোলীয় (paleo-mongoloid) এবং ২) তিব্বতি মঙ্গোলীয় (Tibeto-mongoloid) (ঘোষ, ২০০০)।

আমেরিকান রেড ইন্ডিয়ান

আমেরিকান রেড ইন্ডিয়ানদের নৃগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হাসান (২০০৫: ১৯১-১৯৩) বলেন,

এদের গায়ের রং তামাটে হলদে। মুখমণ্ডল চ্যাপ্টা, চুল কালো, সোজা ও শক্ত। দাড়ি-গোঁফ কম, চোখ গাঢ় ও বাদামী, ঝুটির মত না হলেও চোখের কোণে ভাঁজ আছে। নাক খাড়া, নাসাযোজক উঁচু থেকে মধ্যম। কখনও কখনও তরঙ্গিত চুল।

উপর্যুক্ত মঙ্গোলীয় জাতির নৃতাত্ত্বিক গঠন থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পাত্র সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠি উত্তর বা এশিয়া মহাদেশীয় মঙ্গোলয়েড ও দক্ষিণ বা এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় মঙ্গোলয়েড-এ দুয়ের মিশ্রণে গঠিত। পাত্রদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় হলো তাদের দৈহিক আকৃদি মাঝারি উচ্চতাসম্পন্ন, কপাল দীর্ঘ, গায়ের রঙ বাদামি বা হলুদাভ, তবে কেউ কেউ শ্যামল বা কৃষ্ণবর্ণ। এতে প্রমাণিত হয় তারা মিশ্র জাতি (সুলতান, অনুল্লেখ)।

এ জনগোষ্ঠির আদি ব্যক্তিত্ব রাজা গৌড় গোবিন্দের জন্ম কথারূপে সুলতান (অনুল্লেখ: ৮) যে কিংবদন্তির উল্লেখ করেছেন, তা নিম্নরূপ-

> ত্রিপুরার কোন এক রাজার শত শত মহিষী ছিলেন। এর মধ্যে কোন এক মহিষীর সংগে মনুষ্যকারে সমুদ্রদেব বরুণ সম্মিলিত হন। ফলে রানীর গর্ভ সঞ্চার হয়। এই গর্ভের কথা প্রকাশ পাইলে রাজা তাহাকে নির্ব্বাসিত করেন। নির্ব্বাসিত অসহায় রানীর এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। সমুদ্র দেব তখন রানীকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করেন যে, তাহার আদেশে

> সমুদ্রের জল সরিয়া যাইবে এবং যতদূর চড়া পড়িবে ততদূর পর্যন্ত রানীর শিশুপুত্র রাজ্যাধিকার লাভ করিবে। এই শিশুপুত্রই গৌড় গোবিন্দ। উক্ত কিংবদন্তীর ঐতিহাসিক সত্যতা প্রমাণ করা দুরূহ। তবে পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা রাজ্যের টিপরা জনগোষ্ঠীর সাথে পাত্র সম্প্রদায়ের বংশগত যোগসূত্র থাকা অসম্ভব কিছু নয়। তবে তা অবশ্যই নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ভিত্তিতে প্রমাণ সাপেক্ষ।

পাত্রদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় দিতে গিয়ে চক্রবর্ত্তী (২০০০: ২৮-২৯) লিখেছেন:

> আদিবাসী পাত্র কারা? -এ প্রশ্নটির কোনো যথার্থ উত্তর পাওয়া যায়নি। আদিবাসী পাত্র সম্প্রদায়ের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের জন্য কোনো জরিপকার্য পরিচালিত হয়নি। ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত Edward Dalton এর 'Tribal History of Eastern India' বা পরবর্তীকালে 'Ethnographic Survey of India'- তে পাত্র সম্প্রদায়ের কোন উল্লেখ নেই। অনুরূপভাবে ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত James Wise এর Notes on the Races, Castes, and Tribes on Eastern India (vol.1-2) গ্রন্থেও পাত্র সম্প্রদায় অনুল্লেখ। H.H Risely প্রণীত 'Castes and Tribes' গ্রন্থে পাত্র সম্প্রদায়ের সামান্য উল্লেখ থাকলেও সেখানে তাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় নেই। কেবলমাত্র ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত R.M Nathএর 'Background of Assamese culture' গ্রন্থে আদিবাসী পাত্রদের চুটিয়া হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর ফলে আদিবাসী হিসেবে পাত্র সম্প্রদায়ের একটা পরিচয় দেয়ার চেষ্টা করা হলেও তাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় অজানার অন্ধকার বিবরে রয়ে গেছে। পাত্রদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় মিশ্রিত বলে মনে হয়। তাদের একাংশের মধ্যে মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। কিন্তু অন্য অংশে বিভিন্ন জাতিগত বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। তাদের দেহের গড়ন বিভিন্ন, গায়ের রং বিভিন্ন, তারা খাসিয়াদের মতো শক্ত গড়নের অধিকারী নয়। এক কথায় বলা যেতে পারে যে, তাদের দৈহিক গড়ন ও বৈশিষ্ট্য বাঙালিদের মতো নয়।

বাঙলার আদিম অধিবাসীরা ছিলেন অস্ট্রিক (মুণ্ডারী) ভাষা গোষ্ঠির লোক। নৃতত্ত্বের ভাষায় এদের প্রাক-দ্রাবিড় বা 'আদি অস্ত্রাল' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সাহিত্যে এদেরকে 'নিষাদ' বলা হয় (সুর, ১৯৯০)। বাঙলার আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল, কোরা, লোধা প্রভৃতি উপজাতিসমূহ এই গোষ্ঠিভুক্ত। এছাড়া, হিন্দু সমাজের 'অন্ত্যজ জাতিসমূহও এই গোষ্ঠীরই বংশধর। উল্লেখ্য যে, সিলেটে বসবাসরত উপজাতিদের পূর্ব পুরুষেরা এ অঞ্চলে এসেছিল উত্তর-পূর্ব দিক থেকে এবং তাদের শরীরে প্রধানত মঙ্গোলীয়ান রক্তের ধারা প্রবাহমান' (মোহান্ত, ১৯৯৯: ৬৬৭)। সিলেটের ক্রমক্ষয়িষ্ণু পাত্র সম্প্রদায়ও এই গোষ্ঠিভুক্ত। তাঁদের মধ্যে মঙ্গোলয়েড ও অন্যান্য জাতির মিশ্রণ লক্ষ করা যায়।

পাত্র সম্প্রদায়ের সঠিক নৃতাত্ত্বিক পরিচয় জানা যায়নি বলে তাঁদের জাতিসত্তার পরিচয় সংকট (identity crisis) রয়েছে। তাঁরা কখনও কখনও 'পাতর', আবার কখনও 'পাথর' হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে। সম্ভবত অঙ্গারিক কয়লা উৎপাদন করত বলে তাঁদেরকে বলা হত 'পাথর' যা পরবর্তীকালে অপভ্রংশে রূপান্তরিত হয়ে 'পাতরে' রূপ নিয়েছে। অবশ্য তাঁরা নিজেদেরকে লালেং বা লালং বলে অভিহিত করে থাকেন। এই লালেং বা লালং শব্দের অর্থ হলো পাত্র। সিলেটে স্থানীয়ভাবে জমির দলিলপত্রে তাঁদের 'পাথর' বা খাসিয়া হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু পাত্রদেরকে খাসিয়া হিসেবে উল্লেখ করার যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ নেই। কেননা খাসিয়াদের সঙ্গে পাত্রদের নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক কোন সাদৃশ্য নেই। কাজেই পাত্রদেরকে নিজস্ব পরিচয়েই উল্লেখ করা উচিত।

আদিবাসী পাত্ররা নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের সঙ্কটে অবর্তীর্ণ হলেও তাঁরা যে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাদের শ্রেণিতে গণ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মোহান্তের (১৯৯৮: ৪৭-৪৮) বিবেচনায় সে বিষয়টি পরিস্ফুট হয়েছে নিম্নোক্ত তালিকায়–

সিলেটের উপজাতি: পেশা ও অবস্থান

আদিবাসী	প্রধান পেশা	বর্তমান অবস্থান
১। খাসিয়া	জুম চাষ, পান, তৈজপাতা ও কমলা প্রভৃতি ফলমূল উৎপাদন।	(১) মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানার ৭টি, বড়লেখা থানায় ১৫টি, শ্রীমঙ্গল থানায় ১৩টি, রাজনগর থানায় ২টি এবং কুলাউড়া থানায় ২৮টি পুঞ্জী; (২) সিলেট জেলার কানাইঘাটে ২টি, জৈয়ন্তিয়াপুরে ৪টি এবং গোয়াইনঘাট থানায় ৬টি পুঞ্জী; (৩)হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল থানায় ৩টি পুঞ্জী।
২। মণিপুরী	কৃষিকাজ, বস্ত্রবয়ন চারু ও কারু শিল্প,	মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানায় ১৬টি, শ্রীমঙ্গল থানায় ৪টি, কুলাউড়া থানায় ৪টি এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার চাকুরি ইত্যাদি বড়লেখা থানায় ৫টি গ্রাম; (২) হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট থানায় ৪টি গ্রাম; (৩) সিলেট জেলার সদর থানায় ১৩টি গ্রাম;(৪) সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক থানায় ৩টি গ্রাম।
৩। ত্রিপুরা	জুম জাতীয় চাষ-বাস ইত্যাদি	(১) মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানার টিপরাবাড়ি শ্রীমঙ্গল থানার টিপারা ছড়া ও ডলু ছড়ায় এবং (২) হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর থানার সাতছড়ি রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকায় ফরেস্ট ভিলেজার হিসেবে বসবাসরত।
৪। পাত্র (পাতর)	কৃষিকাজ ও কাঠ কয়লা বিক্রয় ইত্যাদি	বর্তমান সিলেট জেলার সদর ও গোয়াইনঘাট থানার ১৭ টি গ্রাম
৫। গারো	জুম চাষ, হাল চাষ, পশুপাখি ও মৎস্য শিকার ইত্যাদি ।	সুনামগঞ্জ জেলার (১) বিশ্বম্ভপুর, (২) তাহিরপুর ও (৩) ধর্মপাশা থানার অংশবিশেষ।
৬। হাজং	কৃষিকর্ম ও কাপড় বোনা ইত্যাদি	সুনামগঞ্জ জেলার (১) বিশ্বম্ভপুর, (২) তাহিরপুর (৩) (ধর্মপাশা) ও (৪) মধ্যনগর থানার অংশবিশেষ।

এ তালিকায় লক্ষণীয় যে খাসিয়া, মণিপুরী, ত্রিপুরা, গারো, হাজং, হালাম প্রভৃতি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির ন্যায় পাত্র বা পাতর সম্প্রদায়কে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে পাত্ররা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

এক) তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনধারা হবে আদিম।

দুই) প্রাক-কৃষি সভ্যতার প্রযুক্তির ব্যবহার থাকবে।

তিন) সাক্ষতার হার হবে কম।

চার) বসতিগুলি হবে প্রত্যন্ত ও দুর্গম জায়গায়।

পাঁচ) জনসংখ্যা হবে স্থির অথবা ক্রমহ্রাসমান।

এ বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যালোচনা করে সহজেই অনুমিত যে, পাত্র জনগোষ্ঠির সঙ্গে এসব বৈশিষ্ট্যের অধিকাংশের সাদৃশ্য বিদ্যমান। পাত্র এলাকার বসতিগুলি বর্তমানে দুর্গম না হলেও পূর্বে তাদের বসতিগুলো দুর্গম ও প্রত্যন্ত ছিল তার ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে। পাত্র জনগোষ্ঠি মঙ্গোলীয় (mongoloid) জাতির তিনটি উপশাখার একটি শাখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সুলতান (অনুল্লেখ: ৮) এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

> এ জনগোষ্ঠী মোঙ্গঁলাকার (mongoloid) জাতির একটি উপশাখা। অবশ্য গাত্রবর্ণে শ্যামলরংগের ঈষৎ মিশ্রণের জন্য কেউ কেউ এদেরকে খাঁটি মোঙ্গোঁলাকার বলে স্বীকার করতে চান না। তাদের মতানুসারে মোঙ্গোলাকার জাতির সাথে প্রাথমিক দক্ষিণাকার (proto Austroloid) জাতির সংমিশ্রণের ফলে এ মানবগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে।

ক্ষুদ জাতিসত্তা পাত্রদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে অস্পষ্টতা দেখা যায়। তাঁদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় মিশ্রিত। তাদের একাংশের মধ্যে মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে। আবার কিছু অংশে জাতিগত প্রভাব স্পষ্ট। তাঁদের দেহের গড়ন বিভিন্ন (ম্রি, ২০০৭)। পাত্রদের আকৃতি, গঠন এবং ভাষা তাঁদেরকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির পরিচয় দানে যথেষ্ট। বসতির দিক থেকেও পাত্রদেরকে এই অভিধায় ভূষিত করা যায়। সমতল ভূমিতে পাত্রদের বসতি নেই বললেই চলে। পাহাড় বা টিলার উপর অনেকেরই বসতি। খাদিমনগর টিলার উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে প্রায় সারিবদ্ধভাবে (cluster) পাত্রদের বসতি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংঘবদ্ধ জীবনের পরিচায়ক (চক্রবর্ত্তী, ১৯৯৮)।

পাত্ররা হিন্দু ধর্মাবলম্বী হলেও বর্ণ হিন্দুদের সাথে তাঁদের নৃতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। তাঁদের পেশা, সামাজিক কাঠামো, নিয়ম-রীতি, সমাজ নিয়ন্ত্রণ কৌশল, আচারব্যবহার, ধর্মীয় বিশ্বাস, ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে প্রথাবদ্ধ হিন্দুদের সঙ্গে অনেকটা পার্থক্য লক্ষ করা যায়। বহু বছর যাবৎ

শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে বসবাসকারী পাত্ররা প্রতিবেশী আর্য-অনার্য হিন্দু ও ইসলাম ধর্মাম্বলম্বী বাঙালিদের পাশাপাশি বসবাস, মেলামেশা, আদান-প্রদান করা সত্ত্বেও যেমন অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার-সংস্কার, জীবনরীতি ইত্যাদির স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রেখেছেন, তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের আচার-সংস্কার-বিশ্বাসের সাংস্কৃতিক সংশ্লেষণ (cultural assimilation) ঘটেছে। পাত্ররা পূর্ব-পুরুষের আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতি, পেশা ইত্যাদি রক্ষার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করছে। এ কথা স্বীকার্য যে, বৃহত্তর সমাজের পরিবর্তন-পরিবর্ধন, আদান-প্রদান, মেলামেশা, বহিরাগমনের ক্ষেত্রে গতিশীলতা ইত্যাদি নানা বিষয়ে পাত্রদের গতি মন্থর। তাঁদের সামাজিক ক্রিয়াকর্ম, নিয়ন্ত্রণ কৌশল, বিয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী প্রথানুসরণ, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আচার-সংস্কার প্রভৃতিতে তারা বর্ণ হিন্দুদের সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন। ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিকগণ সমাজ সংস্কৃতির বহুবিধ উপাদান গবেষণা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস, মৃতব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, বিভিন্ন ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার মন্ত্রাদি, প্রকৃতির সৃজন শক্তিকে মাতৃরূপে পূজা, শিব ও লিঙ্গপূজা, অশ্বথ ও বটবৃক্ষের পূজা, টোটেমের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা, দেব-দেবী বাহনের কল্পনা, জীবজন্তুর পূজা প্রভৃতি আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। এছাড়াও তাঁদের বিশ্বাসের মূলে রয়েছে গ্রাম-নদী-বৃক্ষ-অরণ্য-পর্বত ইত্যাদির মধ্যে নিহিত শক্তির পূজা, মানুষের রোগব্যাধি ও দুর্ঘটনাসমূহ দুষ্টশক্তি বা ভূত-পেত্নী দ্বারা সংঘটিত বিশ্বাস, বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞাসূচক অনুশাসন প্রভৃতি। তাঁরা জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ ও শ্রাদ্ধের লোকাচার, নবান্ন, পৌষ-পার্বণ, হোলি, চড়কপূজা, গাজন, মনসা, শীতলা, কালী প্রভৃতি অনার্য ক্রিয়াও পালন করে থাকেন। এসব আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিষয়াবলি পাত্রদের মধ্যে অধিকাংশ বিদ্যমান।

সপ্তম অধ্যায়
গবেষণা পদ্ধতি

জ্ঞান চর্চার একটি গুরুত্বপুর্ণ মাধ্যম হলো গবেষণা। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Research। এই Research শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে ইসলাম (Islam, 2005:1) বলেছেন,

> The word research perhaps originates from the old French word recerechier that meant to search again.It implicitly assumes that the search is called for. In practice, the term research refers to scientific process of generating an unexplored horizon of knowledge, aiming of discovering facts, solving a problem and reaching a decision.

গবেষণার জন্য পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ প্রতীতি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। গবেষণার পরিকল্পনা যদি সঠিক ও যথার্থ না হয় তবে গবেষণাকর্ম ব্যাহত হতে পারে। তবে গবেষণা পরিকল্পনার সঙ্গে গবেষণার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট। গবেষণার শিরোনাম অনুযায়ী পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। বর্তমান গবেষণার শিরোনাম হলো বাংলাদেশে ''পাত্র সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি: একটি নৃ-ভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ (The language and culture of Patro community of Bangladesh: An anthropo linguistic analysis)''। অর্থাৎ এই গবেষণার বিষয় হলো বাংলাদেশে সিলেটে বাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি পাত্রদের সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরা। ফলে বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমি নিম্নলিখিতভাবে গবেষণা পরিকল্পনা নির্ধারণ করেছি।

৭.১ **গবেষণা পদ্ধতি** (research methodology)

সাধারণত কোনো কাজে ব্যবহৃত নিয়ম বা প্রক্রিয়াসমূহকে পদ্ধতি বলা হয়। এ সম্পর্কে আলাউদ্দিন বলেন, 'পদ্ধতি বলতে আমরা গবেষণায় ব্যবহৃত নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া বুঝি। সহজ কথায় যে জ্ঞান অন্বেষণ প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞানের নিয়ম, নীতি এবং প্রণালি ব্যবহার করা হয় তাকে পদ্ধতি বলে' (আলাউদ্দিন, ২০০৯: ১৯)। গবেষণায় সাধারণত তিন প্রকার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। এ তিন প্রকার পদ্ধতি হলো- গুণাত্মক পদ্ধতি (qualitative method), সংখ্যাত্মক পদ্ধতি (quantitative method) ও মিশ্র পদ্ধতি (mixed method)। যেহেতু এ গবেষণাকর্মে পাত্র ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের নৃ-ভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রাধান্য পেয়েছে তাই উপরিউক্ত গবেষণায় গুণগত পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। কেননা এ প্রসঙ্গে হাই (২০০৭) বলেছেন, '...in order to understand the traditional as well as changed culture, qualitative data is more meaningful and significant.' (Hye, 2007: 22)।

পাত্রদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি দিনের পর দিন পরিবর্তন হচ্ছে। এই গবেষণায় পাত্র সংস্কৃতির পরিবর্তনের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে, সংস্কৃতির কোন্ কোন দিক বেশি পরিবর্তন হয়েছে সে বিষয়ের আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে এখানে। ভাষার ওপর এই পরিবর্তন কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে সে সংক্রান্ত আলোচনাও আছে এতে। এ ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্বে পাত্র ভাষার সংস্কৃতির প্রভাবে বিষয়টি এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

এ গবেষণাকর্ম তিনটি ধাপে সম্পন্ন করা হয়েছে-

ক) লিটারেচার রিভিউ

খ) উপাত্ত সংগ্রহ

গ) উপাত্ত বিশ্লেষণ

৭.১.১ *লিটারেচার রিভিউ*

গবেষণার জন্য লিটারেচার রিভিউ বা সাহিত্য সমীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে স্বীকৃত। কারণ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণায় সাহিত্য সমীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই বিজ্ঞানের যে কোন শাখার নতুন তত্ত্ব উন্নয়নের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা ও অবদান সর্বজন স্বীকৃত (রহমান ও শওকাতুজ্জামান, ২০০০)। এখানে দুটি বিষয় সম্পৃক্ত-লিটারেচার ও তার রিভিউ। রহমান (২০০৮) এ প্রসঙ্গে বলেছেন-'লিটারেচার হলো বিভিন্ন মাধ্যমে ধারণকৃত তথ্য বা ডকুমেন্ট। আর অনুসন্ধানের প্রয়োজনে যখন ঐ ডকুমেন্ট বিভিন্নভাবে পর্যালোচনা করা হয় তখন তা হলো লিটারেচার রিভিউ' (পৃ. ৫৯)। লিটারেচার রিভিউয়ের মাধ্যমে লেখা আরও বেশি গ্রহণযোগ্যতা পায় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পূর্বে সম্পাদিত গবেষণাকর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ লাভ করা যায়। বর্তমান গবেষণায় লিটারেচার রিভিউ বলতে এ গবেষণাকর্মের মূল বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত বই ও সম্পাদিত গবেষণাকর্মের মূল্যায়ন ও পর্যালোচনাকে বুঝানো হয়েছে। কারণ,

> মানবজাতির সর্বকালের সবচেয়ে বড় অর্জন হলো লিটারেচার। সভ্য মানবজাতির যাবতীয় তত্ত্ব,মতবাদ, ইতিহাস, দর্শন, পদ্ধতি, কৌশল, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি সবকিছুই ধারণ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে লিটারেচার আকারে। তাই অর্জিত জ্ঞানের আঁধার এবং উৎস হলো লিটারেচার (রহমান, ২০০৮: ৫৯)।

এ গবেষণাকর্মের লিটারেচার রিভিউয়ের জন্য প্রাসঙ্গিক যেসব উপকরণকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

১। প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক

২। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ ও নিবন্ধ

৩। বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ও প্রবন্ধ

৪। গবেষণা প্রতিবেদন

৫। সমসাময়িক পরিসংখ্যান

৬। বিশেষজ্ঞগণের অভিমত

৭। ব্যক্তিগত, সরকারি ও বেসরকারি নথিপত্র প্রভৃতি।

৭.১.২ উপাত্ত সংগ্রহ

উপাত্ত সংগ্রহ গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তাই সংগৃহীত উপাত্তই গবেষণার প্রাথমিক শর্ত। যে কোন গবেষণার প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা। গবেষণা বা অনুসন্ধানের ক্ষেত্র হতে যে সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করা হয় বা গণনা করে পরিমাপ করা হয় তাকে তথ্য বা উপাত্ত বলে (আলী, ২০০৮)। গুণাত্মক পদ্ধতি অনুসৃত বর্তমান গবেষণায়ও সঙ্গত কারণেই এ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণায় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে নিচের দুটি প্রক্রিয়ায়-

ক) প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে

খ) সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে

এই গবেষণায় উপাত্ত সংগ্রহের উৎস হচ্ছে-

ক) প্রাথমিক উৎস (primary source)

খ) দ্বৈতীয়িক উৎস (secondary source)

৭.১.২.১ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ

গবেষণায় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের একটি অন্যতম কৌশল হলো প্রশ্নপত্র (questionnaire) প্রণয়ন। ‘প্রশ্নপত্র হচ্ছে এমন এক কৌশল যেখানে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ আকারে একাধিক প্রশ্ন সন্নিবেশ করা হয় (রহমান, ২০০৮: ১৭৮)। তবে গবেষণার বিষয়ভেদে গবেষণার প্রশ্নপত্রের ধরনও ভিন্ন হয়ে থাকে। এ গবেষণায় নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রশ্নের আশ্রয় নেয়া হয়েছে-

ক) খোলা প্রশ্ন (open-ended questions)

খ) আবদ্ধ প্রশ্ন (Close-ended questions)

৭.১.২.২ *সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে উপাত্ত সংগ্রহ*

সরাসরি প্রশ্নের মাধ্যমে কিংবা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তথ্যদাতার নিকট থেকে যে কৌশলে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় তাকে বলা হয় সাক্ষাৎকার পদ্ধতি। ইসলাম (২০০৮: ১৭৩) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'সাধারণভাবে বলা যায় দুই বা ততোধিক ব্যক্তির (দল, সমষ্টি) মধ্যে উদ্দেশ্যমূলক কথোপকথনই হলো সাক্ষাৎকার'। গবেষকগণ সরাসরি কথোপকথন বা বাক্যালাপের মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের চেষ্টা করে থাকেন। এ গবেষণায় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে।

৭.১.২.৩ *প্রাথমিক উৎস*

আলোচ্য অভিসন্দর্ভে পাত্রভাষা সংগ্রাহক নির্বাচন, প্রশ্নমালা প্রণয়নের দ্বারা তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, কিছু কেস স্টাডি সম্পাদন ইত্যাদির মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত উপাত্তই গবেষণার প্রাথমিক উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। (ছবি: ৩.১ দ্রষ্টব্য)

৭.১.২.৪ *দ্বৈতীয়িক উৎস*

বিভিন্ন জার্নাল, সাময়িকী, নিবন্ধ, গবেষণা প্রবন্ধ, দৈনিক সংবাদপত্র, প্রাতিষ্ঠানিক নথি, স্থানীয় প্রকাশনা সংস্থা, সেমিনারপত্র, জরিপ প্রতিবেদন, জনগণনা, অভিসন্দর্ভ, গেজেটিয়ার ইত্যাদি এ গবেষণাকর্মে দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে গৃহীত হবে।

৭.২ উপাত্ত বিশ্লেষণ

গবেষণার উপাত্ত বিশ্লেষণ অন্যতম উপায় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। রহমান ও শওকতুজ্জামান (২০০০: ২৬৫) এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

> সমাজ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যাবলি বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাকরণ গবেষণা প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। যে সমস্ত সুনির্দিষ্ট প্রশ্নাবলী সামনে রেখে গবেষখ অনুসন্ধান কাজ পরিচালনা করে প্রাথমিক তথ্যরাজি সংগ্রহ করেন সেগুলি সুসংক্ষিপ্ত করে ব্যবহার উপযোগী করাই হলো তথ্য বিশ্লেষণের অন্যতম লক্ষ্য।

আলোচ্য গবেষণায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত ভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। (ছবি: ৩.২ দ্রষ্টব্য)

৭.৩ গবেষণা প্রকৃতি (nature of the research)

এ গবেষণাকর্মে দুটি শাস্ত্রগত পর্যায় সন্নিবেশিত হয়েছে। একটি ভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, অন্যটি নৃবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। ভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে পাত্র ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, অর্থতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের অনুপুঙ্খ আলোচনা। অন্যদিকে নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে গুরুত্ব পেয়েছে পাত্র ভাষার সামগ্রিক সাংস্কৃতিক অভীক্ষা। পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার জন্য মৌখিক ভাষাকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যেহেতু–

> পাত্র সম্প্রদায় সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যের একান্ত অভাব। এর মূল কারণ আদিবাসী পাত্র সম্প্রদায় নৃবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, ভাষাবিজ্ঞানীদের দৃষ্টির বাইরে রয়ে গেছে। ঔপনিবেশিক আমলে জেমস ওয়াইজ, রিজলে, ড্যালটন ও আলেকজান্ডার ম্যাকেঞ্জি প্রণীত গ্রন্থমালায় আদিবাসী পাত্র সম্প্রদায় তেমন কোন স্থান পায়নি; ফলে আদিবাসী পাত্র সম্প্রদায়ের প্রাচীন ইতিহাস অদ্যাবধি অনুদঘাটিত (চক্রবর্ত্তী, ২০০০: ১৪)।

অষ্টম অধ্যায়
পাত্র ভাষা বিশ্লেষণ

আমাদের দেশের নৃবিজ্ঞানীগণ বাংলাদেশের সীমান্তবাসী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠিদের সম্পর্কে যে ধারণা দিয়েছেন, তাতে তাঁদের আবাসন ও অবস্থান, বৈশিষ্ট্য ও জীবনাচারণ ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা স্পষ্টতই বুঝতে পারি যে, সাধারণ লোকালয় পরিহার করে পার্বত্য বা অরণ্যসংকুল গড় অঞ্চল ও অন্যান্য দূর সীমান্তবর্তী এলাকায় বসতি স্থাপন করা যেমন তাদের বিশেষত্ব, তেমনি দেশের মূলস্রোতের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এক ভাষা ও সংস্কৃতির ধারায় নিজেদের নিভৃত জীবন পরিচালনাও তাঁদের একটি বৈশিষ্ট্য। নৃবিজ্ঞানীগণের আলোচনায় তা নিম্নরূপে প্রকটিত হতে দেখা যায়।

আমাদের দেশের ষোলো কোটি জনসংখ্যার ক্ষুদ্র একটি অংশ হলো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি। ধর্ম ও বর্ণের দিক থেকে তাঁরা ভিন্ন এবং তাঁদের ভাষা ও সংস্কৃতি এবং আচার-আচরণ মূল স্রোত (main stream) থেকে স্বতন্ত্র (মজিদ, ২০১৫)। বাংলাদেশের সিলেট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চলে এই সব ক্ষুদ্র জাতি, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষ বাস করলেও দেশের অন্যান্য অঞ্চলে তাঁদের আরও বিস্তৃতি লক্ষ করা যায়। রহিম বলেছেন, 'বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এসব ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অবস্থান। বিশেষ করে, বৃহত্তর ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রাজশাহী, সিলেট, পটুয়াখালী, পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রভৃতি এলাকায় এরা বসবাস করে' (রহিম, ২০১৭: ১৪৭)। বিভিন্ন সংস্থা ও গবেষকদের পরিসংখ্যানে সিলেটের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠিদের তথ্য পাওয়া যায়। গবেষকগণ তাঁদের সংখ্যা নির্ধারণে যেমন সচেষ্ট হয়েছেন তেমনি তাঁরা এসব জাতিসত্তার ভাষা ও সংস্কৃতি আলোচনায়ও প্রবৃত্ত হয়েছেন। খাঁ (২০১৪) এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, 'বৃহত্তর সিলেটেই ছোট–বড় মিলিয়ে ৩৭টি ক্ষুদ্র–নৃগোষ্ঠী রয়েছে। ই.সি.ডি.ও নামক আরেকটি সংস্থার জরিপে একই মত উঠে এসেছে। এইসব নৃ–গোষ্ঠীর প্রত্যেকের ভাষা স্বতন্ত্র' (পৃ. ২৭)। কারণ 'সকল জাতির একটি অন্তঃশীল ভাষা থাকে। সে ভাষায় অঙ্কিত থাকে জাতির দীর্ঘ সময়ের জীবনাচার, গৌরবগাথা ও বঞ্চনার প্রতিচ্ছবি' (আইয়োব, ২০১১: ২৬)।

সিলেটের বিভিন্ন ক্ষুদ্র–নৃগোষ্ঠির মধ্যে পাত্র সম্প্রদায় একটি। পাত্রদের রয়েছে স্বতন্ত্র ভাষা ও সংস্কৃতি। সংস্কৃতির এসব মৌলিক উপাদানই প্রমাণ করে যে, পাত্ররা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি। চক্রবর্ত্তী বলেছেন, 'তাদের আদিবাসী বৈশিষ্ট্যের উল্লেখযোগ্য প্রমাণ তাদের ব্যবহৃত ভাষা। এই ভাষা সকল জ্ঞাত ভাষা এবং বাংলাদেশের আদিবাসীদের ভাষা হতে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন প্রকৃতির' (চক্রবর্ত্তী, ২০০০ : ৬৯)।

৮.১ ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে পাত্র ভাষার অবস্থান

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠিদের ভাষার সঠিক তথ্য নিরূপণ অত্যন্ত জটিল বিষয়। কারণ 'আদিবাসীদের মধ্যে এমন অনেক গোষ্ঠী আছে, যারা তাদের প্রাক্তন ভাষা হারিয়ে ফেলেছে অথবা বিস্মৃত হয়েছে' (ঘোষ, ২০০০: ৬৬)। আবার অনেক জনগোষ্ঠির ভাষার কোনো লিখিত নিদর্শন নেই। সিলেটের ক্ষুদ্র নৃ–গোষ্ঠি পাত্র সম্প্রদায়ের ভাষার কোনো লিখিত রূপ নেই বলে তাদের ভাষার সঠিক তথ্য সংগ্রহে এরূপ সমস্যার উদ্ভব হয়েছে।

ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে গবেষকগণ পাত্র সম্প্রদায়কে চীনা–তিব্বতি ভাষাবংশের অন্তর্গত বোড়ো শাখার ভাষা বলে মন্তব্য করেছেন। মোহান্ত এ প্রসঙ্গে বলেন– 'নৃতাত্ত্বিকভাবে স্বল্প শিক্ষিত পাত্ররা বৃহত্তর 'বোডো' জনগোষ্ঠীর বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন' (১৯৯৯: ৬৬৮)। অন্যত্র তিনি পাত্র সম্পর্কে বলেছেন, 'Patra: Scholars are of opinion that ethnically not well known patras belong to the greater Bodo community' (1999: 805)। সব মিলিয়ে পণ্ডিতগণ গবেষণালব্ধ প্রজ্ঞায় ও বিশ্লেষণে পাত্র ভাষার ঐতিহাসিক পটভূমি অন্বেষণে পাত্র ভাষার স্বরূপ উদঘাটনে প্রয়াসী হয়েছেন। পাত্র ভাষার কুলজি বা বংশগতি নিম্নোক্তভাবে দেখানো যায়–

পাত্র ভাষার কুলজি

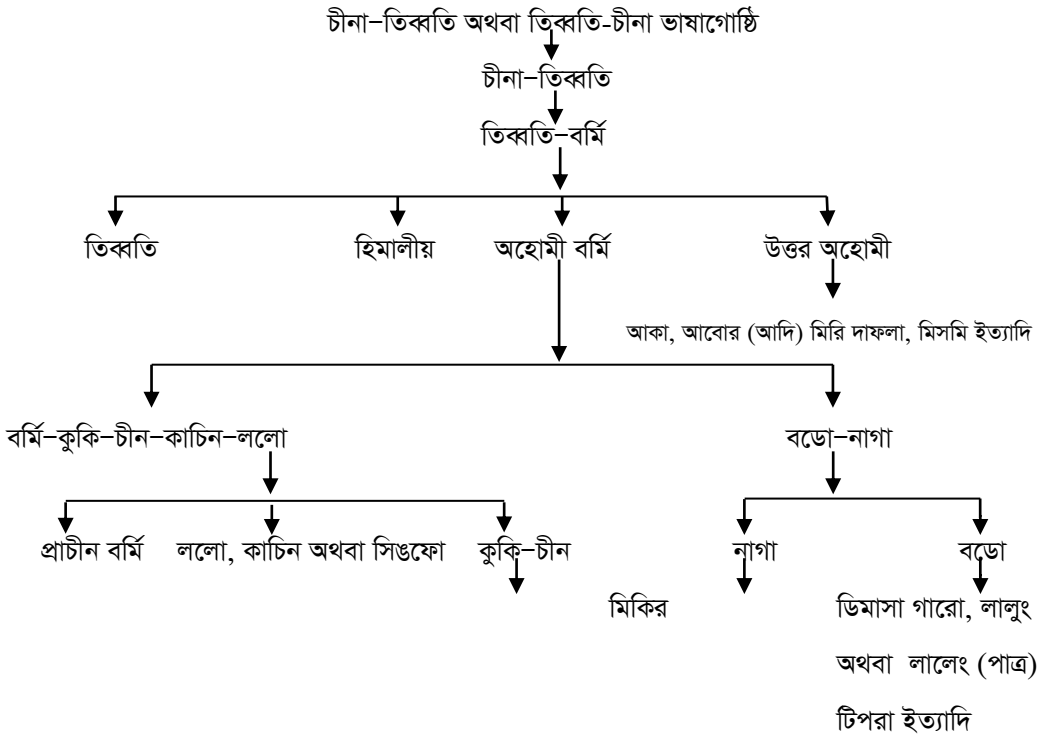

উৎস: (খাঁ, ২০১৪: ২৭)

৮.২ পাত্র ভাষার বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় সিলেট অঞ্চলে রয়েছে বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির মানুষ। এসব মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতি স্বতন্ত্র (বিশ্বাস ও আসাদুজ্জামান, ২০০৭)। পাত্র সম্প্রদায় তাঁদের মধ্যে একটি। পাত্রদের সংস্কৃতি তথা আলাদা ভাষা রয়েছে। পাত্র ভাষার অবস্থা অবগত হওয়ার জন্য প্রয়োজন তাঁদের সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য অন্বেষণ। সরকারিভাবে পাত্রদের নিয়ে তেমন কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি বলে তাদের ইতিহাস, ভাষা ও সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ তথ্য এখনো অনুদ্‌ঘাটিত। তবে মাঠ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে সিলেট অঞ্চলের পাত্র সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব হয়েছে। তাঁরা নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে সংজ্ঞাপনে পাত্র ভাষাই ব্যবহার করে থাকেন। তবে অন্য ভাষী জনগোষ্ঠির সঙ্গে সংজ্ঞাপনে পাত্ররা বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে বাধ্য হয়।

পাত্রভাষায় বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন জাতিসত্তার অনেকেরই নিজস্ব ভাষা ও বর্ণমালা রয়েছে, যেমন-সাঁওতালদের লিপি–অলচিকি, গারোদের মান্দি, চাকমা ও তংচঙ্গাদের চাকমা, মুরং বা ম্রোদের মুরং, কুকীদের কুকী ইত্যাদি। কিন্তু পাত্রদের নিজস্ব সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষা ব্যবহার তাদেরকে স্বকীয়তা দান করলেও তাদের ভাষার কোনো বর্ণমালা বা লিপি নেই। পাত্রদের সঙ্গে কথা বলে অবগত হওয়া গেছে যে, তারা তাদের ভাষার নাম দিয়েছে লালং বা লালেং বা পাত্র। লালেং শব্দের অর্থ হলো 'পাথর'। পাত্ররা নিজেদেরকেও লালং জাতি হিসেবে পরিচিত হতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (২০০২) গ্রন্থে পাত্রদেরকে খাসিয়া জাতির অন্তর্গত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুলতান *পাত্র জাতির কথা* গ্রন্থে পাত্রদের আলাদা সমাজ, সংস্কৃতি ও জনসংখ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর আলোচনায় পাত্রদের নিজস্ব, ভাষা, স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও নিজস্ব ভাষাপরিমণ্ডলের দিক দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন তিব্বতি, বর্মি আসাম অঞ্চলের সব ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তাঁর *Linguistic Survey Of India* গ্রন্থে। এ গ্রন্থে তিনি পাত্র সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সরাসরি আলোচনা না করলেও সিলেট যেহেতু আসামের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সে কারণে আসামী প্রভাব সিলেটী ভাষায় তথা পাত্র ভাষায় থাকা অসম্ভব নয় বলে মনে মনে করেন। সিলেট অঞ্চলে প্রচলিত মনিপুরি, খাসিয়া প্রভৃতি ক্ষুদ্র জাতির উপভাষা সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছেন, সেখানে পাত্র ভাষার উল্লেখ নেই। কাজেই পাত্রদের ভাষা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে সন্দেহ থাকা অসম্ভব কিছু নয়। খাঁ (২০১৪: ২৮) এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন–

> বৃহত্তর সিলেটের লালেং আদিবাসীদের নিজের একটি প্রচলিত ও প্রাচীন ভাষা আছে, তবে সেই ভাষার নিজস্ব কোন বর্ণমালা নেই। কাজেই তাদের নিজস্ব বর্ণমালায় কোন সাহিত্যকর্ম, দলিল দস্তাবেজ, চিঠিপত্র ইত্যাদির চর্চা কোন কালে ছিল কিনা সেটি ভাষাবিদদের গবেষণার বিষয়।

ইতিহাসে পাত্র ভাষার তেমন উল্লেখ না থাকলেও পাত্র ভাষা যে পাত্রদের নিজস্ব ভাষা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ ভাষা সব জ্ঞাতভাষা এবং বাংলাদেশে অন্যান্য ভাষা হতে পৃথক। পাত্র আদিবাসীদের মধ্যে এ ভাষা প্রচলিত রয়েছে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা নিত্যদিনের ভাবের আদান প্রদান করে থাকে এ ভাষায়। যুবক, বৃদ্ধ, প্রৌঢ় সবাই এ ভাষায় নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে। এ প্রসঙ্গে বিশ্বাস বলেছেন-

> The Patro community has their own language and they speak among themselves in their vernacular language. But they communicate with other people especially to Bengali community with sylheti dialect (Biswas, 2015: 109).

পাত্র ভাষা সিলেটে বসবাসরত অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভাষা থেকে পৃথক। হাই (Hye, 2007: 79) বলেছেন, 'Their language has no alphabet. That language is completely different from any other ethnic group and nation's language'.

চক্রবর্ত্তী (২০০০) সালে পাত্র জনসংখ্যা ২০৩৩ জন বলে উল্লেখ করেছেন। পাত্র ভাষীর সংখ্যা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, পাত্র (২০১৫: ৩১৭) লিখেছেন–

> পাত্রদের জনসংখ্যা সম্পর্কে সরকারি পরিসংখ্যান থেকে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। ২০০৬ সালে বারসিক বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত জরিপে সিলেটের তিনটি উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের ৩২টি গ্রামে পাত্রদের মোট জনসংখ্যা ৩,৩৬৫ জন পাওয়া যায়। তবে পাত্রদের মতে, তাদের লোকসংখ্যা আনুমানিক সাড়ে চার হাজার হবে এবং পরিবারের সংখ্যা প্রায় পাঁচ থেকে ছয়শত হবে (চাকমা ও অন্যান্য, ২০১৫ : ৩১৭)।

২০১৪ সালের আরেকটি বেসরকারি সংস্থা (পাসকপ) কর্তৃক 'পাত্র সম্প্রদায়ের আর্থ–সামাজিক অবস্থা–২০১৪' শীর্ষক জরিপে পাত্রদের সংখ্যা ৩২৬৯ বলে উল্লেখ করা হয়। উল্লেখ্য যে, প্রায় বিশ বছর পূর্বে চক্রবর্ত্তী পাত্র জনসংখ্যা ২০৩৩ বলে উল্লেখ করেছেন; ২০১৪ সালের জরিপে পাত্র জনসংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশি দেখানো হয়েছে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও পাত্র ভাষা বিপন্ন ভাষা হিসেবে গবেষকগণ উল্লেখ করেছেন। ইউনেস্কোর বিপন্ন ভাষার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, যে ভাষার

ভাষী সংখ্যা ১০০০ এর নিচে সে ভাষাকে বিপন্ন ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা হবে (UNESCO, 2003)। বর্তমানে সারা পৃথিবীর প্রায় ৬০০০ ভাষার গুরুত্বপূর্ণ দুটি ডাটাবেজ রয়েছে, এর মধ্যে একটি হলো ইউনেস্কো অ্যাটলাস (UNESCO's Atlas) এবং অন্যটি এথনোলগ (Ethnologue) (Lewis, 2016)। ইউনেস্কো অ্যাটলাসে পৃথিবীর ভাষাসমূহের জীবন্ততা নিরূপণের (Language Vitality Assessment) ক্ষেত্রে ছয়টি বিষয় নির্ধারণ করেছে, যেমন– (১) এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে ভাষা ব্যবহার, (২) মোট ভাষীর সংখ্যা, (৩) মোট জনসংখ্যার মধ্যে ভাষা ব্যবহারকারীর সংখ্যা (৪) ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্র (৫) মিডিয়া ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহার (৬) শিক্ষা উপকরণ ও সাক্ষরতার হার ইত্যাদি। ইউনেস্কোর ২ নং মানদণ্ড ব্যতীত অন্যান্য সব মানদণ্ড পাত্র ভাষার বিপন্নতাকে নির্দেশ করে। কারণ পাত্র ভাষীর সংখ্যা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও পাত্র ভাষা ব্যবহারকারীর সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। পাত্র এলাকায় বাঙালি ও অন্যান্যদের বসবাসের কারণে পাত্রদের সঙ্গে অন্যান্যদের দৈনন্দিন সংশ্রবের ফলে তারা বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে। অন্যদিকে, কম বয়সী পাত্ররা সংজ্ঞাপনে পাত্র ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে বেশি স্বাচ্ছন্দবোধ করে। পূর্বের তুলনায় পাত্রদের মধ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষিতদের অধিকাংশ বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় দৈনন্দিন যোগাযোগ করে থাকেন। সবকিছু মিলিয়ে পাত্র ভাষা বর্তমানে যে একটি বিপন্ন ভাষা সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

৮.৩ পাত্র ভাষা বিশ্লেষণ

যে কোনো ভাষার নির্দিষ্ট সংশ্রয় (system) থাকে। লিখিত ভাষার ব্যাকরণিক সংশ্রয় সহজেই নির্ণয় করা যায়। যে ভাষার লিখিত রূপ নেই সে ভাষার ব্যাকরণিক নিয়ম অন্বেষণে ভাষার মৌখিক রূপকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাই পাত্র ভাষার লিখিত রূপ নেই বলে এ ভাষার ব্যাকরণ রচনায় মৌখিক রূপকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাত্র ভাষী জনগোষ্ঠি ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে রক্ষণশীল। ফলে তাঁদের ভাষার স্বরূপ উন্মোচন খুব কষ্টসাধ্য। তবুও এই গবেষণায় অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ, স্মৃতিচারণ, গল্পগুজব, দৈবচয়ন নমুনায়ন (random sampling) প্রভৃতি পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করে পাত্রদের কাছ থেকে তথ্য উদঘাটন করার চেষ্টা করা হয়েছে। পাত্রভাষা বিশ্লেষণে ধ্বনিতত্ত্ব (phonology), রূপতত্ত্ব (morphology), বাক্যতত্ত্ব (syntax) ও অর্থতত্ত্ব (semantics) এই চারটি উপাদানকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৮.৩.১ ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

কোনো ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য Danesi (2004: 48) পাঁচটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন। এগুলো হলো–

ক) ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনির প্রকৃত ভৌত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা, অর্থাৎ ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বর্ণনা (phonetic description)

খ) ধ্বনিগুলোর বৈশিষ্ট্যের মধ্যকার সম্পর্ক উন্মোচন বা ধ্বনিমূলীয় বিশ্লেষণ (phonemic analysis)

গ) অক্ষর সংগঠন বর্ণনা

ঘ) ভাষার ছন্দগুণ (সুর, স্বরাঘাত, ঝোঁক, মীড়) বিশ্লেষণ (prosodic analysis) এবং

ঙ) ধ্বনি এবং লেখ্য সাংকেতিক চিহ্নসমূহের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ বা লিখন বিধির বিশ্লেষণ (orthographic analysis) করা।

পাত্র ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও উপর্যুক্ত বিষয়সমূহকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

৮.৩.১.১ স্বরধ্বনি বিচার

স্বরধ্বনি বিচারের জন্য জিভের অবস্থা, উচ্চতা, ঠোঁট ও কোমলতালুর অবস্থা এবং চোয়ালের অবস্থা–এসব মাপকাঠি অবলম্বন করা হয়। এ মাপকাঠির ভিত্তিতে পাত্র ভাষার স্বরধ্বনিগুলি দেখানো হয়েছে। উপাত্ত অনুসারে এ ভাষায় ৭টি স্বরধ্বনি রয়েছে। এগুলো হলো– /i/, /e/, /æ/, /a/, /ɔ/, /o/, এবং /u/। নিচে ছকের সাহায্যে স্বরধ্বনিগুলো উদাহরণসহ আলোচনা করা হলো–

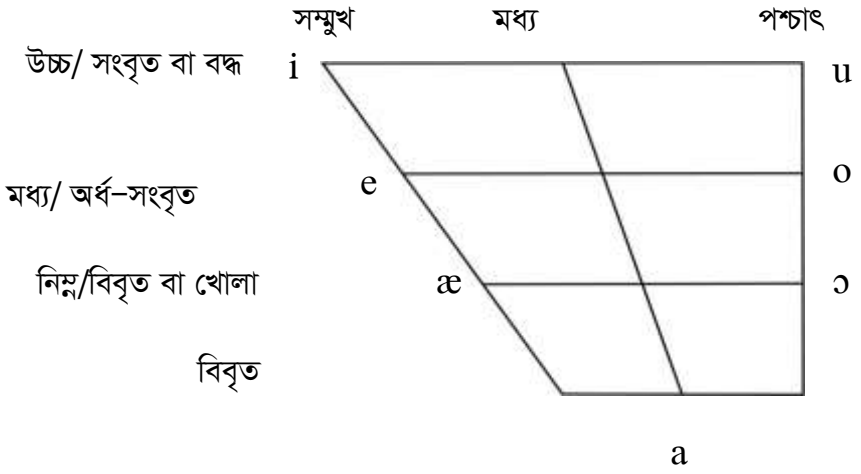

ছক : পাত্র ভাষার স্বরধ্বনি

পাত্র ভাষার স্বরধ্বনিগুলি নিচে উদাহরণের সাহায্যে উপস্থাপন করা হলো:

ক্রম	স্বরধনি	পাত্র ভাষার শব্দ আ. ধ্ব. ব. (IPA)	সমার্থক বাংলা শব্দ
১	/i/	[imbara]	হারানো
২	/e/	[er]	ঔাল
৩	/æ/	[ænlo]	গ্রহণ
৪	/a/	[aɳ]	ভাত
৫	/ɔ/	[ɔk]	মাছ

৬	/o/	[oasa]	পাখি
৭	/u/	[umfoi]	অনেক

৮.৩.১.২ অর্ধ–স্বরধ্বনি (Semi-vowel)

স্বরধ্বনি অক্ষর তৈরি করে এবং পূর্ণরূপে উচ্চারিত হয়। কিন্তু অর্ধ-স্বরধ্বনি অক্ষর তৈরি করতে পারে না এবং তা আংশিক উচ্চারিত হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে পাত্র ভাষায় ৩টি অর্ধ–স্বরধ্বনির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এগুলো হলো– /i/, /e/ এবং /u/। নিচে এ তিনটি অর্ধ-স্বরধ্বনির ব্যবহার দেখানো হলো–

ক্রম	অর্ধ–স্বরধ্বনি	লালেং ভাষার শব্দ আ. ধ্ব. ব. (IPA)	সমার্থক বাংলা শব্দ
১	/i̯/	[insai̯]	খালি
২	/e̯/	[mae̯]	কিভাবে
৩	/u̯/	[p^{h}au̯]	শূকর

৮.৩.১.৩ দ্বিস্বরধ্বনি (Diphthong)

পাত্র ভাষায় নিম্নলিখিত দ্বিস্বরধ্বনির ব্যবহার রয়েছে–

ক্রম	দ্বিস্বরধ্বনি	লালেং ভাষার শব্দ আ. ধ্ব. ব. (IPA)	সমার্থক বাংলা শব্দ
১	/oi̯/	[oi̯ra] [soi̯ŋ] [ɑmfoi̯]	এভাবে আকাশ বেশি
২	/oa̯/	[oa̯k]	কাঁক
৩	/ua̯/	[ua̯], [ua̯sa]	এই , পাখি
৪	/ui̯/	[ui̯]	রক্ত
৫	/ue̯/	[ue̯]	যাই/ যাবো
৬	/ie̯/	[oie]	শোয়া
৭	/ia̯/	[k^{h}ia̯l solo]	চেষ্টা
৮	/au̯/	[gau̯ŋ]	গায়েব
৯	/ua̯/	[a:rua̯], [ua̯]	বোকামি, শ্বাস
১০	/ia̯/	[ia̯ŋ], [d̪ia̯ŋ], [d̪^{h}ia̯]	এসো, ঝগড়া, কি
১১	/ai̯/	[insai̯] [k^{h}amai̯]	খালি ডবধাব

৮.৩.১.৪ ত্রি–স্বর

পাত্র ভাষায় দ্বি–স্বরের পাশাপাশি ত্রি–স্বরও (Tripthong) লক্ষ করা যায়, যেমন– [ioi] [ci̯tolio̯il] চিতল মাছ।

৮.৩.১.৫ ব্যঞ্জনধ্বনি (Consonant)

পাত্র ভাষায় ২৪টি ব্যঞ্জনধ্বনি । এগুলো হলো– /k/, /kʰ/, /g/, /ŋ/, /c/, /cʰ/, /ɟ/, /t/, /tʰ/, /ʈ/, /ʈʰ/, /ɖ/, /n/, /p/, /pʰ/, /b/, /bʰ/, /m/, /r/, /l/, /ʃ/, /s/, /h/এবং /j/ বা (y)।

নিচের ছকের সাহায্যে পাত্র ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনিসমূহ এভাবে দেখানো যায়–

উচ্চারণ স্থান / উচ্চারণ রীতি	জিহ্বামূলীয়	দ্বি–ওষ্ঠ্য	দন্ত্য	দন্তমূলীয়	পশ্চাৎ দন্তমূলীয়	তালব্য	কণ্ঠনালীয়
স্পর্শ	k kʰ g	p pʰ b bʰ	ʈ ʈʰ ɖ	t tʰ		c cʰ ɟ	
নাসিক্য	ŋ	M		n			
কম্পনজাত				r			
ঘর্ষণজাত				S	ʃ		h
নৈকট্যমূলক						J (y)	
পার্শ্বিক নৈকট্যমূলক				L			

পাত্র ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনিসমূহ উদাহরণযোগে দেখানো হলো–

ক্রম	ব্যঞ্জনধ্বনি	লালেং ভাষার শব্দ আ. ধ্ব. ব. (IPA)	সমার্থক বাংলা শব্দ
১	/k/	[karafi], [kand̪ʰaka]	যুদ্ধ, পাশে
২	/kʰ/	[kʰæm], [kʰum]	ঘর, পিঠা
৩	/g/	[gɔrunda],[gauɲ]	গায়েব, ঘরমুখো
৪	/c/	[cepa], [caboŋ]	ফাঁদ, কাঁধ
৫	/cʰ/	[cʰikaŋ], [cʰikɔm]	পরনে, একমাত্র
৬	/ɟ/	[ɟæb][ɟap]	পকেট, পাকা
৭	/t/	[tɔla]	বন বিড়াল
৮	/tʰ/	[tʰor], [tʰikaŋ]	টক, মৃত্যু
৯	/t̪/	[t̪al], t̪alo	মাঠ, বলা
১০	/t̪ʰ/	[t̪ʰan], [t̪ʰɔr]	মাংস, টক
১১	/d̪/	[d̪iŋ], [d̪ɔk]	লম্বা ,মিষ্টি
১২	/d̪ʰ/	[d̪ʰia], [d̪ʰamakʰi]	কি, ধমক
১৩	/n/	[nɔklaŋ], [nunu]	গুড়, খালা
১৪	/p/	[paŋ], [pum]	কাতল মাছ, শরীর
১৫	/pʰ/	[pʰaru], [pʰula̯i]	আলু, মাটির পাতিল
১৬	/b/	[ba̯iguna], [bɔyar]	টমেটো, বাতাস
১৭	/bʰ/	[bʰuisal], [bʰaira]	ভূমিকম্প,ভেসে আসা
১৮	/m/	[mut̪ki], [mɔsa]	কিল/ঘুষি,পুটলি
১৯	/r/	[rani], [ra̯i]	সূর্য/ রোদ),বৃষ্টি
২০	/l/	[lakla], [lalsu]	বাঁশ, লোভী
২১	/ʃ/	[ʃalo],[ʃant̪il]	বেদনা, বালি
২২	/s/	[salo̯i], [soluŋ]	মেয়ে, স্নান
২৩	/h/	[hasɔŋ], [harani]	এখানে, সেদিন
২৪	/j/ (y)	[bojar], [yaŋlo]	বাতাস, সমৃদ্ধি

৮.৩.১.৬ ন্যূনতম শব্দজোড় (minimal pair)

পাত্র ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনিমূল ন্যূনতম শব্দজোড়ের সাহায্যে এভাবে দেখানো যায়–

- /k/ [koi̯] যে, কেউ
- /kʰ/ [kʰoi̯] কুকুর

- /c/ [cu] স্তন
- /c^h/ [c^{h}u] নাতিন
- /ɟ/ [ɟɔŋt̪u] তেলচর্বি
- /ɟ^h/ [ɟ^{h}ɔŋt̪u] মশলা
- /t/ [tui̪] ডিম
- /t^h/ [t^{h}ui̪] খাটো
- /t̪/ [t̪ai] বড়বোন, [t̪aia] ঠাণ্ডা
- /t̪^{h}/ [t^{h}ai] মোটা [t^{h}aia] তাড়াতাড়ি
- /d̪/ [d̪ora] আত্মীয়
- /d̪^{h}/ [d̪^{h}ora] ধরা
- /p/ [pik] পানের পিক
- /p^h/ [p^{h}ik] অপুষ্ট ধান
- /b/ [bɔmpa] জায়গা
- /b^h/ [b^{h}ɔmpa] এ স্থান

৮.৩.১.৭ নাসিক্য ব্যঞ্জন (Nasal Consonents)

পাত্র ভাষায় নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যবহার রয়েছে। এ উপভাষায় ঙ /ŋ/, ন [n] এবং ম [m] ধ্বনির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। শব্দের মাঝখানে ও শেষে ঙ /ŋ/ ধ্বনির ব্যবহার রয়েছে পাত্র ভাষায়। উদাহরণ, শব্দের মাঝখানেঃ [neŋra] বুক, [iŋa] আগে, [laŋaṭ] খারাপ প্রভৃতি।

শব্দের শেষেঃ [ṭakaŋ] কপাল, [puŋ] শরীর, [inṭaŋ] শক্ত ম

[m] ও ন [n] ধ্বনির ব্যবহার– [maga] (ভিক্ষা), [mæŋ] বিড়াল, [mut̪ki] (কিল/ ঘুষি), [nak^{h}an] (নাক), [nap] (নাকের শ্লেষ্মা), [nah] (কান), [nizuŋ] (আপন/ নিজ), [sani] দাঁত, [ʃoin] নীল প্রভৃতি।

৮.৩.১.৮ যুগ্মীভবন

সমজাতীয় দুটি ব্যঞ্জন একত্রে উচ্চারিত হলে সেসব ধ্বনিকে বলা হয় যুগ্মধ্বনি। যুগ্মধ্বনি উচ্চারণের প্রক্রিয়াকে বলা হয় যুগ্মীভবন। পাত্র ভাষায় পাশাপাশি সমজাতীয় দুটি ব্যঞ্জন উচ্চারিত হলে তা আর

যুগ্মীভবন থাকে না, ব্যঞ্জন দুটি পৃথকরূপে উচ্চারিত হয়। দৃষ্টান্ত হলো– [gunna] কনুই, [ʈikka] কপালের টিপ, [perekkoi] ননদ, [ʈilla] পাহাড়, [maʈʈu] জাম্বুরা প্রভৃতি।

৮.৩.১.৯ অক্ষর (Syllable)

পাত্র ভাষার উপাত্ত যাচাই ও বিশ্লেষণ করে অক্ষরের প্রকারভেদ ও এর সংগঠন দেখানো হয়েছে।

ক) অক্ষরের প্রকার (Classification of Syllable)

পাত্র ভাষায় চার ধরনের অক্ষরের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এই ভাষায় একাক্ষরিক (Monosyllabic), দ্বি-আক্ষরিক (Disyllabic), ত্রি-আক্ষরিক (Trisyllabic) এবং চারাক্ষরিক অক্ষরের ব্যবহার আছে–

ক্রম	অক্ষরের ইাম	পাত্র ভাষার শব্দ আ. ধ্ব. ব. (IPA)	সমার্থক বাংলা শব্দ
১	একাক্ষরিক	[ʃɔk^{h}]	আন
২	দ্বি-আক্ষরিক	[iŋ.k^{h}ɔl]	ডপঁড়ি
৩	ত্রি-আক্ষরিক	[c^{h}aoa.ʈa.lo]	গিয়েছিল
৪	চারাক্ষরিক	[pɔ.kɔi.ʃur.lo]	ভাতের ক্ষুধা

খ) অক্ষর সংগঠন

পাত্র ভাষার অক্ষর সংগঠন নিম্নলিখিত উপায়ে দেখানো যায়–

অক্ষর সংগঠন	IPA	অর্থ
vc	[ɛr]	লাল
vc	[ik]	কালো
cvv	[p^{h}au]	শূকর
Cvcvc	[ɟasel]	ঘোড়া
cvv	[k^{h}oi̯]	কুকুর
vv	[oa]	মোরগ
vccvc	[iŋ.k^{h}ɔl]	ডপঁড়ি
cvcvc	[cinɔŋ]	গরু
cvcvc	[ɟofur]	পুকুর
cvc	[k^{h}æm]	ঘর
cvcvc	[sinɔŋ]	গরু
vvcv	[oasa]	পাখি
cvcvcvvvc	[ciʈolioi̯l]	চিতল মাছ
cvcvv	[goroi̯]	টাকি মাছ
cvcvc	[kumɔk]	চিংড়ি মাছ
cvcvc	[p^{h}aloŋ/ p^{h}alaŋ]	ছন
cvcvv	[cabai]	ছাগল
cvc	[mæŋ]	বিড়াল

৮.৩.১.১০ ধ্বনির উচ্চারণগত দিক

পাত্র ভাষায় কয়েকটি ধ্বনির বিশেষ উচ্চারণ নিম্নোক্তরূপে দেখানো যায়-

ক) /শ/ ধ্বনির উচ্চারণ

পাত্র ভাষায় /শ/ ধ্বনির ব্যবহার রয়েছে, যেমন-[ʃaʃuduai] নিঃসন্তান, [ʃokuŋ map] ধানের মাপ, [ʃiʃanani] এলোমেলো, [ʃaiʃailo] জর জ্বরভাব, [ʃibora] অগোচরে, [ʃikoi] জবাব প্রভৃতি।

খ) /স/ ধনির উচ্চারণ

/স/ ধ্বনির বিশেষ উচ্চারণ– [sinɔŋ] গরু, [oasa]পাখি, [salo] বেদনা, [santil] বালি, [siŋkaŋ] বমি, [sikua] [sasu] বাচ্চা, [seya] চেহারা প্রভৃতি।

গ) ন ধ্বনির উচ্চারণ

পাত্র ভাষায় /n/ /ন/ ধ্বনিটি বেশি ব্যবহৃত হয়, যেমন– আপনি, তুমি, তুই অর্থে অনেক সময় /নাং/ এর ব্যবহার– /naŋ ʃori/ তুমি যাও, /naŋ ʃori/ তুই যা, /naŋ ʃori/ আপনি যান। বাংলা ভাষার মতো সম্মানসূচক সর্বনামের ব্যবহার পাত্র ভাষায় নেই। ইংরেজিতে যেমন আপনি, তুমি, তুই অর্থে কেবল you ব্যবহৃত হয়, তেমনি পাত্র ভাষায় আপনি, তুমি, তুই অর্থে শুধু /naŋ/ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ঘ) ঙ ধ্বনির উচ্চারণ

ঙ ধ্বনির উচ্চারণ– [iʃk^{h}ɔŋ] জন্ম, [baŋ] মানুষ, [baŋloy] অমানুষ, [caŋ] কাঁধ, [ɖɔŋ] ইয়ার্কি, [gaung] গায়েব [haʃɔŋ] সত্যি,[intaŋ] শক্ত, [ɟɔŋtu] মশলা,[laŋaʈ] ময়লা, [niɟuŋ] নিজের প্রভৃতি।

ঙ) ত ও ট ধ্বনির উচ্চারণ

ত ধ্বনির উচ্চারণ: পাত্র ভাষায় ত ধ্বনির উচ্চারণ বেশি, যেমন- [ʈal] মাঠ, [ʈai] বড়বোন [ʈakaŋ] বলেছেন, [ʈui] ডিম, [ʈamba] তামা প্রভৃতি।

ট ধ্বনির উচ্চারণ: [tamon] শুঁটকি, [taye] বলবো, [tekor] আঙ্গুল দ্বারা আঘাত প্রভৃতি।

৮.৩.২ রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

রূপতত্ত্ব যেকোনো ভাষার ব্যাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ভাষার শব্দ গঠন সম্পর্কিত আলোচনাই রূপতত্ত্বের প্রধান দিক। পাত্র ভাষার রূপতাত্ত্বিক আলোচনায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৮.৩.২.১ রূপমূল বিশ্লেষণ

যে কোনো ভাষার রূপমূল গুরুত্বপূর্ণ ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। পাত্র ভাষাও এর ব্যতিক্রম নয়। পাত্র ভাষার রূপমূল নিম্নোক্তরূপে আলোচনা করা হয়েছে।

৮.৩.২.১.১ মুক্তরূপমূল ও বদ্ধরূপমূল

যে রূপমূলের নিজস্ব অর্থ আছে এবং ভাষায় স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে সেসব রূপমূলকে বলা হয় মুক্তরূপমূল। পাত্র ভাষায় ব্যবহৃত মুক্তরূপমূলের দৃষ্টান্ত হলো– [inam] (জঙ্গল), [ʈ^{h}o̯i] (পুকুর), [gaŋ] (নদী), [ræk] (ঝাড়ু), [p^{h}ara] (কুলা), [c^{h}ani] (দাঁত), [ɖaie] (জিহ্বা), [ink^{h}irim] (সূঁচ), [logor] (বন্ধন), [k^{h}eru](কচু), [an] (ভাত) [ʈo̯i] (পানি) প্রভৃতি।

৮.৩.২.২ বদ্ধরূপমূল

যে সব রূপমূল মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অর্থ প্রকাশ করে সেসব রূপমূলকে বলা হয়। পাত্র ভাষার বদ্ধরূপমূল হলো -

/ka/, /i/,/oi/,/iʈ/,/aŋ/,/ilo/, /unra/, /ʈum/, /ʈem/, /liŋ/, /luŋ/, /nɔ/, /ra/, /kuŋ/ ইত্যাদি বেশি ব্যবহৃত হয়। এসব বদ্ধরূপমূলের শব্দে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত হলো– [inam] (জঙ্গল) → [inami] (জঙ্গলসমূহ), [inar (হাতি) → [inaroi] (হাতিগুলি), [wasa] (পাখি) → → [wasaʈum] (পাখিগুলো) প্রভৃতি।

৮.৩.২.৩ যৌগিক রূপমূল

দুটি মুক্তরূপমূলের সাহায্যে গঠিত রূপমূলকে বলা হয় যৌগিক রূপমূল। পাত্রভাষায় ব্যবহৃত মিশ্ররূপমূলের ব্যবহার নিম্নরূপ– [baŋc^{h}ik] (অপরিচিত মানুষ), [baŋperekka] (কিশোর), [ʈalac^{h}urani] (তালাচাবি), [wasa um] (পাখির বাসা), [c^{h}anai] পয়সাকড়ি, [phukuiʈuŋk^{h}um] (চিতই পিঠা), [mek^{h}nʈo̯i] (চোখের পানি), [k^{h}æm ɖik^{h}am] (ঘরসংসার), [nahanʈæm] (নাকের

দুল), [agliraḍiŋ] (আগলে রাখা), [næŋkaiaŋlo] (মনে পড়া), [tʰira ukaŋ] মারা যাওয়া, [naŋ moil] নাকের ময়লা, [nɔṭo iʃo] (নত করা), [nuŋka ḍɔra] (পিছনের দরজা) ইত্যাদি।

৮.৩.২.৪ জটিল রূপমূল

দুইয়ের অধিক মুক্তরূপমূলের সাহায্যে গঠিত রূপমূলকে বলা হয় জটিল রূপমূল। পাত্র ভাষায় ব্যবহৃত জটিল রূপমূলের উদাহরণ– [miratʰuŋe] (স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটানো), [tʰiraukaŋ] (মারা যাওয়া) [ḍɔraŋ kʰemcʰacʰu] (বৈঠকখানা)।

৮.৩.২.৫ সম্প্রসারিত রূপমূল

মুক্তরূপমূলের সঙ্গে বদ্ধরূপমূল যুক্ত হয়ে যদি শব্দের পদগত শ্রেণি পরিবর্তন না হয়ে শব্দের সম্প্রসারণ ঘটায় তবে তাকে বলা হয় সম্প্রসারিত রূপমূল; যেমন–বই–বইগুলো, ছেলে–ছেলেরা, বাড়ি–বাড়িসমূহ ইত্যাদি। পাত্রভাষায় ব্যবহৃত সম্প্রসারিত রূপমূলের উদাহরণ হলো– [ɟoan+ṭon](যুবকদের), [acʰwa+ṭum] (ছেলেদের), [kʰem+paṭum] (ঘরগুলো), [cʰinɔŋ+oaṭum] (গরুগুলো), [pinnca+ṭum] (পুরুষেরা) প্রভৃতি।

৮.৩.২.৬ শব্দগঠন প্রক্রিয়া

পাত্র ভাষায় প্রত্যয় সংযুক্তি, সম্প্রসারণ, সাধিতকরণ, অবস্থান পরিবর্তন, শব্দদ্বৈত, যৌগিকীকরণ, সমাস ইত্যাদি মাধ্যমে শব্দ গঠিত হয়ে থাকে। নিচে পাত্র ভাষার শব্দগঠন প্রক্রিয়া (word formation process) সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

৮.৩.২.৭ প্রত্যয় সংযুক্তি (Affixation)

প্রত্যয়ের সাহায্যে শব্দ গঠন পাত্র ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য। উদাহরণস্বরূপ–

- lo = hɛran (ব্যস্ত) + lo (তা) = [hɛranlo] (ব্যস্ততা)
- uŋ = am (হাঁস) + uŋ (এর) = [amuŋ] (হাঁসের)
- a = ṭʰak (উপর) + a (এ) = [ṭʰaka] (উপরে)
- ṭum = baŋ (মানুষ) + ṭum (এরা) = [baŋaṭum] (মানুষেরা)
- oi = cʰaua (ছেলে) + oi (রা) = [cʰauaoi] (ছেলেরা)

৮.৩.২.৮ পুনরাবৃত্তি (reduplication)

পাত্র ভাষায় পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে শব্দগঠনের প্রকৃতি নিম্নরূপ-

ক) প্রথম শব্দের আংশিক পুনরাবৃত্তি বা আংশিক পরিবর্তনের মাধ্যমে, যেমন– [kʰeʃakʰeʃi] (ভীড়), [caracore] (খেয়েছি), (ভাগ্যহীনা), [ʈalʈul] (জমিজমা), [tʰaitʰui] (মোটাসোটা), [tʰaira tʰuira] (জোরেশোরে),[pʰoypʰɔsol] (ফলমূল) [pakai pakaira] (ঘুরেঘুরে), [ali ra ɖulir] (হেলেদুলে), [pʰaraira pʰuraira] (ভয়ে ভয়ে), [tʰelaira tʰukaira] (ঘুষি মেরে),

খ) একই শব্দ দুইবার ব্যবহারের মাধ্যমে: একই শব্দ বা রূপমূল দুবার ব্যবহৃত হয়ে অর্থের সম্প্রসারণ ঘটালে তাকে বলা হয় দ্বিরুক্ত শব্দ বা শব্দদ্বিত্ব। পাত্র ভাষায় এ জাতীয় শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়– [beɟan beɟan] (বারে বারে), [ompʰoi ompʰoi] (বেশি বেশি), [ɖamuŋ ɖumuŋ] (হাঁটাহাঁটি), [cik cik] (শব্দ করা) ইত্যাদি।

৮.৩.২.৯ যৌগিকীকরণের মাধ্যমে গঠিত শব্দ

পাত্র ভাষার শব্দ গঠনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য যৌগিকীকরণ (Compunding)। একাধিক মুক্ত রূপমূল এক সঙ্গে কিংবা আলাদা বসে যৌগিক শব্দ গঠন করে, যেমন–

- [nila] (বিকাল) + [aɖul] (বেলা)= [nilaaɖul] বিকাল বেলা
- [nab] (আগামী) + [ɖik] (পরশু)= [nabɖik] আগামী পরশু
- [fayan] (মধ্য) + [iʃa] (রাত)= [fayaniʃa] মধ্যরাত
- [ɟagiɖa] (জাগ্রত) + [haŋ] (হওয়া)= [ɟagiɖahaŋ] জাগ্রত হওয়া
- [mekuŋ] (চোখের) + [ʈi] (পানি)= [mekuŋ ʈi] চোখের পানি
- [kʰeruŋ] (কচু) + [mour] (গাছ)= [kʰeruŋ mour] কচুগাছ
- [uaŋ] (এক পশলা) + [rai] (বৃষ্টি)= [uaŋrai] এক পশলা বৃষ্টি
- [boin] (ভূমি) + [cal] (কম্প)= [boincal] ভূমিকম্প
- [rain] (মেঘ) + [ʃaɟ] (বৃত্ত)= [rainʃaɟ] মেঘাবৃত্ত
- [ɟunakuŋ] (চাঁদের) + [ʈur] (আলো)= [ɟunakuŋʈur] চাঁদেরআলো
- [baiɟ] (বাজ) + [bori] (পাখি)= [baiɟbori] বাজপাখি
- [ikca] (কলা) + [bai] (গাছ)= [ikcabai] কলা গাছ
- [pinca] (পুরুষ) + [meŋ] (বিড়াল)= [pincameŋ] পুরুষ বিড়াল

- [kʰaluŋ] (গলার) + [mala] (মালা)= [kʰaluŋmala] গলার মালা
- [kʰapʰka] (উচ্চ) + [kamkaŋ] (রক্তচাপ)= [kʰapʰka kamkaŋ] উচ্চ রক্তচাপ
- [pʰubi] (মাথা) + [solo] (ব্যথা)= [pʰubisolo] মাথাব্যথা
- [kʰiŋ] (পায়) + [kʰem] (খানা)= [kʰiŋkʰem]পায়খানা
- [koy] (সুপারি) + [rɔŋ] (গাছ)= [koyrɔŋ]সুপারি গাছ
- [maya] (ভালো) + [salo] (বাস)= [mayasalo] ভালোবাসা
- [mili] (জনেগণের) + [kaŋ] (ভীড়)= [milikaŋ] জনগণের ভীড়
- [mekʰiŋ] (চোখের) + [t̪oi] (পানি)= [mekʰiŋ t̪oi]চোখের পানি
- [lala] (নারী) + [iṯa] (সুলভ)= [lalaiṯa] নারীসুলভ
- [ʃɔrmuŋ] (লজ্জাজনক) + [maṯ] (অবস্থা)= [ʃɔrmuŋmaṯ] লজ্জাজনক অবস্থা
- [cʰaŋkʰɔ] (সিদ্ধ) + [lalo] (চাল)= [cʰaŋkʰɔlalo] সিদ্ধচাল
- [pʰallimukʰi] (চৌ) + [d̪ampoi](রাস্তা)= [pʰallimukʰi d̪ampoi]চৌরাস্তা

৮.৩.২.১০ দিন বাচক শব্দ

পাত্র ভাষায় দিন বাচক শব্দের স্বতন্ত্র ব্যবহার রয়েছে, যেমন– [mani] (আজ), [manap] (আগামীকাল), [miṯ̪tu] (গতকাল), [nabd̪ik] পরশু, [miṯ̪u] আগামী পরশু ইত্যাদি।

৮.৩.২.১১ সংখ্যা গণনা

পাত্র ভাষার অন্যতম স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো সংখ্যা বাচক শব্দের (Counting numbers) ব্যবহার। উল্লেখ্য যে, এক থেকে একশো পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দের মধ্যে পাত্র ভাষায় নিম্নলিখিত সংখ্যাসমূহ পাত্র ভাষার স্বতন্ত্র শব্দ– [cʰik] (এক), [kʰani] (দুই), [tʰɔm] (তিন), [pʰalli] (চার), [pʰaŋa] (পাঁচ), [pʰaŋakʰani] (দশ), [pʰaŋaiŋkʰum] (পনের), [iŋnɔkʰɔlcik] (বিশ), [pʰaŋaŋinkʰancik] (পঁচিশ), [iŋkʰɔmɔʰpʰalli] (ষাট), [iŋkʰɔlɔgaŋ̪ta] (একশো)। বাকি শব্দসমূহ পাত্ররা বাংলা ভাষার শব্দ ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া পাত্ররা লক্ষকে, লাখা [lakʰa] ব্যবহার করলেও হাজার, কোটি বাংলা ভাষার শব্দ ব্যবহার করে থাকে।

৮.৩.২.১২ বচন (Number)

পাত্র ভাষায় বচন দুই প্রকার– একবচন ও বহুবচন। উদাহরণ–

একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
[alaŋ] (তার)	[alaliŋ] তাদের	[ain] (আমার)	[aliŋ] আমাদের
[wasa] (পাখি)	[wasat̪um]	[k^hæm] (ঘর)	[k^hæmpat̪um] ঘরগুলো
[d̪iŋ] (লম্বা)	[d^hiŋ d^hiŋ]	[naŋ] (তোমার)	[nalinŋ] তোমাদের
[niɟ] নিজের	[niɟt̪um]	[pinca] (পুরুষ)	[pincat̪um] পুরুষগুলো
[baŋ] (মানুষ)	[baŋat̪um]	[mour] (ফুল)	[mouratum̪] ফুলগুলো
[rai] (বৃষ্টি)	[raye/raiat̪um]	[laklat̪um] (বাঁশ)	[laklat̪um] বাঁশগুলো
[lala] (মেয়ে)	[lalat̪um]	[hai] (আমি)	[aliŋ] আমাদের

৮.৩.২.১৩ লিঙ্গ

পাত্র ভাষায় লিঙ্গ প্রধানত দুই প্রকার– ক) পুংলিঙ্গ ও খ) স্ত্রীলিঙ্গ। পাত্র ভাষায় পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের কিছু নিয়ম দেয়া হলো-

নিয়ম–১: পুরুষবাচক শব্দের শেষে কোনো রকম প্রত্যয় যোগ না করে পৃথক শব্দ ব্যবহার করে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা হয়ে থাকে; যেমন–[pa (বাবা)]–[iyo (মা)], [kɔt̪t̪ai (কর্তা)]– [inɟɔr (গিন্নি)], [c^haua] (ছেলে)– [c^hauaoi] (ছেলেরা) প্রভৃতি।

নিয়ম–২: পুরুষবাচক শব্দের শেষে ই প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ গঠন করা হয়; যেমন–[mosabir] যুবক – [mosabiri] যুবতী, অনুরূপ-[sali] শ্যালিকা, [daburi] দাদি প্রভৃতি।

নিয়ম–৩: পুরুষবাচক শব্দের শেষে ওই প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে; যেমন–[inar] [inaroi], [t̪akai] [t̪akaoi],[pɔd̪d̪an̪] [pɔd̪d̪anoi], [baŋc^haua] [baŋc^huaoi]

৮.৩.৩ বাক্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ভাষাতত্ত্বের চারটি মৌলিক উপাদানের মধ্যে বাক্যতত্ত্ব অন্যতম। মোরশেদ (২০১২) এ প্রসঙ্গে বলেছেন– ‘বাক্যতত্ত্ব বা অন্বয় (Syntax) কথাটি ব্যাকরণে বাক্যনির্মাণ প্রক্রিয়ার পরিভাষা। বাক্যে ভাষার ক্ষুদ্রতর উপাদানগুলি কীভাবে পাশাপাশি সজ্জিত হয়, অন্বয় মূলত তারই নিয়মের সমষ্টি’ (মোরশেদ, ২০১২ : ৩৩৩)। বাক্যের সাহায্যেই মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে, তাই বাক্যতত্ত্বের মূল আলোচ্য বিষয় বাক্য ও তার বিন্যাসরীতি। পাত্র ভাষার বাক্য বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত নিয়মবালির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

৮.৩.৩.১ বাক্যের পদক্রম

পাত্র ভাষার বাক্যগঠন প্রক্রিয়া বাংলা ভাষার অনুরূপ। সাধরণত কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া (S+O+V) রীতিতে বাক্য গঠিত হয়, যেমন– [hai ulo k^{h}emka] আমি বাড়ি যাই, [alaŋ ʈalk^{h}a ʈumlo] সে মাঠে কাজ করে। পাত্র ভাষার ক্রিয়া সাধারণত বাক্যর শেষে বসে। তবে এ রীতি সব সময় মেনে চলা হয় না। বাক্যের এ পদবিন্যাস অনেক ক্ষেত্রেই পরিবর্তন হয়। সরল, জটিল, যৌগিক বাক্যের গঠনরূপ ভিন্নতর হয়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত, পাত্র ভাষার বাক্যে নির্দেশক ব্যবহারের স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। এ ভাষায় বাক্যে নির্দেশক ব্যবহারের ক্রমটি হলো – DP+ D + VP, NP + D+VP → (এখানে DP = Determiner Phrase, D = determiner, NP = Noun Phrase, Vp = Verb Phrase)। উদাহরণস্বরূপ–

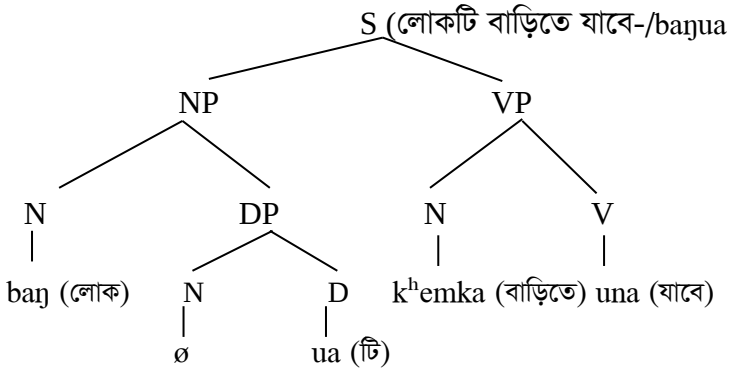

৮.৩.৩.২ পাত্র ভাষার বাক্যের প্রকারভেদ

গঠনগত দিক থেকে পাত্র ভাষার বাক্য সরল, জটিল ও যৌগিক এই তিন প্রকার। নিচে পাত্র ভাষার বিভিন্ন প্রকার বাক্য এবং এর বৃক্ষচিত্র (Tree Diagram) উপস্থাপন করা হলো–

ক) সরল বাক্য

পাত্র ভাষার সরল বাক্য এবং এর কয়েকটি বৃক্ষচিত্র উপস্থাপন করা হলো–

পাত্র ভাষার বাক্য	**IPA**	**অর্থ**
আইন মিগোই ইয়াংলো	[ain migoi iyaŋlo]	আমার ঘুম পেয়েছে।
তালুং খুম তাংদক	[ʈaluŋ k^{h}um ʈaŋdɔk]	তালের পিঠা খেতে মিঠা।
চেং মাইরা থপলো দুখলা	[ceŋ maira t^{h}ɔplo duk^{h}la]	ঢোল ভাল বাজায় ঢুলি।
মিথাসাত ছুমখেতে পাপিছলো	[mit^{h}asaʈ c^{h}umk^{h}eʈe papic^{h}ɔlo]	মিথ্যা বলা মহাপাপ।
আইলেং বাংতুং শুজা শরল	[aileŋ baŋʈuŋ ʃuja ʃɔrol]	পাত্ররা সহজ সরল মানুষ।
শখ মেনকাং তালে তালে	[ʃɔk^{h} menkaŋ ʈale ʈale]	মাঠে মাঠে ধান

পেকেছে।

মৌর ফুটিকাং বাগানকা [mour pʰutikaŋ baganka] বাগানে ফুল ফুটেছে।

[hai an calo] আমি ভাত খাই

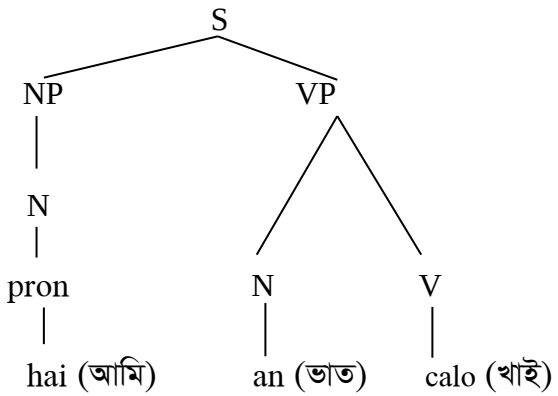

খ) পাত্র ভাষার জটিল বাক্য

এ ভাষার জটিল বাক্যর উদাহরণ হলো–

ক. /ɟoḍi naŋ maira ṭum kʰuḍoy my iʃona/ যদি তুমি পরিশ্রম করো তবে সফল হবে।

খ. /ɟoḍi baŋsaua maira muira poralekʰa cʰɔ alaŋ porikkʰaka my iʃona/ যদি ছেলেটি ভালোভাবে পড়ালেখা করে তবে সে পরীক্ষায় পাস করবে।

গ. /ɟoḍi naŋ maira ṭum baŋ naŋle mykʰuna/ যদি তুমি ভাল কাজ করো তবে মানুষ তোমাকে সম্মান দেখাবে।

ঘ. /selim ɟoḍi kʰemka u kʰuḍoy alaŋ, alaŋ kɔṭṭaile kʰemka kʰɔloŋna/ সেলিম যদি আজ বাড়ি যায় তবে সে তার ভাইকে বাড়িতে পাবে।

গ) পাত্র ভাষার যৌগিক বাক্য

ক. /hai porilɔŋne tumlone/ আমি পড়ালেখা করি এবং চাকুরি করি।

খ./aŋua mani ba manap kʰemka una/ লোকটি আজ অথবা আগামীকাল বাড়ি যাবে।

গ. /alaŋ gorbne nirɔcʰne/ সে গরিব কিন্তু সৎ।

ঘ. /næŋ pira pɔralekʰa cʰoḍoi naile pʰelʃona/ মন দিয়ে পড়ালেখা করো নতুবা ফেল করবে।

৮.৩.৩.৩ অর্থগত দিক থেকে বাক্যের শ্রেণিবিন্যাস

অর্থগত দিক থেকে পাত্র ভাষার বাক্য কয়েক ধরনের, যেমন–

ক) বিবৃতিমূলক বাক্য

এ ধরনের বাক্যের সাহায্যে কোনো কিছু বর্ণনা বা বিবৃত করা হয়; যেমন–

পাত্র ভাষার বাক্য	**IPA**	**অর্থ**
হাই আলকা উলো	/hai alka ulo/	আমি হাল চাষে যাচ্ছি।
হাই বাজারকা উলো	/hai baɟarka ulo/	আমি বাজারে যাব।
হাই আন ছাইয়ে	/hai an c^{h}aiẹ/	আমি ভাত খাব।

বিবৃতিমূলক বাক্য আবার ইতিবাচক ও নেতিবাচক এ দুইভাগে বিভক্ত।

i) ইতিবাচক বাক্য

পাত্র ভাষার বাক্য	**IPA**	**অর্থ**
আলিং বেশি জায়গা ইনাম জঙ্গল।	[aliŋ beʃi ɟayga inam ɟɔŋgol]	আমাদের অধিকাংশ জমি পাহাড়ী এলাকায়।
আলং বেশি তালং জমি দাখাং	[alɔŋ beʃi ṭalɔŋ ɟomi ḍak^{h}aŋ]	আমাদের অধিকাংশেরই জমিজমা আছে।
আলিং থারকোং পড়ালেখা ছড়া পিং লাগি না	[aliŋ t^{h}arkoŋ paɽalek^{h}a c^{h}ɔɽa piŋ lagi na]	আমাদের ভাষায় পড়ালেখার সুযোগ করে দিতে হবে।

ইতিবাচক বাক্য বিশ্লেষণ

[ain migoi̯ iaŋlo] আমার ঘুম পেয়েছে

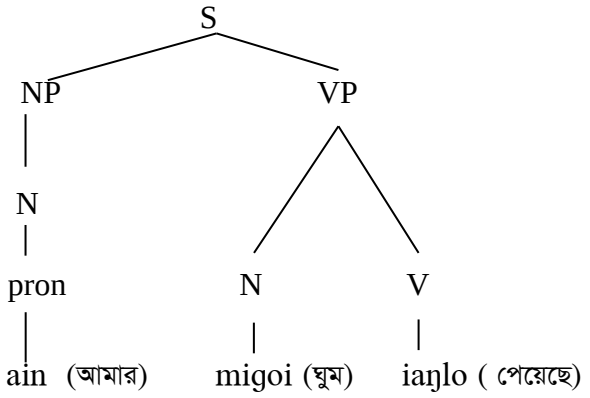

ii) নেতিবাচক বাক্য

পাত্র ভাষার বাক্য	IPA	**অর্থ**
আইন শরীল মাইলই।	[ain ʃoril mailoi]	আমার শরীর ভাল নয়।
মানি আইন মন মাইলই।	[mani ain mɔn mailoi]	আজ আমার মন ভাল নেই।
বাং বিয়াখা কোন কুনতাপিং দরকার নাই।	[baŋ biakʰa kon kun̪tapiŋ d̪ɔrkar nai]	পাত্র বিয়েতে যৌতুকের প্রচলন নেই।
বাংগামোর ছরা বিয়া ছইলো।	[baŋgamor cʰɔra bia cʰoilo]	জোর করে বিয়ের প্রচলন পাত্র সমাজে নেই।
লালং ছিনং থান চাইলো।	[lalɔŋ cʰinɔŋ tʰan cailo]	পাত্ররা গরুর মাংস খায় না।
হাই স্কুলকা পড়ে আয়গো।	[hai skulka pɔɽe ae̯go]	আমি লেখাপড়া করি না।
আলিং পারুং জাগাখা কোন কিছু লাগাইইয়াইলো	[aliŋ paruŋ ɟagakʰa kono kicʰu lagaiːailo]	পাহাড়ের জমিতে সাধারণত চাষবাস করা হয় না।
আলিং পড়ালেখাং সুযোগ সুবিধা কলং আইলো	[aliŋ pɔɽalekʰaŋ suɟog subid̪ʰa ailo]	আমাদের শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ নেই।
হগতিকে হালিং শিক্ষা বঞ্চিত	[hɔg t̪ike haliŋ ʃikkʰa bonci̪to]	তাই আমরা শিক্ষা হতে বঞ্চিত।
আলিং কোন থাই স্কুল দোয়াই	[aliŋ kon tʰai skul d̪oai]	আমাদের পর্যাপ্ত স্কুল নেই।
বাংবিয়াখা কোন কুনতাপিং দরকার নাই।	[baŋbiakʰa kon kun̪tapiŋ d̪ɔrkar nai]	পাত্র বিয়েতে যৌতুক দরকার নেই।
বিয়াং আন মাই ইসয়ং।	[biaŋ an mai̯ isɔŋ]	বিয়ের খাবার ভাল হয়নি।

না-বোধক বাক্যের বৃক্ষচিত্র

[lalɔŋ cʰinɔŋ tʰan cailo] পাত্ররা গরুর মাংস খায় না।

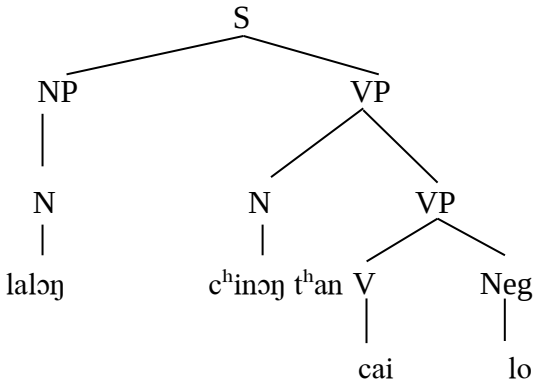

৮.৩.৩.৪ প্রশ্নবোধক বাক্য

এ ধরনের বাক্যের সাহায্যে কোনো কিছু প্রশ্ন বা জিজ্ঞেস করা হয়; যেমন–

পাত্র ভাষার বাক্য	IPA	**অর্থ**
নাং রামেন দি?	[naŋ ramen d̪i]	আপনার নাম কী?
নাং পাং রামেন দি?	[naŋ paŋ ramen d̪i]	আপনার বাবার নাম কী?
নাং আন সাকাং	[naŋ an sakaŋ]	তুমি কি ভাত খেয়েছ?
নাং মাই দাখাং?	[naŋ mai d̪akʰaŋ]	তুমি কেমন আছ?

প্রশ্নবোধক বাক্য বিশ্লেষণ

তুমি কেমন আছ? [naŋ mai d̪akʰaŋ]

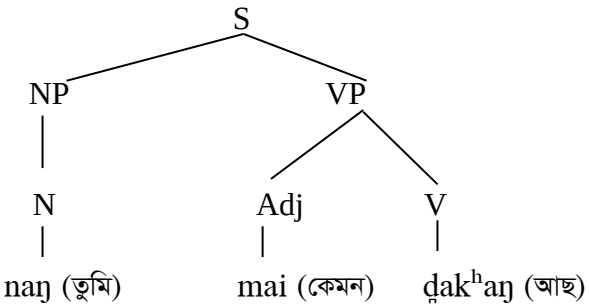

৮.৩.৩.৫ পদ–প্রকরণ

বাক্যের অন্তর্গত বিভক্তিযুক্ত শব্দ মাত্রই পদ (Parts of Speech)। পাত্র ভাষায় নিম্নোক্ত পাঁচ প্রকার পদের ব্যবহার লক্ষ করা যায়–

ক) বিশেষ্য: [cʰaloi] মেয়ে, [tʰali] কুল, [ʃantil], বালি, [tʰaŋlai] মাটি ইত্যাদি।

খ) বিশেষণ: [intaŋ] শক্ত,[auoa] বোকা, [momd̪uai] অমনোযোগী , [laŋat̪] মন্দ, [ʃɔraia]সব ইত্যাদি।

গ) সর্বনাম: [hai] আমি, [haliŋ] আমরা, [naŋ] তুমি, [naliŋ] তোমরা, [hu:a]সে, [hot̪um] তারা, [di] কি ইত্যাদি।

পাত্র ভাষায় সর্বনামের (Pronoun) সাথে বচন, কারক এবং পুরুষ চিহ্নায়ক যুক্ত হতে থাকে। আবার এই চিহ্নায়কসমূহ বাক্যের অন্য উপাদানের সাথে যুক্ত হতে পারে। তবে বাক্যের ক্রিয়ার ধরনের উপর নির্ভর করে চিহ্নায়ক কোন উপাদানের সাথে যুক্ত হবে। সকর্মক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে বাক্যস্থিত কর্মের সাথে চিহ্নায়কটি যুক্ত হয়। অকর্মক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে তা ক্রিয়ার পূর্বে অবস্থান করে। পাত্র ভাষায় ব্যবহৃত সর্বনামকে নিম্নোক্ত ভাগে দেখানো যায়-

1. *ব্যক্তিবাচক সর্বনাম*: পাত্র ভাষায় ব্যক্তিবাচক সর্বনাম (Personal Pronoun) অংশে উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ এবং নাম পুরুষ এই তিন ধরনের পুরুষের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। কর্তা অবস্থানে ব্যবহৃত ব্যক্তিবাচক সর্বনামসমূহের উদাহরণ নিচে উপস্থাপন করা হল–

পুরুষ	একবচন		বহুবচন		
	IPA	বাংলা অর্থ		IPA	বাংলা অর্থ
উত্তম	[hai]	আমি		[haliŋ]	আমরা
মধ্যম	[naŋ]	তুমি		[naliŋ]	তোমরা
নাম	[hu:a]	সে		[hot̪um]	তারা

কর্তা এবং কর্মসঙ্গতি (subject-object- agreement) পাত্রভাষার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হওয়ায় ব্যক্তিবাচক সর্বনামসমূহের কর্মস্থানীয় রূপ কেমন হবে তা কর্তার ওপর নির্ভর করে। কাজেই বাক্যে কর্তার বচন এবং পুরুষের ধরনের ওপর নির্ভর করে ব্যক্তিবাচক সর্বনামের কর্মস্থানীয় রূপ কেমন হবে। এখানে কারক এবং বচন আলোচনায় এই বিষয়ের ব্যাখ্যা উদাহরণসহ উপস্থাপন করা হয়েছে।

2. *আত্মবাচক সর্বনাম*: পাত্র ভাষার প্রশ্নবাচক সর্বনাম (introgative pronoun), নির্দেশক সর্বনাম (demonstrative pronoun) এবং কিছু অনিশ্চয়তাবাচক বা অনির্দিষ্ট সর্বনাম (Indefinite

pronoun)এর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। নিম্নে ছকের মাধ্যমে উল্লিখিত সর্বনামসমূহ উপস্থাপন করা হল–

সর্বনামসমূহ	IPA	বাংলা অর্থ
প্রশ্নবাচক সর্বনাম	[k^{h}o]	কে
	[d̪i]	কি
	[tɔŋua]	কোন
	[k^{h}ɔŋ]	কার
নির্দেশক সর্বনাম	[ua]	এই
	[haua]	ঐ
অনিশ্চয়তাবাচক বা অনির্দিষ্ট সর্বনাম	unt̪u/ ɔŋɔy	কিছু
	[ɟeuaŋ]	যে কেউ
	[k^{h}oiloi]	কেউ না
	[ʃɔkɔluat̪um]	সব

ঘ) *অব্যয়*: কোনো অবস্থাতেই যে পদের কোনো পরিবর্তন হয় না, তাকে বলা হয় অব্যয় পদ। পাত্র ভাষায় অব্যয় পদের উদাহরণ হলো- [ar] ও, [aŋ] এবং [hɔŋ] তাই প্রভৃতি।

ঙ) *ক্রিয়াপদ:* অর্থের বিচারে ক্রিয়াপদ দুইভাগে বিভক্ত, সমাপিকা ক্রিয়া ও অসমাপিকা ক্রিয়া। পাত্র ভাষায় এই দুই ক্রিয়াপদের ব্যবহার নিম্নরূপ-

i) *সমাপিকা ক্রিয়া*: [c^{h}a] খাওয়া, [ɟol] খেলা, [k^{h}ulo] দেখা, [kala] গাছ থেকে ফল পড়া, [bɔm] মারা, [uni] বসা , [oye] ঘুমানো, [cako] কান্না , [d̪amol] হাঁটা, [rijɔk] দাঁড়ানো, [ini] হাসি ইত্যাদি।

ii) অসমাপিকা ক্রিয়া: [uṭika] করে, [ugaŋ] গিয়ে প্রভৃতি।

৮.৩.৩.৬ কারক, বিভক্তি ও অনুসর্গের ব্যবহার

সাধারণভাবে বলা যায় যে, ক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের যে অন্বয় বা সম্পর্ক থাকে তাকে বলা হয় কারক। কারকের সঙ্গে বিভক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। বাক্যস্থিত একটি শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের অন্বয় সাধনের জন্য শব্দের সঙ্গে যেসব বর্ণ যুক্ত হয় তাদেরকে বলা হয় বিভক্তি। বাংলা ভাষায় যেসব অব্যয় শব্দ কখনও স্বাধীনরূপে, আবার কখনও শব্দ বিভক্তির মতো বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের অর্থ

প্রকাশে সাহায্য করে, সেগুলিকে বলা হয় অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় শব্দ। পাত্র ভাষায় ব্যবহৃত কারক, বিভক্তি ও অনুসর্গের ব্যবহার নিচে দেয়া হলো।

৮.৩.৩.৭ কারক–বিভক্তি

পাত্র ভাষার কারক–বিভক্তি	বিভক্তি	IPA	বাংলা অর্থ
আইন পরিবারকা সাতখান দাহান	/ka/	/ain poribarka saʈkʰan ɖahan/	আমাদের পরিবারের সদস্য সাতজন।
আলিং সকলে মিলিরা পাঞ্চানুতং মিটিং তিরা এরা দিরা খরচং এনলো	/lo/	aliŋ sɔkole milira pancanuʈɔŋ mitiŋ ʈira era ɖira kʰɔrcɔŋ enlo	আমাদের পুজার সব খরচ পঞ্চায়েত বহন করে।
আলিং পারুং জাগাখা কোন কিছু লাগাই ইয়াইলো	/kʰa/	aliŋ paruŋ ɟagakʰa kono kicʰu lagai iyailo	পাহাড়ের জমিতে সাধারণত চাষবাস করা হয় না।
আলিং থারকোং পড়ালেখা ছড়া পিং লাগিনা।	/kʰ/	aliŋ ʈʰarkoŋ pɔɽalekʰa cʰɔɽa piŋ ligina	আমাদের ভাষায় পড়ালেখার সুযোগ করে দিতে হবে।
দুইলা আস আছিইন।	/la/	ɖuila as acʰiin	আমার দুটি হাঁস আছে।
লালেং লালাতুং তালখা কামতুংলো	/kʰ/, /lo/	laleŋ lalaʈuŋ ʈalkʰa kamʈuŋlo	পাত্র নারীরা মাঠে কাজ করে।
ছিকাংখা ছানখা মাইলো	/kʰ/	cʰikaŋkʰa cʰankʰa mailo	শূকরের মাংস পাত্রদের প্রিয় খাবার।
বাংবিয়াখা কোন কুনতাপিং দরকার নাই।	/piŋ/	baŋbiakʰa kon kunʈapiŋ ɖɔrkar nai	পাত্র বিয়েতে যৌতুকের প্রচলন নেই।
বাংথুমং সাং আথা থংলাইখেম	/ʈʰɔmŋ/	baŋʈʰumɔŋ saŋ aʈʰa ʈʰɔlaikʰem	মাটির ঘরই পাত্রদের শান্তির আশ্রয়স্থল।

ক. কর্তৃকারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ

বিভক্তির ব্যবহার	IPA	বিভক্তি	বাংলা অর্থ	মন্তব্য
শূন্য বিভক্তির ব্যবহার	[mæra nɔn calo]	/o/	ভেড়া ঘাস খাচ্ছে	
দ্বিতীয়া বিভক্তির ব্যবহার	[naŋle boiya poriuŋ lagina]	/le/	তোমাকে বইটি পড়তে হবে	
তৃতীয়া বিভক্তির ব্যবহার	[naŋle enra hɔkampa ic^{h}ye̯na]	/enra/	তোমাকে দিয়ে এ কাজটি হবে না	
পঞ্চমী বিভক্তির ব্যবহার	[hayre enra ho kampa ic^{h}ye na]	/enra/	আমাকে দিয়ে এ কাজটি হবে না	
ষষ্ঠী বিভক্তির ব্যবহার	[naŋ uŋ d̪ɔrk^{h}ar]	uŋ	তোমার যাওয়া উচিত	

খ. কর্মকারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ

বিভক্তির ব্যবহার	IPA	বিভক্তি	বাংলা অর্থ	মন্তব্য
শূন্য বিভক্তির ব্যবহার	[liton pat̪ro sɔnd̪eʃ banyelo]	/lo/	লিটন পাত্র পিঠা তৈরি করছে	
দ্বিতীয়া বিভক্তির ব্যবহার	[kamlaoile bɔmra pic^{h}aoile p^{h}akulo]	/le/	মেয়েকে মেরে বউকে দেখাচ্ছে	
পঞ্চমী বিভক্তির ব্যবহার	[bark^{h}a d̪ara hɔyera k^{h}ɔlɔŋailo]	/d̪ara /	বাইরে থেকে এভাবে পাওয়া যায় না	

ষষ্ঠী বিভক্তির ব্যবহার	[ioŋ ʃeba ʃɔ]	/ŋ /	মায়ের সেবা কর।	
৭মী বিভক্তির প্রয়োগ	[kam tulo ɟɔne ɟɔne]	/e/	জনে জনে কাজ করছে।	

গ. কারণ কারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

বিভক্তির ব্যবহার	**IPA**	**বিভক্তি**	**বাংলা অর্থ**	**মন্তব্য**
শূন্য বিভক্তি	[lalat̪um caroilam ɟɔllo]	/lo/	মেয়েরা দড়ি নাচ খেলছে।	
দ্বিতীয়া বিভক্তির	[alaŋle enra wat̪um æʃoyna]	/le/	তাকে দিয়ে এ কাজ হবে না।	
পঞ্চমী বিভক্তির ব্যবহার	[oled̪i oile enra ʃɔŋʃarɔŋ kam iʃoyna]	/enra/	মেয়েটিকে দিয়ে সংসারের কাজ হবে না।	
৭মী বিভক্তির প্রয়োগ	[b^habira d̪i lab^h]	/ra/	ভেবে কী লাভ?	

ঘ. সম্প্রদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ

বিভক্তির ব্যবহার	**IPA**	**বিভক্তি**	**বাংলা অর্থ**	**মন্তব্য**
শূন্য বিভক্তির ব্যবহার	[baŋua $t̪^h$akuruŋ laram pilo]	/lo/	লোকটা ঠাকুরের পূজা করছে।	
চতুর্থী বিভক্তির ব্যবহার	[gorible saŋai pi]	/le/	গরিবকে টাকা দাও।	
৭মী বিভক্তির প্রয়োগ	[kanale d̪in p^haku]	/le/	অন্ধকে রাস্তা দেখাও।	

ঙ. অপাদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ

বিভক্তির ব্যবহার	IPA	বিভক্তি	বাংলা অর্থ	মন্তব্য
শূন্য বিভক্তির ব্যবহার	[bas ua ɟaflɔŋ soi lɔt̪k^{h}aŋ]	/aŋ/	বাসটি জাফলং এর দিকে ছাড়ল।	
দ্বিতীয়া বিভক্তি	[ain pale p^{h}arailo]	/le/	আমার বাবাকে ভয় পাই না।	
তৃতীয় বিভক্তি	[mekuŋ t̪oi kalalo]	/uŋ/	চোখ দিয়ে পানি পড়ছে	
পঞ্চমী বিভক্তি	[hua k^{h}em k^{h}at̪o nigira ukaŋ]	/k^{h}at̪o/	সে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছে।	k^{h}at̪o
ষষ্ঠীবিভক্তি	[bagank^{h}a mɔroŋ inum k^{h}ɔloŋlo]	/k^{h}a/	বাগানে ফুলের গন্ধ পাচ্ছি	
৭মী বিভক্তির প্রয়োগ	[lubʃot̪ika laŋat̪ iʃona, laŋatɔ iʃot̪ka t^{h}ina]	/ka/	লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু	

চ. অধিকরণ কারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ

বিভক্তির ব্যবহার	IPA	বিভক্তি	বাংলা অর্থ	মন্তব্য
শূন্য বিভক্তির ব্যবহার	[hua k^{h}emk^{h}a d̪uai]	/k^{h}a/	সে বাড়িতে নেই।	
দ্বিতীয়া	[p^{h}aran ain lamlo mani]	/lo/	মন আমার	

বিভক্তি			উদাসীন।	
তৃতীয় বিভক্তি	[nod̪ikuŋ c^{h}ɔye t̪allɔŋ ulo]	/uŋ/	নদীতে নৌকা চলে।	
পঞ্চমী বিভক্তি	[c^{h}at̪ t^{h}akat̪ɔ t̪oi k^{h}alalo]	/t^{h}akat̪ɔ/	ছাদ থেকে পানি পড়ে।	t^{h}akat̪ɔ
৭মী বিভক্তির প্রয়োগ	[ʃɔrʃuka ɟɔŋtu d̪ak^{h}aŋ]	/ka/	সরষেতে তেল আছে।	

৮.৩.৩.৮ অনুসর্গের ব্যবহার

পাত্র ভাষার অনুসর্গ	IPA	অনুসর্গ	বাংলা অর্থ
হালিং শিকারকা উরা খলংত্র	[haliŋ ʃikarka ura k^{h}ɔlɔŋ t̪ro]	/ura/	শিকার পাবার জন্য আমরা কালভোগ দিই।
হগতিকে হালিং শিক্ষাখাত বঞ্চিত	[hɔgt̪ike haliŋ ʃikk^{h}ak^{h}at̪ bɔncit̪o]	/haliŋ/	আমরা শিক্ষা অধিকার হতে বঞ্চিত।
মানি শিকার খাপে এনাহা এনাম খাতো এনাহা	[mani ʃikar k^{h}ape enaha enam k^{h}at̪o e naha]	/k^{h}at̪o/	আজ দুটি শূকর বন থেকে শিকার করা হয়েছে।
গাও ছেলে ফের তম তামই লেখাপড়া চল	[gao c^{h}elep^{h}er t̪ɔm t̪ami lek^{h}apɔɽa cɔl]	/t̪ɔm/	গ্রামের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অল্পই লেখাপড়া করছে।
বাড়িং বেরকা শখুং তাল	[baɽiŋ berka ʃɔk^{h}uŋ t̪al]	/berka/	বাড়ির পাশে ধানক্ষেত।
নানদিদিকা চো ইয়াংকান	[nand̪id̪ika co iyaŋkan]	/co/	আপনি কোথায় থেকে এসেছেন।
রং উং ছবি আকিলা	[rɔŋ uŋ c^{h}obi akila]	/uŋ/	রং দিয়ে ছবি আঁকি।

৮.৩.৩.৯ বাচ্যের প্রকারভেদ

পাত্র ভাষায় চার ধরনের বাচ্যের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়–

- *কর্তৃবাচ্য:* কর্তৃবাচ্যে কর্তার ভূমিকা প্রধান থাকে; যেমন– [baŋ t̪alo] লোকে বলে। [naŋ hɔkale d̪iʃɔlɔ] তুমি এখানে কী করো।

- *কর্মবাচ্য:* পাত্র ভাষায় এ ধরনের বাচ্যে কর্মের ভূমিকা প্রাধান্য পায়; যেমন– [pɤobit̪ɤo caratikaŋ] পবিত্র খেয়ে ফেলেছে। [inkʰule t̪ɔkoikaŋ] চোরকে ধরা হয়েছে।
- *ভাববাচ্য:* এ বাচ্যে বাক্যের কর্তা ও কর্ম কোনোটিরই প্রাধ্যান্য থাকে না, এখানে ক্রিয়ার প্রাধান্য থাকে; যেমন– [cɔmra ʃes ʃɔkoŋ] কথা বলা শেষ, [naŋle d̪amuŋ lagina] তোমাকে হাটতে হবে।
- কর্ম–কর্তৃবাচ্য: এই বাচ্যে কর্ম এবং কর্তা নিরপেক্ষভাবে কাজ করে, যেমন– [mai iʃoyna] ভালো হবে না।

৮.৩.৩.১০ ক্রিয়ার ভাব

ক্রিয়ার বিভিন্ন প্রকাশ রূপকে বলা হয় ক্রিয়ার ভাব। পাত্র ভাষায় চার ধরনের ক্রিয়ার ভাব ব্যবহৃত হয়ে থাকে–

ক) *নির্দেশক ভাব*: এ ভাবের সাহায্যে সাধারণ কোনো ঘটনা বর্ণনা করা হয় বা জিজ্ঞেস করা হয়, যেমন– [dakʰait̪ pʰuka latʰiŋ marikaŋ] ডাকাতকে লাঠি দিয়ে মারা হয়েছে। [lekʰapɔraka alaŋ mɔn d̪oi] তার লেখাপড়ায় মন নেই। [naŋ an sakaŋ] – তুমি কি ভাত খেয়েছ? [naŋ mai d̪akʰaŋ?]– তুমি কেমন আছ?

খ) *অনুজ্ঞা ভাব*: আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ ইত্যাদি প্রকাশে ক্রিয়ার অনুজ্ঞা ভাব হয়। যেমন–

[naŋ manap ud̪iŋ] তুমি আগামীকাল যাবে [apnarat̪um yaŋd̪ui]তোমরা সবাই আসবে।

[pʰaran pira pori] মন দিয়ে পড়ো [ʃoriluŋ bekʰe kʰyal bed̪oi] শরীরের দিকে খেয়াল রাখ

গ) *সাপেক্ষ ভাব*: একটি ক্রিয়ার গঠন অন্য একটি ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল হলে, নির্ভরশীল ক্রিয়াকে বলা হয় সাপেক্ষ ভাবের ক্রিয়া; যেমন–

[hoira gʰurira cɔmle ʃɔkɔlt̪aŋ ʃɔmad̪ʰan iʃɔna] এভাবে ঘুরিয়ে পেচিয়ে বললে কোনো কিছুর সমাধান হবে না।

[maira porile̪ t̪ʰai icʰɔna] ভালোভাবে পড়ালেখা করলে অনেক বড় হবে।

আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাব: এই ভাবের সাহায্যে আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়, যেমন– [alaŋ pa una] সে চলে যাক, [alaŋ mai pa iʃɔna] সে ভালো হোক।

৮.৩.৩.১১ পুরুষের প্রকারভেদ

পাত্র ভাষায় তিন প্রকার পুরুষের ব্যবহার লক্ষ করা যায়–

ক) উত্তম পুরুষঃ এ পুরুষের সাহায্যে বক্তার নিজের উক্তি সরাসরি বর্ণনা করা বোঝায়; যেমন– [hai] আমি [aliŋ] আমাদের।

খ) *মধ্যম পুরুষ*: যে পুরুষকে সম্বোধন করে কিছু বলা হয় তা মধ্যম পুরুষ হিসেবে পরিচিত; যেমন– [naŋ] তোমার [naliŋ] তোমাদের, [naniŋt̪um] তোমরা প্রভৃতি।

গ) *প্রথম পুরুষ*: সাধারণত আমি ও তুমি অর্থ প্রকাশ ছাড়া পাত্র ভাষায় অন্য পদকে প্রথম পুরুষ বলে গণ্য করা হয়ে থাকে; যেমন– [alaŋ] তার , [alaliŋ] তাদের, [baŋ] মানুষ, [oasa] পাখি ইত্যাদি।

৮.৩.৩.১২ কাল

ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার সময়কে বলা হয় ক্রিয়ার কাল। পাত্র ভাষায় প্রধানত ক্রিয়ার কাল তিন প্রকার–

ক) *বর্তমান কাল*: বর্তমান কালে কোনো কাজ নিষ্পন্ন বোঝাতে এই কালের প্রয়োগ হয়ে থাকে–

[rani t̪ʰurlo] সূর্য ওঠে [hai porilo] আমি পড়ছি

বর্তমান কালকে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে–

সাধারণ বর্তমান কাল: সাধারণ বর্তমান কালে ক্রিয়া সাধারণত নিত্য বা সব সময় ঘটে; যেমন– [hai porilo] আমি পড়ছি [alaŋ calo] সে খাচ্ছে[rani nikʰaŋ ku tʰɔrlo] সূর্য পূর্বদিকে উঠে।

ঘটমান বর্তমান কাল: কোনো কাজ বর্তমানে ঘটছে বা চলছে বোঝালে তা ঘটমান বর্তমান কাল রূপে পরিচিত; যেমন– [hai boi porilo] আমি বই পড়ছি। [alaŋ ɟɔllo] সে খেলছে

পুরাঘটিত বর্তমান কালঃ যে ক্রিয়া এই মাত্র শেষ হয়েছে,কিন্তু তার ফল বর্তমানেও আছে এরূপ বোঝাতে পুরাঘটিত বর্তমান কাল হয়; যেমন– [hai boi porika] আমি বই পড়েছি। [alaŋ an cakaŋ] সে কি ভাত খেয়েছে

বর্তমান অনুজ্ঞা: যে ক্রিয়ার সাহায্যে বর্তমান কালের আদেশ, উপদেশ, নিষেধ, অনুরোধ ইত্যাদি বোঝায় তা বর্তমান অনুজ্ঞা হিসেবে ব্যবহৃত হয়; যেমন– [naŋ u] তুমি যাও, [mai d̪a d̪oi] ভালো থেকো।

খ) অতীত কালঃ অতীতে কোনো কাজ সংঘটিত হয়েছে এরূপ বোঝাতে অতীত কাল ব্যবহৃত হয়; যেমন– [alaŋ iyaŋ d̪i] সে এসেছিল, [alaliŋ ukaŋ] তারা চলে গেছে।

গ) *ভবিষ্যৎ কাল*: পরে সংঘটিত হবে এরূপ বোঝাতে ক্রিয়ার ভবিষ্যৎকাল হয়; যেমন–

[anaŋ t̪al ɟɔre] সে জমি বিক্রি করবে [alaliŋ uye] তারা যাবে।

৮.৩.৪ অর্থতত্ত্ব (Semantics)

ভাষাবিজ্ঞানের মৌলিক চারটি উপাদানের মধ্যে অর্থতত্ত্ব একটি। ইংরেজিতে এ শাস্ত্রের নাম Semantics। এ শাস্ত্রটিকে বাংলায় বাগর্থতত্ত্ব, বাগর্থবিজ্ঞান, শব্দার্থবিজ্ঞান, শব্দার্থতত্ত্ব প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। সাধারণভাবে বলা যায়, যে শাস্ত্রে ভাষার অর্থ নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে বলা হয় অর্থতত্ত্ব। ভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অর্থততত্ত্বের ভূমিকা অনস্বীকার্য। অর্থতত্ত্বে শব্দের আভিধানিক অর্থ, ব্যঞ্জনার্থ, ধারণা (sense), নির্দেশন (reference), নামকরণ (naming), সমার্থ শব্দ, বিপরীতার্থ শব্দ, সমোচ্চারিত শব্দ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাত্র ভাষা বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে-

৮.৩.৪.১ সমার্থ শব্দ

যেসব শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করে সেসব শব্দকে বলা হয় সমার্থ শব্দ। আজাদ (১৯৯৯) বলেছেন, 'সমার্থকতা Synonymy বা বোঝায় সম বা অভিন্ন বা একই অর্থ। প্রতিটি ভাষায় বহু শব্দ রয়েছে যেগুলো, সব সময় না হলেও অনেক সময় একই অর্থ প্রকাশ করে। ওই শব্দগুলো পরস্পরের সমার্থক; তাই সেগুলোকে বলা হয় সমার্থ শব্দ' (আজাদ, ১৯৯৯: ৪২)। পাত্র ভাষার সমার্থক শব্দের উদাহরণ হলো– লবণ– [in̪ti], [tiga], জমিজমা– [tʰoŋlai], [t̪al], নিকটে [inaka], [kand̪aka], বানর– [kaoi], [kapui], মানুষ–[cɔŋʃaʃu], [d̪uk], জ্বর[cʰai] [cai] [coi], কাশি [pacat̪uk] প্রভৃতি।

৮.৩.৪.২ বিপরীতার্থক শব্দ

এক কথায় বলা যায়, যেসব শব্দ বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে তাকে বলা হয় বিপরীতার্থক শব্দ। আজাদ (১৯৯৯) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'Antonymy-র বাঙলা পরিভাষা বিপরীতার্থকতা; এটি বোঝায় বিপরীত অর্থ বা অর্থ-বৈপরিত্য। যে-সব শব্দ পরস্পর বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে, সেগুলোকে বলা হয় Antonym বা বিপরীতার্থক শব্দ' (আজাদ, ১৯৯৯: ৪৭)। পাত্র ভাষায় ব্যবহৃত বিপরীতার্থক শব্দগুলো হলো– হাসি –কান্না[ini] [cakʰu], জন্ম–মৃত্যু [iʃkʰɔŋ]–[bugiʔ] উপরে–নিচে [tʰak]– [bar], সাদা–কালো [lɔk]–[ikʰ] লম্বা–খাটো [d̪iŋ]–[tʰui] ঘুম–নির্ঘুম [migoi]–[migoiaŋailo] আজ–কাল [mani]– [manap] প্রভৃতি।

৮.৩.৪.৩ সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ

যে সব শব্দের উচ্চারণ অভিন্ন কিন্তু অর্থ আলাদা সেসব শব্দকে বলা হয় সমোচ্চারিত শব্দ। পাত্র ভাষায় ব্যবহৃত সমোচ্চারিত শব্দ হলো- [iaŋ] ধরা– [iaŋ] আসা, [ɟɔr] বলপূর্বক কোনো কিছু ঢোকানো– [ɟɔr] খোঁচা দেওয়া, [dekkai] ঠেলা দেওয়া – [dekkai] উপরে তোলা

৮.৩.৪.৪ অন্তর্ভুক্ততা

যেসব বস্তুকে একই ধারণার অন্তর্গত রূপে গণ্য করা যায় তাকে বলা হয় অন্তর্ভুক্ততা বা hyponymy। আজাদ (১৯৯৯) বলেছেন, 'অন্তর্ভুক্ততা নির্দেশ করে বিশেষ এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া; যেমন, ফুল ধারণার মধ্যে সব ধরনের ফুল অন্তর্ভুক্ত, পশু ধারণার মধ্যে অন্তভুক্ত সব ধরনের পশু' (আজাদ, ১৯৯৯: ৪৫-৪৬)।

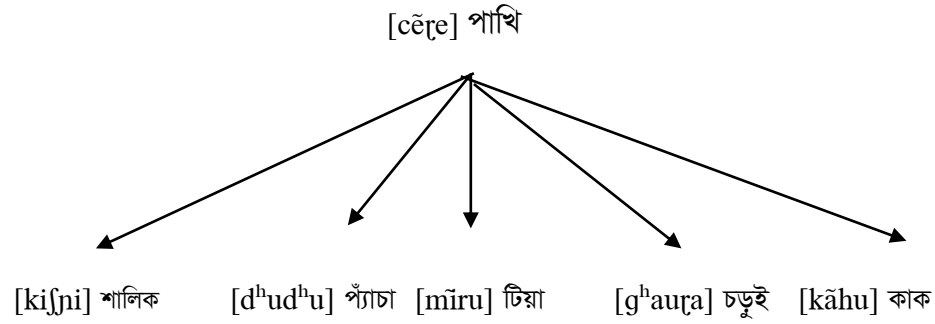

৮.৪ পাত্র ভাষা সংগঠনে পাত্র সংস্কৃতির প্রভাব

ভাষা ও সংস্কৃতির অভিচ্ছেদ্য প্রভাব রয়েছে। ভাষা যেমন সমাজ ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে তেমনি সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান ভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করে। পাত্র ভাষা সংগঠনে পাত্র সংস্কৃতির প্রভাব বিদ্যমান। পাত্রদের প্রাত্যহিক জীবনের সার্বিক কর্মকাণ্ডের এই প্রভাব পাত্র ভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। এই প্রভাব পাত্র ভাষার সংগঠনে অর্থাৎ এ ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্বকে বিশেষ প্রভাবিত করেছে। নিচে পাত্র ভাষা সংগঠনে উদ্দিষ্ট সংস্কৃতির প্রভাব আলোচনা করা হলো-

৮.৪.১ ধ্বনিতাত্ত্বিক সংগঠনে প্রভাব

পাত্র ভাষা স্বর প্রধান ভাষা নয় বলে ধ্বনিতাত্ত্বিক সংগঠনে পাত্র সংস্কৃতির তেমন প্রভাব লক্ষ করা যায় না। অর্থাৎ অতিরিক্ত ধ্বনিমূলীয় বৈশিষ্ট্য পাত্র ভাষার ধ্বনিতত্ত্বে ক্রিয়াশীল নয়।এ ভাষায় খ, ম, প, ফ, ল শ ও হ ধ্বনি ব্যবহারের আধিক্য লক্ষ করা যায়।

৮.৪.২ রূপতাত্ত্বিক সংগঠনে প্রভাব

যে কোনো ভাষার রূপতত্ত্বে বা শব্দভাণ্ডারে সংস্কৃতির প্রভাব বেশি থাকে। বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান ভাষার রূপতত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। পাত্র ভাষা এর ব্যতিক্রম নয়, এ ভাষার শব্দভাণ্ডারে পাত্র সংস্কৃতির নানা প্রত্যয়ের গ্রহণ ও বর্জন ভাষাটিকে অনেক পরিবর্তিত রূপ দিয়েছে।পাত্র সংস্কৃতি পাত্র ভাষার রূপতাত্ত্বিক সংগঠনকে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে-

ক) খাদ্য দ্রব্য সংক্রান্ত রূপমূলের ক্ষেত্রে

মানুষের জীবন ধারণের প্রধান অবলম্বন হলো খাদ্য। খাদ্যের ব্যবস্থা ও আহরণের ক্ষেত্রে সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। প্রতিটি জাতি গোষ্ঠির স্বতন্ত্র খাদ্যাভ্যাস রয়েছে। তার এ খাদ্যাভ্যাস নির্ধারিত হয় ভৌগোলিক অবস্থান, শিক্ষা, ধন-সম্পদের প্রাচুর্য, খাদ্য আহরণের উপায়, প্রধান জীবিকা প্রভৃতি বিষয়কে প্রাধ্যান্য দিয়ে। আজ থেকে প্রায় সাতশত বছর পূর্বে পাত্র সিলেটে নিবাস গড়ে তোলে বলে পণ্ডিতেরা মত দিয়েছেন। সে সময় পাত্র এলাকা ছিল বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ। পাত্রদের তখন বনে প্রাণি শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করতে হতো। খাদ্য তালিকায় সে সময় তাই বনজ প্রাণি ও বনজ লতাপাতার প্রভাব ছিল বেশি। শিকারের মধ্যে বনরুই (বন্য শূকর), অখ্যই/ ছেদা (সজারু), আইরং (ঘড়িয়াল), ওয়াক (কাক), ওয়াথুম (ঘুঘু), খুরোলি (পেচা), বাইজবড়ি (বাজপাখি), উরখাই (বেজি), কইরা (হরিণ), খাতুয়া (কচ্ছপ), ফাক (শূকর), মাইসাং (হনুমান), লালাই (কাঠবিড়ালি) প্রভৃতি পাত্রদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় ছিল। এসব প্রাণির মাংস পাত্রদের প্রধান ও প্রিয় খাদ্য হিসেবে গণ্য হতো। কিন্তু বর্তমানে পাত্র এলাকায় পাহাড়-পর্বত হ্রাস পাওয়ায় পাত্র এখন এসব প্রাণি শিকার করতে পারে না এবং এসব প্রাণির মাংসও তাদের খাবারের তালিকায় প্রধান খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হওয়ার সুযোগ নেই। প্রত্যেক পাত্র বাড়িতে ১০৮ ধরনের ভেষজ উদ্ভিদ দিয়ে এক ধরনের পানীয় তৈরি করতেন। এই পানীয়কে পাত্র ভাষায় বলা হয় চুরাং। চুরাঙের উপাদান হিসেবে খাংলা (বাটি গাছের ছাল), তেরায় লা (তেরাবন), গুয়ামুরির পাতা (মসলা জাতীয় পাহাড়ী গাছ), মনিরাজ গাছের পাতা, ধুতরা পাতা, হরতকি, সইটমরা (লজ্জাবতী গাছ), নিমপাতা, মানুবুড়া (গোলাকৃতি মাটির নিচের আলু) প্রভৃতি অত্যন্ত জনপ্রিয়। পাত্রদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে যে, চুরাঙ্গের ১০৮ ধরনের উপাদানের অনেক উপাদানই এখন আর ব্যবহৃত হয় না। এমনকি স্বচ্ছল পাত্ররা কেবল বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এসব চুরাং পান করে। অস্বচ্ছল পাত্রদের অনেকেরই এখন প্রতিদিন এ চুরাং পানের সুযোগ পায় না। কাজেই পাত্রদের খাদ্য তালিকায় সংস্কৃতির যেসব উপাদান ছিল সেসব অধিকাংশ উপাদান না থাকায় ভাষার শব্দভান্ডারে এর প্রভাব পড়েছে অর্থাৎ এসব উপাদান নির্দেশক অনেক শব্দই হারিয়ে যাচ্ছে।

খ) বাসস্থান সংক্রান্ত শব্দ

মানুষের বাসস্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ। এ বাসস্থানের সঙ্গে মানুষের জীবনাচারণের একটি চিত্র অনুমান করা যায়। পাত্ররা পাহাড়ঘেরা অঞ্চলে বাস করে বলে তাদের ঘরবাড়ি টিলার উপরে অবস্থিত। পূর্বে এ টিলা আরও উঁচুতে ছিল। প্রকৃতি থেকে থেং (কাঠ), কয়রং (সুপারি গাছ), লা (পাতা), রেহেক (ঝাড়ু), ইনাম (জঙ্গল), থেং (গাছ) প্রভৃতি শব্দগুলো বেশি ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে পাত্র সংস্কৃতিতে বাসস্থানের অনেক উপাদানই পরিবর্তন হয়েছে। পাত্র এলাকার অনেক ঘরই এখন আর আগের মতো প্রকৃতি নির্ভর নয়।

পাত্র এলাকার অধিকাংশ ঘরইএখন আরি (করাত), খুন্তি (শাবল), ইনচইন (পেরেক), ইনক (দা), আদু (টুকরি), আটুরা (হাতুড়ি), কাচি (কাস্তে) প্রভৃতির সাহায্যে নির্মিত। কাজেই পাত্র সংস্কৃতির এসব রূপান্তর ভাষার শব্দভাণ্ডারকেও পরিবর্তন করেছে।

গ) পোশাকের ক্ষেত্রে

পোশাক মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে একটি। খাদ্যের পরেই মানুষের অন্যতম চাহিদা হলো পোশাক। এ পোশাক মানুষের ব্যক্তিগত সংস্কৃতিকে প্রকাশ করে। পাত্ররা পাহাড়বেষ্টিত এলাকায় বাস করত বলে তারা একসময় মোটামুটি বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। এছাড়া পাত্ররা অধিকাংশই অশিক্ষিত ছিল বলে তাদের নিজস্ব পোশাকের বাইরে অন্য সম্প্রদায়ের পোশাকের প্রয়োজন হতো না। একসময় পাত্র পুরুষের অনেকেই সিলো (পিরন) বা নেংটি পরিধান করতো এবং মহিলারা বুক পর্যন্ত আবৃত এক ধরনে পোশাক পরিধান করতো যা পাত্র ভাষায় সিলো (পরা) নামে পরিচিত। কিন্তু বর্তমানে পাত্ররা আর দলগত জীবন ধারণ করতে পারে না। পাত্রদের মধ্যে অনেকেই এখন শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করেছে এবং তাদের অধিকাংশই পোশাকের ক্ষেত্রে আধুনিক মানসিকতা ধারণ করেছেন। কাজেই পাত্রদের পোশাকের তালিকায় বর্তমানে লুঙ্গি, গামছা, প্যান্ট, শার্ট, ফতুয়া, সেলোয়র, কামিজ, টু পিচ, থ্রি পিচ, ইল (শাড়ি), ইলুংমোর (আচল), ইংখু (চুড়ি), খাড়ু (হস্তভূষণ), খালুং (গলা), খালুংমোলা (হার), নাংদুল (কানের দুল), মলুং (কোমরবন্দ), মলুং বিছা (বাজুবন্দ) প্রভৃতিসংযোজিত হয়েছে।

৮.৫ উপসংহার

পাত্র ভাষার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ ভাষার মৌলিক উপাদান যেমন ধ্বনি, রূপমূল বা শব্দ, বাক্য ও অর্থের স্বতন্ত্র ব্যবহার ভাষাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। তাই ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে পাত্র ভাষা যে আলাদা ভাষা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পাত্র ভাষার মৌখিক রূপ সমৃদ্ধ হলেও লিখিত রূপের নিদর্শন না থাকায় এ ভাষা নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ হয়নি। এখানে পাত্র ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক উপাদানের একটি ধারণা প্রদান করা হয়েছে। আশা করা যায়, এ গবেষণা থেকে পাত্র ভাষা সংগঠনের একটি সম্যক ধারণা লাভ করা যায়।

নবম অধ্যায়

পাত্র সংস্কৃতির নানা দিক

মানুষের সার্বিক জীবনব্যবস্থাকে এক কথায় বলা যায় সংস্কৃতি। অর্থাৎ মানুষ যা করে তা-ই তার সংস্কৃতি। এ বিষয়টিকে হালদার (২০০৮: ৩৪) আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বলেন, 'সংস্কৃতি বলিতে আমরা বুঝি কাব্য, গান, শিল্প,দর্শন, আচার-বিচার, বড় জোর এখন বিজ্ঞানও। কখনো আমরা ভাবি সংস্কৃতি দেশগত, কখনোবা ভাবি তাহা কালগত। সরকারও (১৯৯১: ৯) একই সঙ্গে ব্যক্ত করেন- 'সংস্কৃতি আমাদের জীবনচর্যার যা কিছু সুন্দর সৃষ্টি-প্রত্যক্ষ হোক, কল্পনা হোক-তাই। অর্থাৎ সংস্কৃতি আর চারুকলা একই কথা। প্রত্যক্ষ সৃষ্টির মধ্যে পড়ে চিত্রকলা, ভাস্কর্য, নৃত্য, কিয়দংশে সংগীত, নাট্যকলা ইত্যাদি'। হক (২০১৩: ৯) বিষয়টিকে আরও গভীরতর দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে–

> সংস্কৃতি সম্পূর্ণই মানবীয় ব্যাপার। পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে আপন চিন্তাশক্তি ও শ্রমশক্তি ব্যবহার করে প্রাণীবিশেষ মানুষে উত্তীর্ণ হয়েছে, এবং সেই মানুষ আপন সংস্কৃতিচেতনার বলে পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে উন্নতি করে চলছে সংস্কৃতি চেতনা মানবসত্তার অন্তর্নিহিত ব্যাপার।

সংস্কৃতি মানুষের নিজস্ব সম্পদ। সংস্কৃতিই একটি জনগোষ্ঠিকে অন্য জনগোষ্ঠি থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করে। সাধারণত একটি গোষ্ঠির সংস্কৃতি অভিন্ন হয়ে থাকে। একই ভাষা ও সমজাতীয় সংস্কৃতির জনগোষ্ঠিকে ভাষা সম্প্রদায় (speech community) বলে অভিহিত করা হয়। গাম্পার্য (Gumperz, 2009: 66) এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

> The universe is the speech community: any human aggregate characterized by regular and frequent interaction by means of a shared body of verbal signs and set off similar aggregates by significant differences in language usage.

একই ভাষাসম্প্রদায় তাঁদের ঐতিহ্যগত জীবনব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার অভিপ্রায়ে সংহতি প্রকাশ করেন। তাই সংস্কৃতি অনুশীলনে তাঁদের এই গোষ্ঠিবদ্ধ প্রক্রিয়াকে সমাজবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী, ভাষাবিজ্ঞানীগণ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠি নিয়ে এই ভাবনার নিরন্তর অন্বেষা শুরু হয়েছে বহু আগে থেকেই; তবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এ চর্চা বেগবান হয়েছে বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। ইসলাম (২০০৭: ৩৪৫) এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন-

> ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পর থেকে ভারতীয় সমাজ তথা বঙ্গ প্রদেশের অধিবাসীদের তাদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্নতা ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টিগোচর হয়। বহু জাতি অধ্যুষিত বঙ্গ প্রদেশ অনাদিকাল থেকেই বহন করে আসছিল তাদের স্বতন্ত্র ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ। এরূপ বিভিন্নধর্মী এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত জাতি সম্পর্কে তাই উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর মাঝেও কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে শুরু হয় প্রশাসনিক কাজের পাশাপাশি অত্র অঞ্চলের জাতি তথা অধিবাসীদের জীবনধারা ও তাদের জাতিতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহের কাজ, যার ফলে রচিত হয় বহু গবেষণামূলক জাতিতাত্ত্বিক অধ্যয়ন।

এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার নব দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। নৃবিজ্ঞানী ও ভাষাবিজ্ঞানীগণ বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির বস্তুনিষ্ঠ তথ্য উপস্থাপনে উৎসাহী হয়েছেন। কারণ এসব ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি বহুকাল থেকেই এদেশে বাস করে আসছে। কাজেই তাঁদের সংস্কৃতি অন্বেষণের মাধ্যমে আমাদের দেশের জনগোষ্ঠির সংস্কৃতি বিনির্মাণ অত্যন্ত জরুরি। চট্টোপাধ্যায় (২০১৩: ১৪১) এ প্রসঙ্গে বলেছেন–

> প্রাচীন বঙ্গে বহুবিধ উপজাতি/ আদিম জনগোষ্ঠীর বসতি ছিল। যেমন উল্লেখ করা যেতে পারে পুণ্ড্র, বঙ্গ, সুহ্ম, নিষাদ, শবর, পুলিন্দ ইত্যাদি। তন্মধ্যে সুপ্রাচীন পুণ্ড্র জনাগোষ্ঠীর প্রাচীন বঙ্গে ও ক্রমে বঙ্গের ইতিহাসে তাদের বসতি স্থাপন ও সংস্কৃতির রূপায়ণে তাদের ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

সংস্কৃতির দুটো বড় ভাগ হলো- বস্তুগত সংস্কৃতি (concrete culture or material culture) ও অবস্তুগত সংস্কৃতি (abstract culture)। সংস্কৃতির যেসব উপাদান প্রত্যক্ষ করা যায় বা স্পর্শ করা যায়, সেসব উপাদানকে বলা হয় বস্তুগত সংস্কৃতি। বস্তুগত সংস্কৃতির উদাহরণ হলো পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যদ্রব্য, খাদ্যসংগ্রহ, বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি, আবাস ও গৃহস্থালির নানা উপকরণ চেয়ার-টেবিল, খাট, মাদুর, সোফা, আমাদের পথঘাট, যানবাহন, চিকিৎসা ব্যবস্থার উপকরণ; যেমন-ওষুধপত্র, অপারেশনের যন্ত্রপাতি, এক্স-রে মেশিন, আলট্রা সোনোগ্রাফির যন্ত্র, তথ্য-প্রযুক্তির বিভিন্ন উপকরণ যেমন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল প্রভৃতি। যে সংস্কৃতির উপাদান দেখা যায় না বা স্পর্শ করা যায় না, তাকে বলা হয় অবস্তুগত সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতির উপাদান কেবল উপলব্ধি বা অনুভব করা যায়। এখানে তিন রকমের মানসিক উপাদান পরিলক্ষিত হয়। সরকার (১৯৯১: ১৮) এ প্রসঙ্গে বলেন-

> আমাদের মতে, সেখানে থাকবে প্রধানত তিন রকমের মানসিক উপাদান। এক, মানুষের যুক্তিসম্মত চিন্তা ও সিদ্ধান্ত- যার প্রকাশ তার জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিদ্যা-শিক্ষায়। দুই, মানুষের যুক্তিহীন বা যুক্তি অতিক্রমী বিশ্বাস-যার প্রকাশ তার ধর্মে ও সংস্কারে। ধর্ম ও সংস্কারের মধ্যে

> তফাৎ করতে পারি এই বলে যে, ধর্ম সংগঠিত, প্রণালীবদ্ধ এক বিশ্বাসের সংহত গুচ্ছ, তার সঙ্গে জটিল আরাধনা-আচরণের নানা প্রক্রিয়া যুক্ত। সংস্কার বা কুসংস্কার ধর্মের মতো সংগঠিত ও প্রণালীবদ্ধ নয়- সেগুলি বিচ্ছিন্ন ও পরস্পরযোগহীন উপলব্ধি মাত্র, যেগুলির জন্ম মানুষের আদিম ভয়ে বা লোভে। সংস্কার ধর্মের চেয়ে প্রাচীন। ধর্মগঠনে মানুষ কিছুটা বিচার ও চিন্তা ব্যয় করেছে, কিন্তু সংস্কারে সেই বিচারবোধকে সে গ্রাহ্য করেনি, চিন্তাকেও আমলে দেয়নি। তবে ধর্ম ও সংস্কার দুয়েরই মূল উৎস বিশ্বাস, যুক্তি নয়। ঐহ্যিক কার্যকারণের শৃঙ্খলাকে মান্য করলে ধর্ম ও সংস্কার উভয়কেই যুক্তিহীন আখ্যা দেওয়া সম্ভব। সংস্কৃতির তৃতীয় তার বস্তুগত উপাদান হল তার সুন্দর (বা অসুন্দরের) কল্পনা।

সংস্কৃতি বলতে শুধু যে ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, চিকিৎসার উপকরণ বুঝায় তা নয়; আবার কেবল আচার আচরণ, রীতিনীতি বুঝায় নয়। হালদার এ প্রসঙ্গে বলেছেন–'সংস্কৃতি বলিতে মানস-সম্পদও বুঝায়-চিন্তা,কল্পনা,দর্শন, ধ্যান-ধারণা এই সবও বুঝায়,তাহাও আমরা জানি। আসলে বাস্তব ও মানসিক সমস্ত কৃতি বা সৃষ্টি লইয়াই সংস্কৃতি- মানুষের জীবন-সংগ্রামের মোট প্রচেষ্টার এই নাম' (১৯৮৬: ২৫)।

বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি বাস করে; এর মধ্যে পাত্র সম্প্রদায় একটি। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত সিলেট বিভাগের এ পাত্র সম্প্রদায়ের বাস। এ সম্প্রদায়ের রয়েছে নিজস্ব আচার, বিশ্বাস, প্রথা, লোকরীতি এবং পৌরাণিক কাহিনী। তাঁদের সমাজে নিজস্ব ধর্ম-বিশ্বাস ও ট্যাবুর প্রভাব রয়েছে। তাদের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস, সামাজিক রীতিনীতি, ভৌগোলিক পরিবেশ, দৈহিক-মানসিক গঠন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনযাত্রা প্রভৃতি সিলেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি তথা অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র। ঐতিহ্যগত রীতির আলোকে পাত্ররা নিজস্ব সংস্কৃতি অনুশীলন করে আসছে যুগের পর যুগ।

পাত্র সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ভূমিকা বিদ্যমান। সংস্কৃতি বলতে কেবল তাঁদের নৃত্যগীত, বাদ্য-যন্ত্র, লোকাচার প্রভৃতি বুঝায় না; সেই সঙ্গে তাদের রীতিনীতি, লোকচার, সাধারণ শিষ্টাচার প্রভৃতিকেও বোঝায়। কোন সংস্কৃতির স্বরূপ অন্বেষণে তাই বস্তগত সংস্কৃতি ও অবস্তুগত সংস্কৃতি-এ দ্বিবিধ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে। সংস্কৃতি অন্বেষণে তাই সমাজের প্রথা, আচার অনুষ্ঠানের ভূমিকা কোনক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়। বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠির সংস্কৃতি নানা জাতি-গোষ্ঠির সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। বাংলাদেশে জনগোষ্ঠির সংস্কৃতি 'দ্রাবিড় ও কোল জাতির আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে বেশি মিল। এ থেকে যুক্তিসঙ্গতভাবে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ওই সব রীতিনীতি প্রাক-আর্য জাতিগুলোর কাছ থেকে নেয়া'

(ওয়াইজ, ২০০২: ২৪)। পাত্র সংস্কৃতি আলোচনায়ও এসব বিষয়সমূহের বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। পাত্র সংস্কৃতি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের জন্য তাদের সামাজিক প্রথা, ধর্মীয় মূল্যবোধ, সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠান, মৃতের সৎকার প্রভৃতি বিষয় আলোচ্য প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে।

৯.১ পাত্র সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির নানা দিক

ঐতিহ্যগত পাত্র সম্প্রদায়ের রয়েছে সমৃদ্ধশালী সংস্কৃতি। এসব সংস্কৃতি তাদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তার স্বীকৃতির স্মারক। নিচে পাত্র সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য দিক বর্ণিত হয়েছে।

৯.২ পরিবারের ধরন

পাত্রদের মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বিদ্যমান। পিতা হলেন তাদের পরিবারের প্রধান। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বয়োজ্যেষ্ঠদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হয়। পাত্রদের মাঝে একক পরিবার ও যৌথ পরিববার ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে। পূর্বে যৌথ পরিবারের প্রাধ্যান্য ছিল; বর্তমানে এ ব্যবস্থা চালু থাকলেও দিনের পর দিন একক পরিবারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। সাধারণত মা-বাবা জীবিত থাকলে সন্তানেরা যৌথ পরিবারেই বাস করে; বাপ-মা মারা গেলে সন্তানেরা একক পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পাত্রদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন অনেক দৃঢ়। পরিবারের কোনো সদস্য বিপদে পড়লে সবাই মিলে তাকে সাহায্য করে। (ছবি: পরিশিষ্ট ৩.৩ দ্রষ্টব্য)

৯.৩ জন্ম ও আচার-অনুষ্ঠান

পাত্র সমাজের রীতি অনুসারে কোনো মহিলা গর্ভবতী হলে তাকে সাদা ভাত খাওয়ানো হয়। একে বলা হয় 'সাত খাওয়ানো'। গর্ভবর্তী নারীর মা-বাবা এসে সাধারণত এটি খাওয়ান। গর্ভবতী যাতে সুস্থ থাকেন এই প্রত্যাশায় তাকে জিলাপি, মিষ্টি ও বিভিন্ন ফলমূল খাওয়ানো হয়। গর্ভধারণের আট বা নয় মাসের মধ্যে গর্ভের শিশুর নিরাপদ কামনায় রূপসী পূজা করতে হয়। এ পূজা সম্পর্কে ভিন্ন মত থাকলেও সর্বজনগৃহীত মতটি নিম্নরূপ-

সন্ধ্যায় শেওড়া গাছের নিচে পান সুপারি দিয়ে দেবীকে আহবান জানানো হয়। পরের দিন ছোট ছোট দুটি নতুন হাঁড়ির মধ্যে শাক ও মাছ দিয়ে ভাত রান্না করে ঐ শেওড়া গাছের নিচে রাখতে হয়। গর্ভধারণের সময় বৃদ্ধি পেলে গর্ভধারিণী গ্রামের ছড়া বা খালের প্রবাহিত স্রোতধারায় অথবা পুকুর পাড়ে পান সুপারি দিয়ে পূজা দেয়। পুত্রসন্তান প্রসব হলে নয় দিনে এবং কন্যাসন্তান প্রসব হলে ৭ দিনে একজন নাপিতকে বাড়িতে ডেকে এনে শিশু সন্তানের চুল কামানো হয়। শিশুর বয়স একুশ দিন অতিক্রান্ত হলে পুনরায় শুদ্ধাচার করতে হয়। এ সময় নাপিত আসে এবং শিশুর চুল কামানো হয় এবং আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করে ভালো খাবার খাওয়ানো হয়। এ সময় ধাত্রীকে নতুন কাপড় ও কিছু টাকা

দিয়ে খুশি করানোর রীতি পাত্র সমাজে প্রচলিত রয়েছে। পাত্র ভাষায় এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় বাইস্যা। এ দিন রাতে প্রদীপ জ্বালিয়ে শিশুর নাম রাখা হয়। এভাবে পাত্র সমাজের রীতি অনুসারে শিশুর জন্ম ও নাম রাখার অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়ে থাকে।

৯.৪ গৃহনির্মাণ

পাত্র জনগোষ্ঠি অত্যন্ত দরিদ্র। তাই ঐতিহ্যগত গৃহনির্মাণ তাদের মধ্যে এখনও প্রচলিত রয়েছে। তবে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় পাত্রদের মধ্যেও গৃহনির্মাণের আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট। পাত্ররা গৃহ নির্মাণে বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ব্যবহার করে। ঘরের ধরন অনুযায়ী ঘর তৈরির উপকরণ ভিন্ন হয়ে থাকে। পাত্রদের মধ্যে মাটির দেয়াল ও টিনের তৈরি ঘরের প্রচলন রয়েছে। এ ধরনের ঘর তৈরির উপকরণ হিসেবে তারা মাটি, টিন, নাট, বল্টু, পেরেক, কাঠ ইত্যাদি ব্যবহার করে। পাত্র এলাকায় মাটির দেয়াল ও শনের চালের ঘরের ব্যবহার লক্ষণীয়। মাটি নির্মিত দেয়াল, চাল তৈরির জন্য শন, বেত, পাতা, বাঁশ প্রভৃতি উপকরণ ব্যবহৃত হয়। অনেক ক্ষেত্রে বেত গাছের ছাল ও পাট ব্যবহার করতে দেখা যায়। পাত্রদের মধ্যে বেড়ার ঘর নামে আরেক ধরনের ঘরের প্রচলন রয়েছে। এ ঘর তৈরিতে তারা বাঁশ, পাটকাঠি, ইকর ইত্যাদি ব্যবহার করে। প্রথমে তারা ইকর বা পাটকাঠি মাটিতে বসানো বাঁশের শলার উপর রেখে উপরে আবার বাঁশের শলা রেখে শলাগুলোকে বেত পাতা দিয়ে বেঁধে বেড়া নির্মাণ করা হয়। এভাবে বেড়া তৈরির পর ঘরের দেয়ালে পিলার হিসেবে ব্যবহৃত কয়েকটি বাঁশের খুটির সঙ্গে তা বেঁধে দেয়া হয়। এরপর বেড়ার উপর মাটির প্রলেপ দেয়া হয়। মাটির প্রলেপ দেয়ালকে বৃষ্টির পানি হতে রক্ষা করে। ঘরের চাল পূর্বের ন্যায় তৈরি করা হয়। ঘর তৈরির এসব উপাদান পাত্ররা পাহাড় বা বাড়ির আশ-পাশে থেকে সংগ্রহ করে; অন্যথায় অন্যদের কাছ থেকে ক্রয় করে। এ ধরনের একটি মাঝারি ঘর তৈরি করতে পাত্রদের সময় ব্যয় করতে হয় পনের দিন থেকে প্রায় দু'মাস। পাত্রদের ঘরের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তাদের থাকার ঘরের সঙ্গে অন্যান্য ঘর, যেমন- রান্না ঘর, গোয়াল ঘর, জ্বালানি কাঠ সরবরাহের ঘর ইত্যাদি একটার পর একটা পাশাপাশি অবস্থিত। রান্না ঘরটি সাধারণত মূল ঘর বা থাকার ঘরের সঙ্গে থাকে। (ছবি: পরিশিষ্ট ৩.৪ দ্রষ্টব্য)

পাত্রদের ঘরের চাল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। প্রতিটি মূল ঘরের সঙ্গে থাকে একটি করে বারান্দা। পাত্রদের মধ্যে গৃহবন্টন ব্যবস্থা কৌতূহল উদ্দীপক। পিতার মৃত্যুর পর প্রত্যেক ছেলে পৃথক পৃথক ঘরের মালিক হয়। পাত্র সমাজের রীতি অনুযায়ী ছোট ছেলে পশ্চিমের ঘর অর্থাৎ সবচেয়ে ভাল ঘরটি পায়। বাকি ঘরগুলি অন্য ছেলেরা ভাগ করে নেয় অথবা অন্য কোথাও ঘর নির্মাণ করে নেয়। ঘর বন্টন বিষয়ে তাদের মধ্যে একটা প্রচলিত মিথ হলো ছোট ভাইয়ের পায়ের নিচে বড় ভাইয়েরা থাকবে না।

বর্তমান আধুনিক স্থাপত্য শিল্পের মাধ্যমে শহর কিংবা গ্রামে নতুন ও ভিন্নধর্মী দালান কোঠা তৈরি হচ্ছে। (ছবি: পরিশিষ্ট ৩.৫ দ্রষ্টব্য)। সে ক্ষেত্রে পাত্রদের মাটির ঘরে বসবাস এবং জীবনযাপন কৌশল তাদের সমাজের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। কারণ এ সংস্কৃতি হলো গ্রামীণ সমাজের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির একটি বিশেষ সামাজিক প্রতিচ্ছবি। অন্যদিকে পাত্রদের গৃহনির্মাণ কৌশল তথা নিজস্ব পদ্ধতিতে আবাসন ব্যবস্থা সামাজিক জীবনের একটি অবহেলিত নৃগোষ্ঠির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আর এ ধরনের ঐতিহ্যগত লোকজ আবাসন পদ্ধতি বর্তমান স্থাপত্য নৃবিজ্ঞানের গবেষণার বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে।

৯.৫ বিয়ে ও বিয়ে ব্যবস্থা

বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির বিয়ের ধরন ভিন্ন। এ প্রসঙ্গে শাহেদ ও অন্যান্য (২০১১) উল্লেখ করেছেন– 'বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর লোকেরা নিজ নিজ রীতি অনুযায়ী বিবাহকার্য সম্পন্ন করে থাকে। তাই সমাজ ও সংস্কৃতি ভেদে এর আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে নানাবিধ বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়' (শাহেদ ও অন্যান্য, ২০১১: ৪২)। পাত্র সমাজে বিভিন্নধর্মী বিয়ে রীতি প্রচলিত আছে। পাত্রদের বিয়েতে কয়েকটি ধাপ সম্পন্ন করতে হয়। এর মধ্যে নিম্নলিখিত ছয়টি ধাপ খুব গুরত্বপূর্ণ–

প্রথম, পান বা উনি: এ পর্বে বিয়ের প্রাথমিক আলোচনা ও দুই পক্ষের সম্মতি প্রকাশ গুরত্ব পায়।

দ্বিতীয়, পান দুয়ারানি: পুনরায় দুই পক্ষের সম্মতি প্রকাশ পায় এ পর্বে।

তৃতীয়, বাং ছা সিকুং তারিখ: এ পর্বে গ্রাম প্রধানের প্রতিনিধির সামনে সম্মতি প্রকাশ করা হয়।

চতুর্থ, জংতু সিন্দুর পয়রানিসহ ভাসা মাংগুনী: কনে সাজানো ও চিনি পানের আবেদন সম্পন্ন হয় এ পর্বে।

পঞ্চম, খালতি ভাসা: চিনি, পান বা অন্যান্য সামগ্রী প্রদানের পর্বকে বলা হয় খালতি ভাসা।

ষষ্ঠ, মারয়া: একে আবার অধিবাসও বলা হয়। বিয়ের আগের রাতকে পাত্র ভাষায় বলা হয় অধিবাস।

পাত্র সমাজে একক ও বহু বিয়েরীতি উভয়ই প্রচলিত থাকলেও একক বিয়েই পাত্রদের মধ্যে বেশি পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদিম পরিবারের ভিত্তি পাত্র সম্প্রদায়ের মত একক বিয়ে। অর্থাৎ 'এক পুরুষের সঙ্গে এক স্ত্রীর আজীবন মিলন। একক বিবাহের একটি আবেগপ্রবণ দিক আছে। এই আবেগ, দম্পতির মধ্যে গভীর ও অটল ভালবাসার সঞ্চয় করে' (ইসলাম, ১৯৭৪: ১০৩)। এ প্রসঙ্গে চক্রবর্তী (২০০০) বলেছেন– 'সীতাক্ষী ও 'তাইতাক্ষী'- এরূপ দুই ধরনের বিয়ে রীতির উল্লেখ করেছেন। আবার তিনি বলেন– 'সীতাক্ষী

বিয়ে হল বলপূর্বক বিবাহ যা 'ছাইভস্ম' বিয়ে হিসেবেও পরিচিত। 'সীতাক্ষী' বা 'ছাইভস্ম' বিয়ে পাত্র সমাজ ঘৃণা করে এবং পরোক্ষভাবে পরিহার করার চেষ্টা করে। 'তাইতাক্ষী' বিয়ে হিন্দুদের পাণিগ্রহণ বিয়ের সঙ্গে তুলনীয়। উল্লেখ্য যে আদিবাসী পাত্র সম্প্রদায়ের বিয়ের পুরানো রীতি বর্তমানে আর তেমন প্রচলিত নয়' (চক্রবর্তী, ২০০০: ৪৭)। বর্তমানে পাত্র সমাজে বুয়াচল ও বাম্নীচল নামে দুই ধরনের বিয়ে রীতিতে বিয়ের পর্ব সম্পাদিত হয়। এদের মধ্যে 'বুয়াচল হচ্ছে সনাতন পদ্ধতি। এই বিয়েতে ঠাকুরের প্রয়োজন হয় না ; বর কনে মালা বদলের মধ্য দিয়ে বিয়ের কাজ সম্পাদিত হয়। মালাটি অবশ্যই লেবুফুল দিয়ে গ্রথিত হতে হয়' (বিশ্বাস ও আসাদুজ্জামান, ২০০৭: ১২৮)। বাম্নীচল বিয়ে রীতি বুয়াচল বিয়ে রীতির বিপরীত প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। কারণ এই দুই বিয়ের রীতিতে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। পাত্ররা বর্তমানে এ বিয়ে রীতিকেই গ্রহণ করেছেন। তাঁরা 'বিয়ের আধুনিকায়ন ও সনাতন রীতির ধারা থেকে মুক্তি পেতে বাম্নীচল নামক বিবাহরীতি প্রবর্তন করে। এ রীতিতে ঠাকুর মন্ত্র পড়ে বর, কনেকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে (বিশ্বাস ও আসাদুজ্জামান, ২০০৭: ১২৮)। কেউ কেউ আবার বিয়ের পদ্ধতির ক্ষেত্রে 'সীতকই ও সাতপাকে বাধা বা সাব্যস্ত বিয়ের' (ম্রি, ২০০৭: ৪৩৭) উল্লেখ করেছেন। বর বা কনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাত্ররা তিন ধরনের পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ তিন ধরনের পদ্ধতি হলো-স্বয়ংবর, ইচ্ছাবর ও গণ্ডব্য। পিতা-মাতার ইচ্ছা অনুযায়ী বর-কনে নির্বাচনকে বলা হয় স্বয়ংবর। এ প্রথাই পাত্রসমাজে বেশি প্রচলিত। ছেলে বিয়ের উপযুক্ত হলে ছেলের বাবা মা উপযুক্ত মেয়ের সন্ধান করেন। তাঁরা বর-কনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে ঘটকের বেশি প্রয়োজনবোধ করেন না। বর-কনে নির্বাচনে তাঁদের রাশিমালাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিয়ের পূর্বে বর ও কনের রাশি ব্রাহ্মণের কাছে জমা দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণ রাশি গণনা করে অনুমতি দিলেই তাদের বিয়ে হয়। বর-কনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিছু সংস্কার মেনে চলা হয়, যেমন-একটি পাত্রে কিছু মদ এবং কনের নামে রাখা হয় এবং তিন দিন পর তা পরীক্ষা করা হয়। মদ টক হলে তবে সে বিয়ে অমঙ্গল বলে তা বাতিল করা হয়। আর মনঃপুত হলে বিয়ের দিন ধার্য করা হয়। ইচ্ছাবর হলো বর বা কনের ইচ্ছা অনুযায়ী নিজ ধর্ম বা অন্য ধর্মের কাউকে বিয়ে করা। নিজের আত্মীয় স্বজনকে না জানিয়ে নিজ ধর্মের কাউকে বিয়ে করাকে বলা হয় গণ্ডব্য। (ছবি: পরিশিষ্ট ৩.৬ দ্রষ্টব্য)

পাত্র সম্প্রদায়ের পাত্র-পাত্রী নির্বাচন অত্যন্ত চমকপ্রদ। ছেলে-মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাঁদের পিতা-মাতা তথা অভিভাবক এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কনে নির্বাচনের পর বরের বাড়ি থেকে কয়েকজন মহিলা কনের বাড়ি গিয়ে কন্যার হাতের রান্না খেয়ে আসেন এবং পছন্দ হলে কন্যার বাবা-মায়ে সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে দিন তারিখ নির্ধারণ করেন। পাত্ররা একে 'পান-চিনি' পর্ব বলে। বিয়ের আগের দিন হতে গান বাজনা শুরু হয়: এই রাতকে পাত্ররা 'আদিবাস' নামে অভিহিত করে থাকে। বিয়ের দিন সকালে ছোট দুটি মাটির কলস ও ছোট একটা প্লেটে বাতি জ্বালিয়ে ভাবি এবং বড়

বোন বরকে ছড়ায় (ডুবায়) গোসল করান। গোসল সম্পাদনের পর তাঁরা আর ঘরে প্রবেশ করেন না, আঙ্গিনায় যে কুঞ্জ সাজানো হয় তাঁর অভ্যন্তরে বসে থেকে লগ্ন অতিবাহিত করেন, সেখানে বসেই বর নিজের হাতে ছোট ভাই বোন এবং অন্যান্যদের নতুন কাপড়-চোপড় উপহার দেন। সেই কুঞ্জকে ঘিরেই রঙ্গিলারা লগনে মত্ত থাকেন এবং দুপুর বেলা বরের গায়ে হলুদের গুঁড়া মাখিয়ে পুনরায় গোসল করান। অতঃপর বড় বোনের স্বামী বরকে কাপড় পরায়, কনেকে কাপড় পরায় তাঁর ভাবী। বর অবস্থানের স্থানটিকে চালের গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া ও ধনিয়া গুঁড়া ইত্যাদি দিয়ে লেপে দেয়া হয়। ঐ জায়গায় বরকে বসিয়ে রঙ্গিলারা বিভিন্ন গান পরিবেশন করেন। (ছবি: পরিশিষ্ট ৩.৭ দ্রষ্টব্য)

অতঃপর কুঞ্জ থেকে বড় বোনের স্বামী বরকে কোলে করে এনে চকদালে (পালকিতে) বা গাড়িতে এনে তোলেন। এ সময় বর প্রথা অনুযায়ী আয়নার পানে তাকিয়ে স্বছবি দেখায় মগ্ন থাকেন। চার পাঁচজন বহনকারী চকদাল কাঁধে নিয়ে কনের বাড়ির দিকে যাত্রা করেন এবং বরযাত্রা হিসেবে অনেক আত্মীয়-স্বজন অংশ নেন। যাত্রার প্রাক্কালে গোল্লা বা পটকা ফোটানো হয়। গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর চকদালে বা গাড়ি থেকে বড় বোনের স্বামী কোলে করে নামিয়ে কন্যা নেই এমন একটি ঘরে বসান। তারপর শুরু হয় খাওয়া-দাওয়া পর্ব। খাওয়ার মাঝে মদ্যপান অত্যাবশ্যক। তারপর বর ও কনেকে একই কুঞ্জে দুটি চেয়ারে বসানো হয়। ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়ে এবং বরের চারপাশে সাতটি পাক দেন। মন্ত্রপাঠ ও মালা পরানোর পর ঠাকুর কন্যার কপালে সিঁদুর দেন এবং বর কনেকে নিজ বাড়িতে নিয়ে আসেন। রীতি অনুযায়ী স্বামীর বাড়িতে আসার পরের দিন স্বামী-স্ত্রী একে অপরের কনিষ্ঠ আঙ্গুল ধরে কুঞ্জের পাশে সাতটি পাক দেন। পাত্ররা একে 'সতীমঙ্গল' বলে। এরপর, স্বামী স্ত্রীর কাছ থেকে আড়াই দিনের জন্য নিজ বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। আড়াই দিন পর স্বামী প্রত্যাবর্তন করলে কন্যা লুটাতে কিছু পানি নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে স্বামীর হাত-পা লুটার পানি দিয়ে ধৌত করে টুপ জ্বালিয়ে গৃহে নিয়ে আসেন। আর এ রাতেই হয় তাঁদের বাসর রাত। পরের দিন নাপিত এসে স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই চুল কেটে দেন। অতঃপর স্বামী বাজারে গিয়ে মিষ্টি ও অন্যান্য বাজার নিয়ে আসেন এবং কনে স্বামীর বাড়িতে নিজ হাতে রান্না করেন। স্বামী তাঁর আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে নিয়ে স্ত্রীর রান্না করা খাবার খান। তারপর স্বামী তাঁর আত্মীয় স্বজন ও স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ি যান। পাত্ররা এ বিয়ে রীতির এ পর্বকে বলে 'বন নাইওর'। ঐদিনই তাঁরা বাড়ি ফিরে আসেন। বার দিন পর আবার স্বামী স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ি যান। এটাকে তাঁরা 'ফিরানইওর' বলে। পাত্রদের মধ্যে বিধবা বিয়ে রীতি প্রচলিত। তাঁদের সমাজে যৌতুক প্রথা ও কন্যাপণের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। তবে বিয়ের সময় কন্যার বাবা ইচ্ছে করলে বরকে হালের বলদ দিতে পারেন অথবা বর ও কন্যার জামা-কাপড়, আংটি, পোশাক-পরিচ্ছদ, থালচিক (থালা), লুটাচিক (ঘটি), নাহান সোনা (গলার স্বর্ণ) ইত্যাদি দিতে পারেন। কাসার থালা, কাসার বাটি ও কাসার ঘটি-এ

তিনটি বস্তু পাত্র বিয়েতে দেওয়া অত্যাবশ্যক। এছাড়া মেয়ের বাবা তার সামর্থ অনুযায়ী খাট, পালং, চেয়ার, টেবিলসহ ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্র দিয়ে থাকে। (ছবি: পরিশিষ্ট ৩.৮ দ্রষ্টব্য)

পাত্র সম্প্রদায়ের বিয়েতে কিছু বিধি-নিষেধ বিদ্যমান। পাত্র সমাজের সবাই এসব মেনে চলে। হিন্দুসমাজে বিয়ে সাধারণত মাসভিত্তিক হয়ে থাকে। একমাত্র পৌষ মাস ছাড়া অন্য যে কোন মাসে তাঁদের বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয়। এ মাসে বিয়ের আলাপ-আলোচনা নিষেধ। তাঁরা মনে করেন, পৌষ মাসে বিয়ে হলে দম্পতি অসুখী হতে পারে। আবার কোন কোন পাত্র সমাজে ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে বিয়ে নিষেধ বলে পরিগণিত। তবে এই দুই মাস বাদে বছরের বাকি মাসে সমাজ কর্তৃক বিয়ে স্বীকৃত হলেও পাত্র সমাজে ফাল্গুন মাসেই সর্বাধিক বিয়ে সম্পন্ন হয়ে থাকে। 'পাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তঃগোত্রীয় বিবাহ প্রথা প্রচলিত' (সুলতান, অনুল্লেখ:৭)। কোনক্রমেই নিজ গোত্রের মধ্যে বিয়ে হয় না। নিজ গোত্রের বাইরে গিয়ে বিয়ে করাকে পাত্র সমাজে নিষেধ করা হয়েছে। তাই নিজ গোত্র ব্যতীত অন্য গোত্রে বা নিজ গোত্রের রক্ত সম্পর্কের কোন আত্মীয়কে বিয়ে করে তবে তা গুরুতর অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী সমাজচ্যুত করা হয়। সমাজে একজন মেয়ে একাধিক পুরুষ বিয়ে করতে পারেন না। শ্যালিকাকে বিয়ে করাও পাত্র সমাজ অন্যায় বলে মনে করে। কারণ, তাঁদের মধ্যে একটি প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে 'শ্যালিকার ঘর খালি' অর্থাৎ কেউ তার শ্যালিকাকে বিয়ে করলে সে কখনও উন্নতি করতে পারবে না; দিন দিন তার অবস্থার অবনতি হবে। এ ছাড়া বড় ভাইয়ের স্ত্রীকে বিয়ে করাও পাত্র সমাজে নিষেধ। তাঁদের কাছে বড় ভাইয়ের স্ত্রী মায়ের সমান বলে পরিগণিত।

৯.৬ গোত্র বিভাজন

গোত্র ভিত্তিক বসবাস আদিম সমাজের বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের আদিবাসীরা নানা গোত্রে বিভক্ত। তাঁদের গোত্রের নাম যেমন বিচিত্র, তেমনি বিচিত্র গোত্রের প্রতীক (টোটেম) (তরু, ২০০৮)। পাত্র সমাজও বিভিন্ন গোত্রে বিভাজিত। পাত্র সমাজে দুটি গোত্র ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। একটি হলো আদিবাসী হিসেবে নিজস্ব গোত্র ব্যবস্থা এবং অন্যটি হিন্দু সমাজের গোত্র ব্যবস্থা। পাত্ররা প্রচার করেন যে, তাঁদের নিজস্ব গোত্র-ব্যবস্থাটি রাজা গৌরগোবিন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত (রহমান, ২০০৭)। সব গোত্রই সমমর্যাদাসম্পন্ন। সুলতান বলেছেন, 'অর্থনৈতিক কিংবা বংশগত কারণে উচ্চ নিম্ন এরূপ স্তর বিন্যাস নেই। পাত্র সমাজের মধ্যে বর্ণভেদ প্রথাও অনুপস্থিত: ধর্মে হিন্দু হলেও ব্রাহ্মণ কিংবা পুরোহিত শ্রেণীর অস্তিত্ব নেই' (অনুল্লেখ: ৪)। ইদানীং শিক্ষিত পাত্রদের কেউ কেউ নিজেদেরকে মহাপাত্র হিসেবে উল্লেখ করেন। ম্রি (২০০৭) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এ ব্যাপারে তাদের অনেকে বলেন যে, কয়েকটি জায়গার

কয়েকজন শিক্ষিত পাত্র নিজেদেরকে অন্যদের চেয়ে একটু উন্নত করে দেখানোর জন্য মহাপাত্র হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকেন' (পৃ. ৪৩১)। পাত্র সমাজে ১২ টি গোত্র রয়েছে- '১। তংরা ২। লংকিরই ৩। গাবরই ৪। আলই ৫। লংথুরই ৬। ঠুকরিরই ৭। থেকুলারই ৮। কেলাংরই ৯। টিপারই ১০। বারই ১১। পন বাবুই ১২। তংরা বারই' (সুলতান, অনুল্লেখ : ৪-৫)।

৯.৭ খাদ্যাভ্যাস ও পানীয়

এক সময় গভীর অরণ্যে বাসকারী পাত্ররা বনের উপর নির্ভরীল জীবন যাপন করত। বনের বিভিন্ন শিকারি জীবজন্তু ছিল তাঁদের প্রধান খাবার। তখন তাঁদের খাবারের তালিকায় ছিল কচ্ছপ, সজারু, হরিণ, খরগোশ, কুইচ্ছ্যা, শুয়োর প্রভৃতি। কিন্তু বর্তমানে বন কমে যাওয়ায় তারা পূর্বের মত শিকার করতে পারে না; ফলে বাধ্য হয়ে তারা সিলেটের অন্যান্য সমতল ভূমির জনগোষ্ঠির ন্যায় ভাত, মাছ, মাংস, রুটি ইত্যাদি খাবার খেয়ে থাকে। তবে এখনও তারা বন থেকে নানা ধরনের সবজি সংগ্রহ করে থাকে। এসব সবজির মধ্যে চাপলা, রুঠেঙ্গা, বেরু, গলন্তা, ফারু, লরগইচ্ছা, কুকুর, জিঙ্গি ইত্যাদি প্রধান।

পাত্ররা মদ পানে অভ্যস্ত। পাত্রদের তৈরি মদের দ্বিবিধ নাম রয়েছে-হান্ডি ও হাড়িয়া। এই মদ তৈরি করতে ১০৮ প্রকার ভেষজের প্রয়োজন হয় বলে পাত্ররা মনে করেন। এদের মধ্যে ভাতের সঙ্গে মইশালী, জ্যৈষ্ঠমধু, কুশিলা ও ধুতরাসহ অন্যান্য ভেষজ মিশিয়ে চারদিন রেখে দেন। চারদিন পর ঐ দ্রব্য দীর্ঘক্ষণ ফুটায়। ফলে সৃষ্টি হয় এক ধরনের মদ যা তারা পালা-পার্বণ, জন্মমৃত্যু সহ বিবিধ অনুষ্ঠানে ব্যবহার করেন।

'পাত্র সম্প্রদায়ের এই পানীয় তৈরি তাদের আদিবাসী চরিত্রের প্রকাশ' (চক্রবর্ত্তী, ২০০০: ৫৭)। সুলতান লিখেছেন-'এ সম্প্রদায়ের খাদ্যাভ্যাস নিম্নবর্গের বাংগালীদের অনুরূপ। তবে পানীয়ের ক্ষেত্রে তাদের কিছুটা স্বাতন্ত্র্য আছে। খর নামক বোনো বা হাড়িয়া মদ নিজেরা তৈরি করে নেয়। ঐ পানীয় প্রস্তুতে ১০৮টি বুনো ভেষজের প্রয়োজন হয় (অনুল্লেখ: ৭)। সর্বোপরি পাত্ররা ভাত, মাছ, খাসি, শূকর, খরগোশ, মোরগ, হাঁস, কবুতর, কাছিমের মাংস প্রভৃতি খেয়ে থাকে। 'তারা শুঁটকি ও শাকসবজি খান। তাদের কেউ কেউ নিজেদের তৈরি মদ্য পান করেন। তবে তাঁরা গোমাংস খান না। মাছ মাংসের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের ডাল খেতেও তাঁরা পছন্দ করেন। বন্য আলুও তাদের প্রিয় খাদ্য' (ম্রি, ২০০৭: ৪৩৩)।

৯.৮ ধর্ম বিশ্বাস ও রীতিনীতি

পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগোষ্ঠির ন্যায় পাত্রদেরও ধর্ম বিশ্বাস প্রবল। তবে তাঁদের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণায় দ্বৈতসত্তার উপস্থিতি বিদ্যমান। তাঁদের আদি বা প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস ছিল সর্বপ্রাণবাদে। বর্তমানে ধর্মচর্চায় তাঁদের সর্বপ্রাণবাদ ও সনাতন হিন্দুধর্মের সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়। তাঁরা মূর্তিপূজা না করে পাথরকে বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতীক মনে করে পূজা করেন। পাত্র ভাষায় এসব দেব-দেবীকে তাঁরা বিভিন্ন নামে অভিহিত করে থাকে। এ ধর্মচর্চা ও আরাধনায় তাদের ঐতিহ্যগত ধর্মীয় সংস্কৃতির দিকই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। পাত্রদের প্রধান দেবদেবীর মধ্যে রয়েছে মহাদেব, কালী, মনসা, লক্ষী, স্বরস্বতী, দেবী, দুর্গা প্রভৃতি। আবার আদি ধর্মানুসারে তাদের অন্যান্য দেব-দেবীর মধ্যে রয়েছে রূপসী দেবী। পাত্রদের জীবন-যাপনে ধর্ম অন্যতম নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। পশুপাখিকে পাত্ররা দেবতার বাহন হিসেবে গণ্য করে এবং এদের প্রতি অসম্মানকে তারা ধর্মবিরোধী কাজ বলে মনে করে। উদাহরণস্বরূপ, গরুকে তাঁরা দেবতার বাহন হিসেবে সম্মান দেখান।

৯.৮.১ *ধর্ম ও যাদুবিদ্যা*

পাত্রদের অলৌকিক বিশ্বাসের একটি হলো যাদুবিদ্যা। ভাল কাজের জন্য কেবল এ যাদুবিদ্যার অনুমতি রয়েছে পাত্র সমাজে। তবে যাদুর মাধ্যমে ক্ষতি সাধন করলে তার বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান হলো গণধোলাই বা অর্থজরিমানা।

৯.৮.২ *ধর্ম ও বিশ্বাস*

পাত্রদের ধর্মীয় আচারে নীতিকথা ও উপদেশাবলি বিধৃত হয়েছে। তাঁদের লিখিত ধর্মগ্রন্থ না থাকলেও ঐতিহ্যগত ধর্মচর্চায় তাঁদের সমৃদ্ধ টেক্সটের ইঙ্গিত রয়েছে। ধর্মীয় কাহিনীতে আত্মত্যাগের মহিমার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শ্রোতাকে অতীন্দ্রিয় স্বাদ আস্বাদনে সাহায্য করে। পূজা-অর্চনা পরিচালনা ছাড়াও অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং ব্যবহারিক জীবনে ধর্মগুরু বা ওঝাদের গুরুত্ব অপরিসীম। ধর্ম ও ম্যাজিক যেমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তেমনি ধর্ম ও ম্যাজিকের সঙ্গে গুরুপদবাচ্য ব্যক্তিদের সম্পর্কও অবিচ্ছেদ্য। কারণ পাত্র সমাজে জন্ম-মৃত্যু-যৌবন ইত্যাদি ভয়ের চেয়ে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, রোগ-জরা, ঋতুস্রাব, গর্ভসঞ্চার, যৌন-সম্ভোগ, আর্থিক অনটন প্রভৃতি ভয়কেও কম গুরুত্ব আরোপ করেন না। অতিপ্রাকৃতিক বিশ্বাস পাত্রদের মধ্যে প্রবল। এসব আলোচনা থেকে সহজেই প্রতিভাত যে, ধর্মের আদেশ, নিষেধ, নির্দেশ পাত্র সমাজকে প্রভাবিত করেছে।

৯.৯ পূজা-পার্বণ

পাত্ররা সনাতন ধর্মের অনুসারী। বর্তমানে তাঁরা হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন। ধর্মান্তরের ফলে পাত্রদের মধ্যে হিন্দু সংস্কৃতির অনেক কিছুই অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হলেও তাঁরা নিজস্ব আদিবাসী সংস্কৃতি রক্ষা করে চলেছেন। পাত্রদের প্রধান দেবদেবীর মধ্যে রয়েছে মহাদেব, কালী, মনসা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, দেবী, দুর্গা প্রভৃতি। তবে দুর্গা পূজাই তাঁদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। এ পূজা সর্বজনীনভাবে পালিত হলেও অনেক পরিবার মনসা দেবীর উদ্দেশ্যে এ পূজা পালন করেন। কর্তাইন পূজা কার্তিক ও গণেশ এ দুই ভাইয়ের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়ে থাকে। পাত্ররা মহাদেবের পূজা পালন করেন। আবার গর্ভবর্তী মা এবং সন্তান যাতে সুস্থ থাকে এ লক্ষে পাত্ররা থেংওইপইন পূজা পালন করেন। চোর-ডাকাতদের হাত থেকে ঘর-বাড়ি রক্ষার জন্য পাত্ররা পালন করেন রাখালুং বা গৃহদেবতা বা ঘর রক্ষাকারী পূজা। পাত্ররা বিশ্বাস করেন গৃহদেবতা বাড়ি রক্ষক হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকে। পাত্ররা ধানক্ষেত রক্ষার জন্য গুলংলারামুং নামে এক ধরনের পূজা উৎসব করেন। শনি দেবতাকে পাত্ররা দাঁড়িয়ে প্রণাম করেন। লাফাং দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য তারা কচ্ছপ দিয়ে পূজা করেন। পাত্রদের এসব পূজার কোনো কোনোটি সম্পাদনের জন্য ওসাই বা পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। এসব পূজার সময় তাঁরা কবতুর, চাল, কলা, মাছ, হাঁড়িয়া ইত্যাদি প্রসাদ হিসেবে অর্পণ করেন। বিয়ের সময় যেন নতুন দম্পতি সুখে-শান্তিতে থাকেন এবং তাঁদের সন্তান যাতে বিদ্যা-বুদ্ধিতে ভালো হয়, সে জন্য তাঁরা সরস্বতী পূজা পালন করেন। এ পূজা অনুষ্ঠানের জন্য কোনো নির্দিষ্ট দিনক্ষণ না থাকলেও সাধারণত মাঘ মাসের ২২ তারিখে পাত্ররা সবাই মিলে এ পূজা আয়োজন করেন।

৯.১০ মৃতের সৎকার

মৃত্যু মানবের অনিবার্য সত্য। মৃত্যু উপলক্ষে বিভিন্ন জাতি নানা রীতি ও আচার পালন করে। এ প্রসঙ্গে হাসান ও অন্যান্য (২০১১) বলেন–'একজন মানুষের জীবনচক্রের শেষ অধ্যায়টি হলো মৃত্যু। তাই মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও সমাজে বসবাসকারীদের নিকট এ অধ্যায়টি নানাবিধ কারণে গুরুত্বপূর্ণ। অতএব মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি কামনার্থে বিভিন্ন সমাজে রয়েছে নানাবিধ লোকায়ত আচার-অনুষ্ঠান (হাসান ও অন্যান্য, ২০১১: ৭৫)। মৃতদেহ দাহ করা ও কবর দেওয়া উভয় রীতিই পাত্র সমাজে প্রচলিত। ক্ষেত্রগবেষণায় অবগত হওয়া গেছে যে, গভীর রাতে কেউ মৃতুবরণ করলে সাধারণত তা দাহ করা হয় না; সেক্ষেত্রে মৃতদেহ কবর দেয়ার বিধান রয়েছে পাত্র সমাজে। তবে কেউ মারা যাওয়ার পূর্বে মৃতদেহের শেষ পরিণতি সম্পর্কে আত্মীয়-স্বজনদের অবহিত করলে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সৎকার করা হয়। মৃত্যু সংবাদ দেয়ার জন্য মৃত ব্যক্তির বাড়ি থেকে যদি কোনো ব্যক্তি প্রেরিত হয়, তবে যে বাড়িতে সংবাদ দেবে সে বাড়িতে না উঠে রাস্তায় দাঁড়িয়ে জোর গলায় আওয়াজ করে সংবাদ দেয়ার

রীতি পাত্র সমাজে প্রচলিত। মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন মৃত ব্যক্তিকে একনজরে দেখার জন্য ও সৎকারের জন্য আগমন করেন। নিয়মানুযায়ী তাঁরা একমুষ্টি চাল ও হাঁড়িয়া নিয়ে আসেন।

৯.১০.১ শ্মশানে নেওয়ার রীতি

পাত্রদের প্রতিটি গ্রামে শশ্মানঘাট ও কবরস্থান রয়েছে। মৃত্যুর পর শশ্মানে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয়-বয়স্ক ব্যক্তিরা এ মৃতদেহ বহণ করে। গর্ভবর্তী রমণী ও মৃতব্যক্তির স্বামী মৃতদেহ স্পর্শ করতে পারেন না। মৃতদেহ বহন করার সময় তারা সমস্বরে বলতে থাকে- 'হরি হর হে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ যাদবায় মাদবায় কেশবায় নমঃ'। অনেকের ধারণা পাত্ররা শ্রী চৈতন্য প্রভাবিত হয়ে এ মন্ত্র পাঠ করেন।

৯.১০.২ মৃতদেহ দাহ করা

মৃতদেহ কবর দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে সবাই এতে অংশগ্রহণ করেন এবং সব প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষেরা এক মুষ্টি করে মাটি কবরে দেন-এটা তাঁদের বাধ্যতামূলক রেওয়াজ। মৃতদেহ দাহ করার প্রক্রিয়া ব্যতিক্রমধর্মী। মৃতদেহ দাহ করার সময় তিনটি গোত্রের প্রতিনিধিদের উপস্থিতি একান্ত কাম্য। মৃতের মাথা দক্ষিণমুখি করে শশ্মানে রাখা হয় এবং অতঃপর মৃতব্যক্তির গোত্রের যেকোন ব্যক্তি মুখাগ্নি করতে পারে। এরপর তিনটি গোত্রের প্রতিনিধি পৃথকভাবে তিনবার আগুন জ্বালিয়ে দেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, মৃত্যুর পর ঐ ব্যক্তির আত্মা সৃষ্টিকর্তার নিকট একটি পাখি হিসেবে খাঁচায় থাকবে এবং সৃষ্টিকর্তা একদিন ঐ আত্মাকে খাঁচামুক্ত করবেন। পাত্ররা আরো বিশ্বাস করেন যে, মৃত ব্যক্তির আত্মা খাঁচামুক্ত করার জন্য চাল ও হাণ্ডি (পাত্রদের প্রস্তুতকৃত মদ) প্রয়োজন। পাত্ররা এসব উপাদেয় বস্তু শশ্মানে উৎসর্গ করে এবং তাঁদের ভাষায় প্রার্থনা করে। প্রার্থনার মর্মার্থ হলো, যেহেতু ঐ ব্যক্তি মৃত সে জন্য তার দৃষ্টি পাত্রদের ওপর যেন না পড়ে। গ্রামের সব অনাচার যেন এই মৃত ব্যক্তি দক্ষিণ সমুদ্রে নিয়ে যায়। মৃতের গোত্রের সদস্যরা মৃত্যুর পর থেকে দশদিন অশৌচ পালন করেন এবং এসময় মাছ-মাংস খাওয়া নিষেধ বলে তা তাঁরা পরিহার করেন। নয়দিন পর মৃত ব্যক্তিকে পূজা করা হয়। এ সময় মৃত ব্যক্তির গোত্রের বাইরের কোন সদস্য মৃতের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে এবং মন্ত্রপাঠ করে তা মৃতের প্রতি উৎসর্গ করেন। এর মর্মার্থ হলো-মৃত ব্যক্তির আত্মা যেন তার পরিবারের কাছে অধিক খাদ্য দাবি না করে। দশদিনের দিন শুদ্ধ হবার অনুষ্ঠান করা হয়। শুদ্ধ হবার দিন মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা উপবাস করেন। তিনমাস পর পাত্ররা পালন করেন থিরাম দেবতার পূজা। এ ধরনের পূজা পূর্বপুরুষের পূজা এবং পূজার প্রার্থনায় জানানো হয় পূর্বপুরষেরা যেন এ পৃথিবী থেকে মৃত্যুকে নিয়ে যায় এবং রক্ষণাবেক্ষণ করে। থিরাম দেবতার পূজা উপলক্ষে মৃতের গোত্রের সবাইকে ভোজের মাধ্যমে আপ্যায়ন করা হয়। উল্লেখ্য, পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম বর্তমানে পাত্ররা সমভাবে পালনে ব্যর্থ হচ্ছেন অর্থনৈতিক কারণে।

৯.১০.৩ শ্রাদ্ধ প্রক্রিয়া

মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ দেয়ার রীতি পাত্র সমাজে প্রচলিত রয়েছে। মৃত ব্যক্তির এগার দিনের দিন শ্রাদ্ধ দেয়া হয়। শ্রাদ্ধের দিন গ্রামের সমাজের সবাইকে দাওয়াত দেয়া হয়। সকালে পুরোহিত এসে শ্রাদ্ধের কাজ শুরু করেন। সকালে ছেলেরা সবাই স্নান করে এবং গ্রামের মহিলারা একত্র হয়ে রান্না-বান্না করেন। ব্রাহ্মণের কাজ শেষ হলে পাত্র পুরোহিত দুধ, দই, ফলমূল, ফুল, দক্ষিণা দিয়ে ঠাকুরের আসন তৈরি করেন। তারপর শুরু হয় কীর্তন। কীর্তনের আসরে সবাই মিলে কপালে চন্দন দেন। দূরের আত্মীয়-স্বজনকে বিকেলে খাওয়ানো হয়। বাঁশ বা পিঁড়ি দিয়ে খাওয়ার জন্য বসার ব্যবস্থা করা হয়। সন্ধ্যায় আরতী গান গেয়ে পঞ্চবাতি জ্বালিয়ে নিতে হয়। মৃতের ছেলেরা এই বাতি জ্বালায়। যদি মৃতব্যক্তির পাঁচজন ছেলে মেয়ে না থাকে তবে মেয়ের জামাই বা ভাতিজা এই বাতি জ্বালানোর অনুমতি পান। এরপর পাত্র রীতি অনযায়ী দইয়ের পাতি ভাঙতে হয়। দইয়ের পাতিল ভেঙ্গে ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে তারপর সবার চরণধুলি গ্রহণ করেন ঐ পাঁচজন গোসল করার অনুমতি পান। তারপর ঘরোয়া বৈঠকের মত বসে সবাইকে উপদেশ বাণী শুনানো হয়। সত্য-অসত্যের ভেদ, ন্যায়- অন্যায়ের সুফল ও কুফল, ভালো কাজ ও মন্দকাজের ফল ও পরিণাম, মানুষ হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য, মূল্যবোধ, আদর্শ ইত্যাদি প্রতিপাদ্য হলো এই উপদেশের মূল সুর। এরপর শ্রাদ্ধ শেষ বলে ঘোষণা দিলে সবাই নিজ নিজ বাড়িতে বা গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

৯.১১ পাত্রদের পোশাক

কোনো সম্প্রদায়ের বস্তুগত সংস্কৃতির যেসব দিক রয়েছে তার মধ্যে পোশক অন্যতম। সাধারণত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি সম্প্রদায় তাঁদের ঐতিহ্যগত পোশাক পরিধান করে। পাত্র ভাষাসম্প্রদায় এর ব্যতিক্রম নয়। পাত্ররা সাধারণত লুঙ্গি, গামছা, লেংটি, প্যান্ট, ধুতি, শাড়ি, ব্লাউজ, পায়জামা, কামিজ ইত্যাদি পরিধানে অভ্যস্ত। আদিতে পাত্ররা লেংটি ব্যবহার করত। এ সংখ্যা বর্তমানে কমে গেছে। বয়স্ক ও নিরক্ষর এবং দরিদ্র পাত্রদের মধ্যে এখনও এই লেংটির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। পাত্র শিশুরা তাদের সম্প্রদায়ের তৈরি ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিধান করে (ছবি: পরিশিষ্ট ৩.৯ দ্রষ্টব্য)।

৯.১২ সামাজিক বিধি-নিষেধ

স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন কাজ করার যে সব বিশ্বাস, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান পূর্ব শর্ত হিসেবে কাজ করে, তাকে বলা হয় সামাজিক বিধি-নিষেধ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় পাত্র সম্প্রদায়েরও সামাজিক বিধি-নিষেধ বিদ্যমান। এসব বিধি নিষেধের যেমন ইতিবাচক দিক রয়েছে, তেমনি রয়েছে নেতিবাচক দিক। পাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে এসব প্রচলিত বিশ্বাসের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ গুরুত্বপূর্ণ-

৯.১২.১ *ধর্মীয় ক্ষেত্রে*

পাত্রদের ধর্মগ্রন্থের নাম গীতা। তাঁরা রামকৃষ্ণ মিশনের অনুসারী। রামকৃষ্ণের অনুসারীর মধ্যে পিতা-মাতা মারা গেলে যেমন শ্রাদ্ধ করে, তেমনি গুরু মারা গেলেও শ্রাদ্ধ করেন। এ শ্রাদ্ধের সময় হলো সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যা। তিন অবস্থায় পাত্ররা দেবতা ঘরে প্রবেশ করতে পারেন না। এগুলি হলো-

ক) অপবিত্র পোশাক পরিধান করে

খ) মেয়েদের সন্তান প্রসবের ১১ দিনের মধ্যে

গ) মেয়েদের বয়ঃপ্রাপ্ত সময়ে

পাত্ররা বিশ্বাস করেন যে বেল গাছের ডাল, পাতা এবং ফুলগাছ আগুনে পুড়ানো নিষেধ। তুলসী পাতা দিয়ে তাঁরা পুজো করেন এবং এ পাতা যেকোন স্থানের ফেলতে পারেন না; একটি নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার বিধান রয়েছে। কারণ তাঁদের বিশ্বাস এসব পাতা পায়ে স্পর্শ করলে পাপ হবে। শনি পূজা পাত্ররা ঘরের বাইরে পালন করেন। এ পূজার প্রসাদ খেয়ে হাত ধৌত না করে কেউ গৃহে প্রবেশ করতে পারেন না। পূজা দেয়ার সময় অন্য ধর্মের কেউ স্পর্শ করলে তা শুদ্ধতা হারায়; ফলে পুনরায় তাঁদেরকে পূজা করতে দেয়া হয়।

৯.১২.২ *বিয়ের ক্ষেত্রে*

নিজ সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ে করা পাত্রসমাজে গ্রহণযোগ্য নয়। আন্তঃগোত্রীয় বিয়ে ব্যবস্থাই পাত্রদের মধে বিধেয়। স্বগোত্র বিয়ে প্রথাও পাত্রসমাজে নিষেধ। অন্য সমাজে বিয়ে করলে তাকে পাত্র সম্প্রদায় হতে পরিতাজ্য করা হয়। রহমান (২০১৭: ৮২) এ প্রসঙ্গে বলেন–

> পাত্রদের নিজ গোত্রের বাইরে বিয়েকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই এ সমাজে যদি কেউ নিজ গোত্র ব্যতীত অন্য গোত্রে বা নিজ গোত্রের রক্ত সম্পর্কের কোন আত্মীয়কে বিয়ে করে তবে তা গুরুতর অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী সমাজচ্যুত করা হয়।

বাবা-মার অনুমতি ব্যতিরেকে কোন পাত্র বিয়ে করতে পারেন না। এ নীতির ব্যত্যয় ঘটলে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয় এবং পিতার উত্তারিধকার হতে তাকে বঞ্চিত করা হয়। এক মেয়ের একই সঙ্গে একাধিক স্বামী থাকতে পারে না। বিধবা বিয়ে রীতি পাত্র সমাজে প্রচলিত; তবে কৃতদার পুরুষের সঙ্গে তাকে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। পাত্ররা সমাজে সাধারণত ফাল্গুন মাসে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। চৈত্র ও ভাদ্র মাসে বিয়ে করা সম্পূর্ণ নিষেধ। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে বিবাহিত নতুন বউকে বাপের

বাড়িতে থাকতে হয়। কারণ পাত্ররা বিশ্বাস করেন, এ মাসে শ্বশুর বাড়ি পানি গায়ে লাগলে তার অমঙ্গল হয়।

৯.১২.৩ খাদ্যের ক্ষেত্রে

হিন্দুধর্মের ন্যায় পাত্র ধর্মেও গরুর মাংস খাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। বাম হাত দিয়ে পানি পান করাকে পাত্ররা অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে। সপ্তাহের প্রতি রবিবারে তারা নিরামিষ খাবার খায়। মাংস ও ডিম খাওয়া হতে ঐদিন তারা বিরত থাকে। গৃহপালিত শূকরের মাংস পাত্ররা খায় না তবে বন্য শুকর শিকার করে সবাই ভাগ করে খায়।

৯.১২.৪ জন্ম ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে

গর্ভবতী মহিলাদের উদরের বাচ্চার গায়ে কাল বাতাস লাগতে পারে এ কারণে পাত্র সমাজে গর্ভবতী মহিলাদের বাইরে যাওয়া নিষেধ। তারা মনে করে যে এতে বাচ্চা বিকলাঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কোন মহিলার বাচ্চা প্রসবের তেরদিন পর্যন্ত আলাদা থাকার বিধান পাত্র সমাজে মান্য। ঐতরদিন সে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ব্যতীত বাইরে আসতে পারে না। পাত্রদের বিশ্বাস অনুযায়ী মৃতদেহ পুড়ে সৎকার করাই শ্রেয়। কিন্তু অনেক সময় আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে তাঁরা মৃতদেহ পুতে রাখে। মৃত ব্যক্তির স্ত্রী ও সন্তানেরা অবিস্য পালন করেন; ১৩ দিন পর শ্রদ্ধ করতে হয়। এ সময় তাঁরা ভাত খেতে পারেন না। শুধু এক বেলা কলা, চিঁড়া, গুড় ও ফলমূল খেয়ে থাকে।

৯.১২.৫ শিশুর ক্ষেত্রে

ছেলে শিশু জন্মের ছয়দিন এবং মেয়ে শিশু জন্মের নয়দিন অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত মা ব্যতীত কেউ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। এ নির্ধারিত সময় অতিক্রান্তের পর পিতা এসে তাদের চুল কেটে দেয়। এরপর শিশুকে গোসল করিয়ে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজের কাছে গ্রহণীয় করে তোলা পাত্রসমাজে প্রচলিত প্রথা। শিশুকে কালি ফোটা না দিয়ে বাইরে নিয়ে যাওয়া নিষেধ। তারা বিশ্বাস করে, এ ফোটা ব্যতীত শিশুর উপর কোন অশুভ শক্তির প্রভাব পড়তে পারে।

৯.১২.৬ কাজের ক্ষেত্রে

কোন মহিলা স্বামীর জীবদ্দশায় বাড়ির বাইরে গিয়ে কোন কাজ করতে পারে না। অবিবাহিত মেয়েদের ক্ষেত্রেও এই বিধি আরোপিত।

৯.১২.৭ সামাজিক ক্ষেত্রে

পাত্রদেরকে সমাজের অনেক বাধা নিষেধ মেনে চলতে হয়। পাত্ররা পূর্বদিকে প্রার্থনা করেন বলে পূর্বদিকে পা রেখে তাঁরা ঘুমান না। উত্তর দিকে মাথা রেখে ঘুমানোও পাত্রসমাজে নিষেধ। তাঁরা বিশ্বাস

করেন যে এর ফলে সংসারের অমঙ্গল হয়। রান্নার সময় মহিলারা জুতা পরিধান করতে পারেন না। পাত্রদের সাংস্কৃতিক জীবন আলোচনা করে তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সারাংশ নিরূপণ করা যেতে পারে এভাবে–

১। পাত্র সমাজে এখনও টোটেম ও ট্যাবুর অপ্রতিহত প্রভাব রয়েছে। বিশেষ প্রজাতির প্রাণি কিংবা বিশেষ প্রজাতির বৃক্ষের প্রতি তাঁদের রয়েছে এক ধরনের আনুগত্য। পুরুষানুক্রমে আগত কিছু কিছু আচার প্রথাকেও তাঁরা নিষ্ঠার সাথে মেনে চলেন।

২। তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কার প্রবণতার কারণে এক ধরনের জড়তা সক্রিয় রয়েছে। নতুন কিছু গ্রহণের ক্ষেত্রে তা প্রবল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

৩। সরলতা, বিশ্বাস প্রবণতা এবং আমোদপ্রিয়তা তাদেরকে দিয়েছে এক ধরনের নিরুদ্বিগ্ন জীবনের নিশ্চয়তা। তাদের নৃত্য, গীত, খেলাধুলা ও হাসি আনন্দ তাদের জীবনে মতই অকৃত্রিম ও নির্ভেজাল।

৪। পাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে চিরায়ত পোশাক পরিচ্ছদের প্রচলন আজও অব্যাহত রয়েছে। তাঁদের স্বনির্ভরতাও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

৫। ভাত, মদ ও মাংস প্রায় প্রায় পাত্রদের প্রিয় খাদ্য। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধি-নিষেধও কার্যকর রয়েছে।

৬। পাত্রদের মধ্যে পুনর্জন্ম ও পূর্ব-পুরুষদের উদ্দেশ্যে পূজা-পার্বণ প্রচলিত আছে।

৭। বর্তমানে হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী প্রায় সব পাত্র ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি আস্থাশীল। তবে প্রথা অনুযায়ী তাঁদের ধর্মগুরু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

৮। সিলেটের পাত্র সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রায় ক্রমশ পরিবর্তন আসছে। তাঁদের মধ্যে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতিধারা বেশ শ্লথ।

৯.১৩ অর্থনৈতিক অবস্থা ও পেশা

এক সময় পাত্রদের প্রধান পেশা ছিল অরণ্যের ফলমূল আহরণ, পশুশিকার ও কয়লা বিক্রি। বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে তা বাজারে বিক্রি করাও ছিল পাত্রদের জীবিকার অন্যতম উপায়। দলবদ্ধভাবে বন্যপশু শিকার করে তা গোত্রের সদস্যদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়ার প্রথাও পাত্রসমাজে প্রচলিত ছিল। বর্তমানে বনজঙ্গল কেটে ফেলার ফলে পূর্বের ঐতিহ্যগত পেশার পরিবর্তন হয়েছে। এখন পাত্ররা কৃষিকাজ ও অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত হয়েছেন। সুলতান (অনুল্লেখ: ৩) লিখেছেন,

> পাত্ররা কৃষিকাজকে প্রধান জীবিকা রূপে গ্রহণ করেছে। জমি চাষাবাদের পদ্ধতি বাংগালীদের অনুরূপ। তবে জমিতে নারী পুরুষ উভয়ই শ্রম দান করে থাকে। পাশ্ববর্তী বন জংগল থেকে

Dhaka University Institutional Repository

জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করা এবং সে কাঠ পুড়িয়ে অংগার তৈরি করে সিলেট শহরে যোগান দেয়াও তাদের আরেকটি অন্যতম জীবিকা।

এ বিষয়ে মোহান্ত (১৯৯৮: ৬০) আরও লিখেছেন–

> পাহাড় অঞ্চলের আবাদী জমির উপর নির্ভরশীল পাত্র সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল মোটামুটি খাওয়া পরার মত স্বচ্ছল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সিলেটের এ এলাকায় চা চাষের সূত্রপাত হলে এ সম্প্রদায়ের বিপর্যয় শুরু হয়। উপত্যাকার অধিকাংশ ভূসম্পত্তির মালিক পাত্ররা চাবাগান সম্প্রসারণের কারণে তাদের ফসলী জায়গা পরিমাণ খুইয়ে বসে। ইংরেজ চা-কররা কোনরূপ ক্ষতিপূরণ ছাড়াই তাদের ভূ-সম্পত্তি দখল করে নেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এ এলাকায় চা চাষ শুরু হলেও সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া চালু থাকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত। খাদিমনগর, কালাগুল, পুঁটিছড়া, কেয়াছড়া প্রভৃতি চা বাগান পাত্র সম্প্রদায়ের ফসলী জমি, ভিটেমাটি উচ্ছেদ করে গড়ে ওঠে। পাত্র সম্প্রদায়ের বৃদ্ধদের মুখে শোনা যায় যে, একবার সংঘবদ্ধ পাত্ররা ইংরেজ চা-করদের বিরুদ্ধে মামলা পর্যন্ত দায়ের করেছিল, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। পুঁটিছড়া চা বাগানের ইংরেজ চা-কর ওয়াকার সাহেবের অত্যাচারের কথা আজো অনেক বয়োবৃদ্ধ পাত্র গল্পচ্ছলে স্মরণ করে থাকেন। (ছবি: পরিশিষ্ট ৩.১০ দ্রষ্টব্য)

৯.১৪ উপসংহার

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে পাত্রদের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে লক্ষণীয় পরিবর্তন এসেছে। তবুও তাঁরা নিজেদের সংস্কৃতি বিকাশে বদ্ধপরিকর। কারণ নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশ ব্যতীত তাঁদের উন্নয়ন সম্ভব নয়। পাত্রদের উন্নয়নে প্রয়োজন তাদের সংস্কৃতির সাবলীল বিকাশ। তাঁদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে হলে জাতীয় সংহতিকরণের (national integration) সাথে তাঁদের যুক্তি তথা ভাগ্যোন্নয়নের প্রক্রিয়াকে (the process of their emancipation) সম্পৃক্ত করাও জরুরি। সার্বিক বিবেচনায়, ক্রমক্ষয়িষ্ণু পাত্র সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি বর্তমানে হুমকির সম্মুখীন। এ অবস্থার উত্তরণের জন্য পাত্র সংস্কৃতির স্বাধীন চর্চা অব্যাহত রাখার কোনো বিকল্প নেই।

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায়

পাত্র শব্দভাণ্ডার: সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ

মানুষ ভাষার সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে ভাব আদান প্রদান করে। ভাষার চারটি মৌলিক উপাদানের (ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ও অর্থ) মধ্যে শব্দ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। ভাষার এই শব্দ ব্যবহারের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। সংস্কৃতির চারটি মৌলিক উপাদানের (ভাষা, মূল্যবোধ, আদর্শ ও প্রতীক) মধ্যে ভাষা ও প্রতীক এই উপাদান দু'টির সঙ্গে শব্দের আলোচনার সাযুজ্য বিদ্যমান। শব্দের সমন্বয়েই বাক্য তৈরি হয় এবং ভাষার বাক্যই ভাব প্রকাশ করে থাকে। কোনো ভাষার শব্দ মানুষের নিজস্ব সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয়। দানেশি এ বিষয়ে বলেছেন–'It is no exaggeration to say that the very survival of civilization depends on the preservation of words' (Danesi, 2004: 20)।

ভাষার শব্দমাত্রই সংস্কৃতি নির্ভর; অর্থাৎ সংস্কৃতির নিয়ম, বিধি-নিষেধ অনুসরণ করেই এসব শব্দাবলি কোনো নির্দিষ্ট ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সত্যিকার অর্থে যথার্থ সংজ্ঞাপন বলতে কতগুলো শব্দের উপযুক্ত ব্যবহারকে বুঝায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শব্দের মূল অর্থ এবং সংস্কৃতি প্রভাবিত ব্যঞ্জনার্থ- এদ্বিবিধ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সংজ্ঞাপন সম্পন্ন হয়ে থাকে। কাজেই সত্যিকার সংজ্ঞাপনের জন্য একজনকে এ দ্বিবিধ প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ প্রসঙ্গে স্যাপির-হোর্ফের 'ভাষিক আপেক্ষবাদে'র উল্লেখ করা যায়। নাথ (১৯৯৯: ৫২) এ বিষয়ে উল্লেখ করেন-

> ভাষিক আপেক্ষিকতাবাদের মতে কোনো ভাষীর ভাষা নির্ধারণ করে দেয় তার জগৎ সম্বন্ধে ধারণা বা বিশ্ববীক্ষা (weltanschauung)। অর্থাৎ ভাষার শব্দভাণ্ডার এবং ব্যাকরণ ভাষীকে জগৎ চিনতে শেখায়। একে স্যাপির- হোর্ফ উপাত্ত (Sapir-Whorf hypothesis) বলা হয়ে থাকে। এডওয়ার্ড স্যাপির প্রথমে একে সূত্রায়িত করেন, পরে তার ছাত্র বেঞ্জামিন লি হোর্ফ তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। স্যাপিরের মতে ভাষাই সামাজিক বাস্তবতার (social reality) নিয়ন্ত্রক। স্যাপির ভাষা এবং সংস্কৃতির পারস্পরিক ক্ষেত্র নিবদ্ধ রাখেন শব্দের স্তরে, তার ছাত্র তা বিস্তৃত করেন, ভাষার সংগঠনের তথা ব্যকরণের ক্ষেত্রে।

স্বদেশ ভাষার শব্দভাণ্ডারকে তিনভাগে ভাগ করেছেন-

1) First a core vocabulary appropriate to the language family is established. Swadesh claimed that the list should generally contain words such as bird, dog, skin, blood, bone, drink, eat, etc, which referred to concepts that probably exit in all languages.

Dhaka University Institutional Repository

2) Culturally biased words, such as the names of specific kinds of plants or animals, are to be included in the core vocabulary only if relevant in the analysis of a specific language family.
3) The core vocabulary is then assessed as to the number of cognates it reveals between the languages being compared, allowing for sound shifts and variation (Swadesh, 1951: 18).

উপরিউক্ত আলোচনার সূত্র ধরে বলা যায় যে, পাত্র ভাষার শব্দভাণ্ডারের সঙ্গে পাত্রদের প্রাত্যহিক জীবণাচারণের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। কারণ এসব শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমেই পাত্ররা পারিবারিক, সামাজিক, সাংগঠনিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি কাজ সম্পাদন করে থাকে। এসব শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তারা সংস্কৃতির বহুবিধ সংশ্রয় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। পাত্র ভাষার শব্দের সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যায় বস্তুগত সংস্কৃতি ও অবস্তুগত সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান উল্লেখ করা হয়েছে এবং এসব উপাদান কীভাবে শব্দের অর্থকে প্রভাবিত করেছে সে বিষয়টিও আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

১০.১ সামাজিক সৌজন্যবোধ (social greetings) **নির্দেশক শব্দ**

সৌজন্যবোধ হলো এক ধরনের সংজ্ঞাপন যা সম্পাদিত হয় ব্যক্তির উপস্থিতি অন্যের নিকট জানান দেওয়ার জন্য, অন্যকে আকৃষ্ট করার জন্য অথবা একজনের সঙ্গে আরেকজনের সম্পর্ক কেমন নির্দেশ করার জন্য। একজনের সঙ্গে অন্যজনের সামাজিক মর্যাদা আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে কেমন তা বুঝাতে সৌজন্যবোধ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অস্টিন বলেছেন- 'There is widerspread evidence that greetings are an important part of the communicative competence necessary for being a member of any speech community' (Austin, 1963: 33)। দৈনন্দিন জীবনে পথচলায়, কাজকর্মে, দেখা-সাক্ষাতে, কথোপকথনে এই সৌজন্যবোধের উপযোগিতা রয়েছে। সৌজন্যবোধ সংস্কৃতি নির্দিষ্ট এবং তা সংস্কৃতি ভেদে ব্যক্তির সম্পর্ক, পদমর্যাদা অনুযায়ী পৃথক হয়। পাত্র ভাষায় যেসব সামাজিক সৌজন্যবোধ নির্দেশক শব্দ ব্যবহৃত হয়, তা নিচে আলোচনা করা হলো-

১. কারো সঙ্গে দেখা হলে পাত্ররা বলে- (বয়সে বড় হলে) রাম রাম ওকাল (আসসালামু আলাইকুম, নালিং মাই দাউকাং? (আপনি কেমন আছেন?)
২. প্রত্যুত্তরে পাত্ররা বলে- রাম রাম
৩. বিদায় নেয়ার সময় পাত্ররা বলে- হাই ইয়াংলো নালিং/ নাং মাই দাদই/ মাইরা দাদই (আবার দেখা হবে, ভালো থাকুন বা থাকো)
৪. কারো শুভ কামনায় পাত্ররা বলে- নাং মাইরা চাদই চলিদই/ ইংয়্যাশই মাইরা দাদই (তোমার ভবিষ্যৎ ভালো হোক)।

৫. কোথাও যাওয়ার সময় পাত্ররা বলে- হাই আংলো (আমি আসছি)।

৬. ইশ্বরকে উদ্দেশ্যে করে পাত্ররা বলে- হরিবল হরিবল

৭. কাউকে ধন্যবাদ দিতে পাত্ররা বলে- নাং ইংয়্যা শই মাইরা উনা/ নাং আকল ইশনা (তোমাকে ধন্যবাদ)

৮. কাউকে নমস্কার জানাতে পাত্ররা বলে- (বয়সে বড় হলে) রাম রাম ওকাল (আসসালামু আলাইকুম, নালিং মাই দাউকাং? (আপনি কেমন আছেন

৯. আবার দেখা হবে এই অর্থে পাত্ররা বলে- ইংয়্যাশই খুনা (আবার দেখা হবে)।
(ছবি: পরিশিষ্ট ৩.১১ দ্রষ্টব্য)

১০.২ গোত্র বিভাজন সংক্রান্ত শব্দ

প্রাচীনকাল থেকেই সমাজ প্রথা ছিল গোত্র নির্ভর। তাই বলা হয়ে থাকে আদিম পরিবারের স্বাতন্ত্র্যসূচক পদবি নেই; কিন্তু গোত্রের আছে। স্বাতন্ত্র্যসূচক নাম গোত্রজীবনের অপরিহার্য বিশেষত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এসব গোত্রের নামকরণ করা হয়েছে পাখি, পশু, পোকামাকড়, মাছ এবং প্রকৃতি রাজ্যের নানা বস্তুর নামে (ইসলাম, ১৯৭৪)। তরু (২০০৮: ১৪) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসীরা নানা গোত্রে বিভক্ত। বিচিত্র তাদের গোত্রের নাম, তেমনি বিচিত্র তাদের গোত্রের প্রতীক (টোটেম)'।

পাত্র সমাজও বিভিন্ন গোত্রে বিভাজিত। তবে দুটি গোত্র ব্যবস্থাই তাঁদের সমাজে অধিক প্রচলিত। এর মধ্যে একটি হলো আদিবাসী হিসেবে নিজস্ব গোত্র ব্যবস্থা এবং অন্যটি হিন্দু সমাজের অনুকরণে প্রচলিত গোত্র ব্যবস্থা (রহমান, ২০০৭)। উল্লেখ্য যে, পাত্র সমাজে সব গোত্রই সমমর্যাদাসম্পন্ন। 'অর্থনৈতিক কিংবা বংশগত কারণে উচ্চ, নিম্ন এরূপ স্তর বিন্যাস নেই। পাত্র সমাজের মধ্যে বর্ণভেদ প্রথাও অনুপস্থিত:ধর্মে হিন্দু হলেও ব্রাহ্মণ কিংবা পুরোহিত শ্রেণীর অস্তিত্ব নেই' (সুলতান, অনুল্লেখ: ৪)। সুলতানের অন্বেষা এখন আর সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কারণ পাত্র সমাজে বর্তমানে ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত প্রথা চালু হয়েছে। তবে কয়েকটি স্থানের পাত্রগণ নিজেদের মহাপাত্র হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকেন এবং নিজেদেরকে অন্য পাত্রদের তুলনায় উঁচু গোত্রের মনে করেন। 'এ ব্যাপারে তাদের অনেকে বলে যে, কয়েকটি জায়গার কয়েকজন শিক্ষিতপাত্র নিজেদেরকে অন্যদের চেয়ে একটু উন্নত করে দেখানোর জন্য মহাপাত্র হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকেন' (ম্রি, ২০০৭: ৪৩১)। এ সমাজে গোত্র ব্যবস্থাকে বলা হয় রই।

সুলতানের (অনুল্লেখ: ৪-৫) মতে, পাত্র সমাজে নিম্নলিখিত বারোটি রই বা গোত্র রয়েছে-

‘১। তংরারই ৭। থেকুলারই

২। লংকিরই ৮। কেলাংরই

৩।গাবু রই ৯। টিপারই

৪। আলই ১০। বারই

৫। লংথুরই ১১। পন বাবুই

৬। ঠুকরিরই ১২। তংরা বারই’।

কিন্তু চক্রবর্ত্তী (২০০০: ৪১) মাঠ পর্যায়ে গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ১৬টি গোত্রের উল্লেখ করেছেন। এগুলি নিম্নরূপ-

১। ‘লাংতু রই ৯। বারই

২। কেলাং রই ১০। লংকি রই

৩। থেকলা রই ১১। চামাং রই

৪। আলই রই ১২। চন্দ্র রই

৫। টুকরি রই ১৩। গল্লা রই

৬। ছুন্দি রই ১৪। তংরা রই

৭। গাব রই ১৫। টিপরা রই

৮। পণ বাবুই রই ১৬। তংরাবা রই’

তবে ক্ষেত্র গবেষণায় বর্তমানে ১২টির বেশি গোত্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি। এই বারটি গোত্রের নাম হলো-

১। বারই ২। আলইরই ৩। কেলাংরই ৪। লংখিরই ৫। টুকরীরই ৬। থেকলারই ৭। চমাংরই ৮। তংরারই ৯। লংখুরই ১০। চন্দ্রারই ১১। গাবুরই এবং ১২। তিপরারই।

পাত্রদের গোত্রের নামকরণ করা হয়েছে তাঁদের পেশা অনুযায়ী। পাত্রদের মধ্যে বর্তমানে এ গোত্রবিভাজন ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। কারণ ধর্ম ও ঐতিহ্য অনুযায়ী বর্ণ প্রথা একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক সভ্যতার প্রভাবে তা দিনের পর দিন হারিয়ে যাচ্ছে।

১০.৩ জ্ঞাতিগোষ্ঠি সংক্রান্ত শব্দ

জ্ঞাতিগোষ্ঠির মাধ্যমে কোনো গোষ্ঠির সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পায়। পাত্র সমাজে এরূপ জ্ঞাতিগোষ্ঠি বিদ্যমান। পাত্রদের জ্ঞাতিসম্পর্ক হলো-পা (বাবা), ইয়ো (মা), কাকা বাপ (সৎ পিতা), এখানে সৎ পিতা

বলতে মায়ের পরের স্বামীর কথা বলা হয়েছে। কত্তাই (ভাই), ইনজুর (বোন), কত্তাই সা (ভাইপো), নিখুয়া বা নিপুয়া (শ্বশুর), নিফুওই (শাশুড়ী), খুকু (কাকা), পাছার (বড় চাচা),পানু (ছোট চাচা), দাবুড়া (দাদা), দাবুড়ী (দাদী), (নানা), (নানী), নুনু (খালা), মুওয়া (খালু), নি (ফুফু), ফুওয়া (ফুফা), ছালি (শ্যালিকা), জেৎছা বা জেটছুরি (স্ত্রীর বড় বোন), পইন সা (বোনপো), বোনাই (ভাই বা বোনের শ্বশুর), মাসই (বোনের জামাই), খামাক (জামাতা) প্রভৃতি।

জ্ঞাতিগোষ্ঠি সংক্রান্ত শব্দ সংস্কৃতিভেদে পৃথক হয় এবং এসব শব্দের সাহায্যে সংস্কৃতির মূল্যবোধ, আদর্শ, প্রথা, রীতি প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। এ প্রসঙ্গে দানেশি বলেন,

> What do kinship terms reveal? Above all else, they indicate how the family is structured in a given culture, what relationships are considered to be especially important, and what attitudes towards kin and exit (Danesi, 2004: 141).

পাত্রদের জ্ঞাতিগোষ্ঠির মাধ্যমে তাঁদের মূল্যবোধ, আদর্শ, প্রতীক, ভাষা তথা সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান প্রকাশিত হয়ে থাকে। এসব জ্ঞাতিগোষ্ঠি নির্দেশক শব্দ পাত্রদের ঐতিহ্য যেমন প্রকাশিত হয় তেমনি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, স্নেহ, আদর প্রভৃতিও প্রকাশ পায়।

১০.৪ বিয়ে সংক্রান্ত শব্দ

বিয়ে মানব সমাজের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করেছে। সময়ের পরিক্রমায় প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে উপনীত হয়েছে স্থিতাবস্থায়। বিয়ে প্রথাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে প্রধানত ধর্ম। এ ব্যবস্থা মানুষের মধ্যে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করে তোলে। অন্যভাবে বলা যায়, মানব সমাজে বিয়েই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার, কেননা বিয়েই স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ককে সামাজিক স্বীকৃতি দেয়। এই সামাজিক স্বীকৃতিই সমাজের সংগঠন ও সংহতিকে দৃঢ় করে (সুর, ১৯৯০)। শাহেদ ও অন্যান্য (২০১১: ৪২) বলেছেন, 'বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর লোকেরা নিজ নিজ রীতি অনুযায়ী বিবাহকার্য সম্পন্ন করে থাকে। তাই সমাজ ও সংস্কৃতি ভেদে এর আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে নানাবিধ বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়'। নিচে পাত্র সম্প্রদায়ের বিয়ে সংক্রান্ত শব্দ আলোচনা করা হয়েছে।

১০.৪.১ পাত্র-পাত্রী নির্বাচন সংক্রান্ত শব্দ

পাত্র সম্প্রদায়ের বিয়েতে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন অত্যন্ত চমকপ্রদ। ছেলে-মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাঁদের পিতা-মাতা তথা অভিভাবক এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কনে নির্বাচনের পর বরের বাড়ি থেকে কয়েকজন মহিলা কনের বাড়ি গিয়ে কনের হাতের রান্না খেয়ে আসেন এবং পছন্দ হলে কনের বাবা মায়ে সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে দিন-তারিখ নির্ধারণ করেন; পাত্ররা একে '*পান-চিনি*' পর্ব বলে।

পান-চিনি শব্দটি বাঙালিরাও ব্যবহার করে থাকেন। কাজেই 'পান-চিনি' সংস্কৃতি বাঙালি দ্বারা প্রভাবিত কিনা তা প্রশ্নসাপেক্ষ। বর-কনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাত্ররা তিন ধরনের পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ তিন ধরনের পদ্ধতি হলো- *স্বয়ংবর, ইচ্ছাবর ও গণ্ডব্য*। পিতা-মাতার ইচ্ছা অনুযায়ী বর-কনে নির্বাচনকে বলা হয় স্বয়ংবর। এ প্রথাই পাত্রসমাজে বেশি প্রচলিত। ইচ্ছাবর হলো বর বা কনের ইচ্ছা অনুযায়ী নিজ ধর্ম বা অন্য ধর্মের কাউকে বিয়ে করা। নিজের আত্মীয় স্বজনকে না জানিয়ে নিজ ধর্মের কাউকে বিয়ে করাকে বলা হয় গন্ডব্য। তাঁদের বিয়েতে একটি প্রচলিত গান হলো-

পাত্র ভাষা

খেম রাক এ নালিং, কতকন রং পিরা
নালিং সকল লগররাং খুএ রাং রা
হাই থুএয়াংরা
খেম রাকউরা ব্রামাইরা।
নালিং য়াতুং ইংয়ারেরিরা তা এ
য়ানা আলাং লে লগে।
হাই খু এ য়াএং রা
হাই নালিং খেম রাকমাইরা।

বাংলা ভাষা

'কুঞ্জ সাজাও বালা নানান রঙ্গের মিলাইয়া
সব সখিগণ তোমরা দেখগো আইয়্যা
ও তোরা দেখগো আহিয়া
কুঞ্জ সাজাও গিয়া।
তোমরা বারিয়া কওগো সঙ্গে নিতাম কাইয়্যা
সোনা মাঝে মুদ্রা দিয়া,
ও তোরা দেখগো আহিয়া
ও তোরা কুঞ্জ সাজাও গিয়া। (ছবি: পরিশিষ্ট ৩.১২ দ্রষ্টব্য)

১০.৪.২ বিয়ের প্রকার নির্দেশক শব্দ

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিয়ের বিভিন্ন প্রকার লক্ষ করা যায়। পাত্রসমাজে বিভিন্নধর্মী বিয়ে রীতি প্রচলিত আছে। এ সম্প্রদায়ের বিয়ের প্রকার নির্দেশক শব্দের মধ্যে সীতাক্ষী, তাইতাক্ষী, ছাইভস্ম, বুয়াচল,

বান্নীচল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নকুল পাত্র (তথ্যদাতা) মনে করেন, 'পাত্র সমাজে বিয়ের আটটি ধরন রয়েছে- ব্রহ্মশয্যা বিয়্যা, দৈব্য বিয়্যা, অর্থবিয়্যা, প্রজাপাইত্য বিয়্যা, আসুরিক বিয়্যা, পৈশাচ বিয়্যা, গন্ডব্য বিয়্যা ও রাইক্ষস বিয়্যা।'

১০.৪.৩ বিয়ে সম্পাদন সংক্রান্ত শব্দ

পাত্র সংস্কৃতিতে বিয়ের কাজ সম্পাদনের আগে পঞ্জিকা অনুসরণের মাধ্যমে শুভদিন ধার্য করে সম্পন্ন করতে হয়। পরবর্তীকালে সপ্তম ধাপে বিয়ে এবং অষ্টম ধাপে *বননাইওর, ফিরানাইওর, বাড়িংদং, উল্টাবট* প্রভৃতি সম্পাদন করতে হয়। পাত্র সম্প্রদায় *পান পা উনির* মাধ্যমে বিয়ের প্রথম ধাপ সম্পন্ন করে থাকে। বর পক্ষ, কনে পক্ষকে পাঁচটি সুপারি ও পাঁচটি পান প্রদান করে; এর মাধ্যমেই বিয়ের প্রাথমিক আলোচনা শুরু হয়। পান দুয়ারানী হলো পাত্র বিয়ের দ্বিতীয় ধাপ। এতেও সুপারি প্রদানের প্রথা আছে। *জংট্রু সিন্দুর পইরানী* পাত্র বিয়ের অন্যতম কাজ। এই দিন বর কন্যাকে সিঁদুর প্রদান করে এবং কন্যা সাজানোর জন্য বরপক্ষকে আরো ৫টি পান ও ৫টি সুপারি প্রদান করা পাত্রদের রীতি; পাশাপাশি বর কন্যাপক্ষকে আরো ৫টি পান ও ৫টি সুপারি প্রদান করলে কন্যাপক্ষ প্রশ্ন করবে, 'এই পান সুপারি আপনারা কি কারণে প্রদান করলেন?' তখনই বরপক্ষ উত্তর দেবে-'আপনারা সম্মতি দিলে আমরা বিয়ের শুভ কাজ সম্পন্ন করতে চাই।' এতে কন্যাপক্ষ সম্মতি দিয়ে পান সুপারি গ্রহণ করবে। তারপর গ্রাম থেকে গ্রাম প্রধানের প্রতিনিধি এই বিয়ের সংশ্লিষ্ট আলোচনা কন্যার বাড়িতে আনার জন্য বরপক্ষ কনেপক্ষের অনুমতি চান বা তারিখ প্রদানের আবেদন জানান। পাত্র সমাজে এই পর্বকে বলা হয় *বাংসাছু সিকুং।* দ্বিতীয়বার পান সুপারি প্রদানকে বলা হয় *বিয়া মাঙ্গুনি*। পণ দেয়ার রীতিকে পাত্র ভাষায় বলা হয় *খালতি বা দিপ্পন*। পাত্র জাতির বিয়ে অনুষ্ঠানাদির মধ্যে *ভাসা* অন্যতম। এই দিন শুভক্ষণে বরপক্ষ কন্যাকে বিয়ের সাজে সাজায় এবং শাঁখা সিঁদুর পরায়। পাত্র ভাষায় বিয়ের রাতকে বলে *মারুয়া*। এই রাতে বর ও কনের বাড়িতে সরস্বতী দেবীর স্মরণে ৫টি পান ও ৫টি সুপারি প্রদান বাধ্যতামূলক। পাত্র সমাজে বিয়ে সম্পাদনের এসব রীতি দিন দিন কমে যাচ্ছে। তবুও অনেক পাত্র মনে করেন, তাঁদের ঐতিহ্যগত বিয়ে প্রথা এখনও তাদের সমাজে টিকে আছে।

১০.৪.৪ বিয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান সংক্রান্ত শব্দ

বিয়ের দিন সমাগত হলে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান শুরু হয়। বিয়ের এক সপ্তাহ পূর্বে থিরাম ও খেমু লারাম পূজা অর্চনা করতে হয়। বিয়ের আগের দিন বর ও কনে উভয়ের বাড়িতে *গাত্র হরিদ্রা* বা গায়ে হলুদের আয়োজন করা হয়ে থাকে। বিয়ের আগের দিন হতে গান বাজনা ও অন্যান্য পর্ব শুরু হয়। বিয়ের দিন সকালে ছোট দুটি মাটির কলস ও ছোট একটা প্লেটে বাতি জ্বালিয়ে *ছড়ায়* (ডুবায়) নিয়ে ভাবি এবং বড়বোন বরকে গোসল করান। গোসলের পর তাঁরা আর ঘরে প্রবেশ করেন না,

আঙ্গিনায় যে কুঞ্জ সাজানো থাকে তার অভ্যন্তরে বসে থেকে লগ্ন অতিবাহিত করেন, সেখানে বসেই বর নিজের হাতে ছোট ভাই-বোন এবং অন্যান্যদের নতুন কাপড়-চোপড় উপহার দেন। সেই কুঞ্জকে ঘিরেই রঙ্গিলারা লগনে মত্ত থাকেন এবং এবং দুপুর বেলা বরের গায়ে হলুদের গুঁড়া মাখিয়ে পুনরায় গোসল করানো হয়। অতঃপর বড় বোনের স্বামী বরকে কাপড় পরান, কনেকে কাপড় পরান তাঁর ভাবি। বরের অবস্থানের স্থানটিকে চালের গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া ও ধনিয়া গুঁড়া ইত্যাদি দিয়ে লেপে দেয়া হয়। ঐ জায়গায় বরকে বসিয়ে রঙ্গিলারা বিভিন্ন গান পরিবেশন করেন। অতঃপর কুঞ্জ থেকে বড় বোনের স্বামী বরকে কোলে করে এনে *চকদালে* (পালকিতে) বা গাড়িতে তোলে। এ সময় বর প্রথা অনুযায়ী আয়নার পানে তাকিয়ে স্বছবি দেখায় মগ্ন থাকে। চার-পাঁচজন বহনকারী চকদাল কাঁধে নিয়ে কনের বাড়ির দিকে যাত্রা করে এবং বরযাত্রা হিসেবে অনেক আত্মীয়-স্বজন অংশ নেন (ছবি: পরিশিষ্ট ৩.১৩ দ্রষ্টব্য)।

যাত্রার প্রাক্কালে গোল্লা বা পটকা ফোটানো হয়। গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর চকদালে বা গাড়ি থেকে বড় বোনের স্বামী কোলে করে নামিয়ে কন্যা নেই এমন একটি ঘরে বরকে বসান। তারপর শুরু হয় খাওয়া-দাওয়া পর্ব। খাওয়ার মাঝে মদ্যপান অত্যাবশ্যক। তারপর বর ও কনেকে একই কুঞ্জে দুটি চেয়ারে বসানো হয়। ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়েন এবং বরের চারপাশে সাতটি পাক দেন। মন্ত্রপাঠ ও মালা পরানোর পর ঠাকুর কন্যার কপালে সিঁদুর দেন এবং বর কনেকে নিজ বাড়িতে নিয়ে আসেন। রীতি অনুযায়ী স্বামীর বাড়িতে আসার পরের দিন স্বামী-স্ত্রী একে অপরের কনিষ্ঠ আঙ্গুল ধরে কুঞ্জের পাশে সাতটি পাক দেন (ছবি: পরিশিষ্ট ৩.১৪ দ্রষ্টব্য)। পাত্ররা একে *'সতীমঙ্গল'* বলে। এ সময় বর এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং সমবয়স্ক একজন লোক বর-কনে উভয়ের পায়ে জল ঢেলে দেন, পাত্র ভাষায় এটিকে *জলদাড়িয়া* বলে অভিহিত করা হয়। এরপর স্বামী, স্ত্রীর কাছ থেকে আড়াই দিনের জন্য নিজ বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। আড়াইদিন পর স্বামী প্রত্যাবর্তন করলে কন্যা লুটাতে কিছু পানি নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে স্বামীর হাত পা লুটার পানি দিয়ে ধৌত করে টুপ জ্বালিয়ে গৃহে নিয়ে আসেন। আর এ রাতেই হয় তাঁদের বাসর রাত। পরের দিন নাপিত এসে স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই চুল কেটে দেয়। অতঃপর স্বামী বাজারে গিয়ে মিষ্টি ও অন্যান্য বাজার নিয়ে আসেন এবং কনে স্বামীর বাড়িতে নিজ হাতে রান্না করেন। স্বামী তাঁর আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে নিয়ে স্ত্রীর রান্না করা খাবার খান। তারপর স্বামী তাঁর আত্মীয়স্বজন ও স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ি যান। পাত্ররা বিয়ে রীতির এ পর্বকে বলে *'বন নাইওর'*। ঐদিনই তাঁরা বাড়ি ফিরে আসেন। বারদিন পর আবার স্বামী, স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ি যান। এটাকে তাঁরা *'ফিরানইওর'* বলে।

১০.৪.৫ বিয়ের উপহার সংক্রান্ত শব্দ

পাত্র সমাজে যৌতুক প্রথা নেই বললেই চলে। তবে বিয়ের সময় কন্যার বাবা ইচ্ছে করলে বরকে হালের বলদ দিতে পারে অথবা বর ও কন্যার জামা কাপড়, আংটি, পোশাক-পরিচ্ছদ, *থালচিক* (থালা), *লুটাচিক*

(ঘটি), *নাহান সোনা* (গলার স্বর্ণ) ইত্যাদি দিতে পারেন। কাসার থালা, কাসার বাটি ও কাসার ঘটি-এ তিনটি বস্তু পাত্র বিয়েতে দেয়া অত্যাবশ্যক। এছাড়া পাত্ররা বিয়েতে ইংখু (চুড়ি), খাড়ু (হস্তভূষণ), খালুংমালা (হার), নাংদুল (কানের দুল), নাখানুংটেম (নাক ফুল), মলুং (কোমর বন্দ), মলুং বিছা (বাজুবন্দ) প্রভৃতি উপহার হিসেবে প্রদান করে থাকে।

১০.৫ গৃহনির্মাণ সংক্রান্ত শব্দ

পাত্ররা বসবাসের জন্য তিন ধরনের ঘর ব্যবহার করেন। পাত্রদের মধ্যে মাটির দেয়াল ও টিনের তৈরি ঘরের প্রচলন রয়েছে। ঘর তৈরির উপকরণ হিসেবে তাঁরা মাটি, টিন, নাট, বল্টু, পেরেক, কাঠ ইত্যাদি ব্যবহার করেন। পাত্র এলাকায় মাটির দেয়াল ও শনের চালের ঘরের ব্যবহার লক্ষণীয়। মাটি নির্মিত দেয়াল, চাল তৈরির জন্য শন, বেত, পাতা, বাঁশ প্রভৃতি উপকরণ ব্যবহৃত হয়। অনেক ক্ষেত্রে বেত গাছের ছাল ও পাট ব্যবহার করতে দেখা যায়। পাত্রদের মধ্যে বেড়ার ঘর নামে আরেক ধরনের ঘরের প্রচলন রয়েছে। এ ঘর তৈরিতে তাঁরা বাঁশ, ইকরবা পাটকাঠি ইত্যাদি ব্যবহার করেন। গৃহনির্মাণ সংক্রান্ত শব্দের মধ্যে উনিং খেম (বসার ঘর), লাখলা (বাঁশ), কে ওই (জানালা), কমলাক (ধানের গোলার ঘর), খেম (ঘর), খেমছাছু (ছোট কুড়েঘর), চিনং খেম (গোয়াল ঘর), ছাত (চালা), থেং (কাঠ), থুনি (খুটি), দরা (দরজা), পাকাং খেম (পাকা ঘর), ফালাউং খেম (শন-খড়ের ঘর), বিলাতি থংলাই (সিমেন্ট) ইত্যাদি প্রধান।

১০.৬ খাদ্যাভ্যাস ও পানীয় সংক্রান্ত শব্দ

পাত্র সমাজের খাবারের অভ্যাস সিলেটে বসবাসরত অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রায় অনুরূপ। তবে অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির ন্যায় পাত্র সম্প্রদায়ের খাবারের অভ্যাসেও কিছুটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। এ খাবারগুলো তাঁদের বিশেষ খাবার হিসেবে গণ্য হয়। খাতুয়া (কচ্ছপ), অখই (সজারু), কইরা (হরিণ), খরগোশ, কুইচ্ছ্যা, ফাক (শূকর) প্রভৃতি এসব বিশেষ খাবার। 'শূকরের মাংস ভক্ষণ মূলত: কোল ও দ্রাবিড়দের রীতি' (ওয়াইজ, ২০০০:৩২)। পাত্রদের বিশেষ ধরনের খাবারের নাম হলো খাজি। দুর্গাপূজার সময় নবমীতে পাত্ররা তাদের আদিবাসী ঐতিহ্যবাহী পূজা পালন করে থাকে। এ সময় সামর্থ্য অনুযায়ী তিনটি বা পাঁচটি হাঁস বলি দেয়ার রীতি প্রচলিত রয়েছে। বলি দেয়া হাঁসের মাংস কলা পাতা দিয়ে পেচিয়ে কড়াইয়ে সিদ্ধ করে বিশেষ এই খাবার রান্না করা হয়। পাত্রদের তৈরি মদের নাম হলো *খর*। এই মদ তৈরির প্রাথমিক প্রক্রিয়াকে পাত্র ভাষায় বলা হয় *চুরাং*। প্রথমে মদ তৈরির উপকরণসমূহ একটি হাড়িতে প্রস্তুত করে রাখা হয়। এটিকেই পাত্র ভাষায় চুরাং বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই চুরাঙের উপাদান হিসেবে পূর্বে ১০৮ প্রকার ভেষজের প্রয়োজন হত। সুলতান লিখেছেন-'এ সম্প্রদায়ের খাদ্যাভ্যাস নিম্নবর্গের

বাংগালীদের অনুরূপ। তবে পানীয়ের ক্ষেত্রে তাঁদের কিছুটা স্বাতন্ত্র্য আছে। *খর* নামক *বোনো বা হাড়িয়া* মদ নিজেরা তৈরি করে নেয়। ঐ পানীয় প্রস্তুতে ১০৮টি বুনো ভেষজের প্রয়োজন হয়' (সুলতান, অনুল্লেখ: ৭)। বর্তমানে পাহাড় হ্রাস পাওয়ায় এত বেশি উপকরণ পাওয়া যায় না। এই চুরাঙের উপাদান হিসেবে ত্রিশটিরও বেশি উপাদান ব্যবহৃত হয় বলে প্রাপ্ত তথ্য থেকে অবগত হওয়া যায়। চুরাঙের উপাদান হিসেবে খাংলা (বাটি গাছের ছাল), তেরায় লা (তেরাবন), গুয়ামুরির পাতা (মসলা জাতীয় পাহাড়ী গাছ), মনিরাজ গাছের পাতা, ধুতরা পাতা, হরতকি, সইটমরা (লজ্জাবতী গাছ), নিমপাতা, মানুবুড়া (গোলাকৃতি মাটির নিচের আলু) প্রভৃতি অত্যন্ত জনপ্রিয়। এসব উপাদানের সঙ্গে মূল উপাদান হিসেবে ভাত ব্যবহৃত হয়। চুরাং চারদিন বড় গামলা বা পাতিলের মধ্যে ভিজিয়ে রাখা হয় এবং চারদিন পরে চুরাং দীর্ঘক্ষণ পানিতে ফোটানোর এ থেকে যেসব রস বা পানীয় উপাদান জমা হয় তাই পাত্রদের প্রধান মদ খর খাওয়ার উপযোগী হয়। 'পাত্র সম্প্রদায়ের এই পানীয় তৈরি তাদের আদিবাসী চরিত্রের প্রকাশ' (চক্রবর্ত্তী, ২০০০: ৫৭)। (ছবি: পরিশিষ্ট ৩.১৫ দ্রষ্টব্য)

১০.৭ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সংক্রান্ত শব্দ

কোনো গোষ্ঠির সংস্কৃতিতে ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ভারত বিষয়ক নৃতাত্ত্বিক ইংরেজ সিভিলিয়ন লায়াল (১৮৩৫) সবসময় ভারতীয় সমাজ কাঠামোর ভিত্তি হিসেবে বর্ণ ও ধর্মকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, 'ভারতীয় সমাজের চাবিকাঠিই হলো ধর্ম' (উদ্ধৃত, ওয়াইজ, ২০০২: ১৪)। ধর্মীয় বিশ্বাস ও রীতিনীতি যেকোন সম্প্রদায়ের জীবনাচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সিলেটের পাত্ররা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ জীবন যাপন করেন। তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে রীতিনীতি, লোকাচার, সাধারণ শিষ্টাচার এবং দৈনিন্দিন জীবন-প্রণালি ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। বাংলাদেশের অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির মতই তাঁদের সাংস্কৃতিক জীবন অত্যন্ত বর্ণাঢ্য। পাত্ররা নিজেদেরকে সনাতন ধর্মাম্বলম্বী হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন। বিভিন্ন গবেষণায়ও অনেকে মন্তব্য করেছেন, 'পাত্ররা সনাতন ধর্মের অনুসারী' (ম্রি, ২০০৭:৪৩৩)। তবে মাঠ গবেষণায় দেখা গিয়েছে সনাতন হিন্দুধর্মের সঙ্গে তাদের ধর্মীয় রীতিনীতির পার্থক্য স্পষ্ট। সুলতান (অনুল্লেখ) লিখেছেন, 'যদিও নিজেদেরকে তারা সনাতন ধর্মাম্বলম্বীরূপে আখ্যায়িত করে থাকে তবুও সনাতন হিন্দুধর্মমতের সাথে তাদের আচারগত ব্যবধান বিস্তর' (পৃ. ৬)। উল্লেখ্য, এ সম্প্রদায়ের মধ্যে পেশাদার ব্রাহ্মণ কিংবা বর্ণাশ্রম প্রথার কোন প্রচলন নেই। পেশাদার ব্রাহ্মণের পরিবর্তে ধর্মীয় আচারাদি বয়োবৃদ্ধরাই করে থাকেন এবং তাঁরা নিজেদেরকে 'ভাবের পূজারী' রূপে আখ্যায়িত করেন। সনাতন ধর্মমতের অনুরূপ দুর্গা, কালি, শিব, গণেশ, কার্ত্তিক, সমাইশ্বরী, বিষরী, লক্ষী প্রভৃতি দেব-দেবীর প্রচলন থাকলেও দরিদ্র পাত্ররা অধিকাংশ

ক্ষেত্রে আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে মূর্তি সংগ্রহ করতে পারেন না। তাঁদের মধ্যে কোন নির্মাতা, কারিগর কিংবা পটুয়ার অস্তিত্ব নেই। কেবল কয়েকটি অবস্থাসম্পন্ন পাত্র পরিবার পার্শ্ববর্তী বাঙালি ব্রাহ্মণ নির্মাতাদের নিকট থেকে পূজা সংগ্রহ করে থাকেন। আর বাকি পাত্ররা ভাবের পূজারি ; তাঁদের অর্চনা আরাধনায় কোন মাটির তৈরি বিগ্রহের প্রয়োজন হয় না। কেবল *'ঠাকুর নাং ঠেকু'* অর্থাৎ 'ঠাকুর তুমি জান'-এ বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমেই তাঁদের অন্তর্নিহিত ভক্তিকে দেবতার প্রতি নিবেদন করতে পারে। এক্ষেত্রে পাত্ররা কোন বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ নিষ্প্রয়োজন মনে করেন। 'তবে দেবদেবীর প্রতি পাঠাবলি ও সংগীত অনুযায়ী নৈবেদ্য নিবেদনের প্রথা প্রচলিত আছে। উল্লেখ্য যে, পাত্র সম্প্রদায়ের নিজস্ব কোন মন্দির নেই' (সুলতান, অনুল্লেখ: ৬)।

১০.৭.১ পূজা সংক্রান্ত শব্দ

পূর্বে পাত্ররা প্রধানত সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। বর্তমানে তাঁরা বিভিন্ন দেবীর পূজা-অর্চনা করে থাকেন। পাত্রদের প্রধান দেব-দেবীর মধ্যে রয়েছে মহাদেব, কালী (ইকওইন), মনসা, লক্ষী *(লক্ষীং)*, স্বরস্বতী, দেবী, দুর্গা (*পুইন*) প্রভৃতি। আবার আদি ধর্মানুসারে তাঁদের অন্যান্য দেব-দেবীর মধ্যে রয়েছে রূপসী দেবী *(থেংওই পইন)*, প্রধান দেবতা *খেমুলারাম*, *বনদেবতা কালরারাম*, শিকারের দেবতা *ছাশিকারী*, বনের অপদেবতা *'গড়লারাম' মহিষ লারাম* ইত্যাদি। রামকে পাত্ররা প্রধান দেবতা মনে করেন বলে, প্রধান প্রধান পূজার সঙ্গে তাঁরা রামের নাম জড়িয়ে দিয়েছেন। বিভিন্ন দেব-দেবীকে তাঁরা *থানের* (পাথর) নামানুসারে চিহ্নিত করে থাকেন, যেমন- কালী দেবীর নাম *হক্কুলে লারাম*, চন্ডাদেবীর (দুর্গাদেবী) নাম *ইয়াহা লারাম।* পাত্র ভাষায় বিভিন্ন দেব-দেবীর নাম হলো- *'পুইন (দুর্গা), পুইলুংলং (বিষহরী), কর্তাইন (কার্তিক ও গণেশ দু'ভাই), মলমথংয়াং (মহাদেব বা পরিবেশ অনুযায়ী কোন কোন পূজ্য দেবদেবী), থেংওই পইন (রূপসী দেবী), বাড়ি রাখালুং (গৃহদেবতা বা ঘররক্ষাকারী দেবতা), ইকওইন (কালী), কওয়াইচাওইন (চণ্ডী বা পরিবেশ অনুযায়ী কোনো দেবতা বা দেবী), গুলংলারামুং (ধানক্ষেত রক্ষাকারী দেবতা), শনিলারামং (শনি দেবতা), সরস্বতী, লক্ষীং (লক্ষী) লাফাং প্রভৃতি'* (ম্রি, ২০০৭: ৪৩৩)। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, তাদের রূপসী দেবীর নাম হচ্ছে *'খেয়ালারাম'*। পাত্রদের আরেকটি প্রধান দেবতা হলো *'খেমু লারাম'* বা গৃহদেবতা।

পাত্রদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দেবতা হলো *মইশ লারাম*। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, এ দেবতা তাঁদেরকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করে। এ দেবতা যেকোন লোককে পাগল বানাতে পারে কিংবা যেকোন ক্ষতি সাধন করতে পারে। এই ক্ষতি হতে পরিত্রাণ পাবার জন্য পাত্ররা মইশ লারামের উদ্দেশ্যে দুধ ও কলা প্রসাদ দেয়-তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য। খেয়ালারাম বা রূপসী দেবীকে পাত্ররা অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে ভক্তি

করেন। কারণ রূপসী দেবীকে তারা ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ধারণ কর্তা হিসেবে গণ্য করে। এমনকি নারীরা গর্ভবতী হলে ঐ গৃহে রূপসী দেবীর পূজা করা হয়। তাঁদের বিশ্বাস, রূপসী দেবীর প্রতীকের সামনে পূর্বমুখ করে রাখা পান-সুপারি যদি পরদিন পর্যন্ত অনড় থাকে তবে তাঁরা ধরে নেন যে ভবিষ্যৎ শুভ। আর পান-সুপারি উত্তর বা দক্ষিণ দিক হয়ে গেলে তাঁরা বিষয়টিকে ভবিষ্যতের জন্য অমঙ্গল ইঙ্গিত বলে মনে করেন। পাত্রদের পূজা অর্চনার অপর বিষয় হলো *থিরাম* বা পূর্বপুরুষ পূজা। কারও মৃত্যু পরবর্তী সময়ে সাধারণত এ পূজা করা হয়। এ ছাড়া বছরের শেষদিন পূর্বপুরুষের স্মরণে এরূপ পূজা করা হয়। আবার একই গোষ্ঠির বা গোত্রের কোন ব্যক্তির বিয়ের অনুষ্ঠান নির্ধারিত হলে এ ক্ষেত্রে ঐ গোত্রের মৃত পূর্ব পুরুষদের উদ্দেশে বিয়ে অনুষ্ঠিত হবার আগেই পূজা-অর্চনা করা হয়। এ পূজার ক্ষেত্রে তাঁরা গোত্র ব্যবস্থার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। কারণ, স্বগোত্র ব্যতীত এ পূজা অর্চনা সম্ভব নয়। পাত্ররা এ পূজা পালনের জন্য পূর্ব পুরুষের উদ্দেশ্যে সাধারণত দুটি কবুতর, ভাত এবং রুই মাছ বা অন্য যেকোন মাছ রান্না করে তাদের নামে প্রসাদ হিসেবে উৎসর্গ করে থাকেন।

খেমু লারাম পূজা পাত্রদের গুরুত্বপূর্ণ পূজা হিসেবে স্বীকৃত। শ্রী মন্থই পাত্র (তথ্যদাতা) মনে করেন, ‘ওসাইয়ের নিকট বিধাতার কাছ থেকে স্বপ্নে এক ধরনের বার্তা আসে এবং এ নির্দেশ অনুযায়ী দিনক্ষণ নির্ধারণ করা হয়। প্রতিবছর বা পনের বিশ বছর পর পর এ পূজা পালন করা হয়। ওসাই নির্দেশ পাওয়ার পরে গ্রামের বিভিন্ন মহল্লার কর্তাস্থানীয় লোকজনকে জানিয়ে দেন এবং তাঁদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কয়েক গ্রামের লোক একত্র হয়ে কোনো একটি বাড়িতে এই পূজা পালন করে থাকেন। এ পূজায় তিনটি পাঠা বলি দেয়ার রীতি রয়েছে। বিধাতার কাছ থেকে ওসাই ইনকই পেয়ে থাকেন। মাঞ্চি (মানত) পূরণের জন্য এই পূজা পালন করা হয়। পাত্ররা বিশ্বাস করে যে, এই পূজা অর্চনের মধ্য দিয়ে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শান্তি বিরাজ করে (ছবি: পরিশিষ্ট ৩.১৬ দ্রষ্টব্য)।

পাত্রদের গুরুত্বপূর্ণ পূজা হলো পুইন পূজা। দুর্গাপূজার সময় পাত্ররা এ পূজা পালন করে থাকে। দুর্গা পূজার নবমী দিনে পাত্ররা তাদের আদিবাসী হিসেবে এ বিশেষ পূজা পালন করে। আদিতে প্রত্যেক বাড়িতে এ পূজা পালন করা হতো। বর্তমানে স্বচ্ছল পাত্রদের বাড়িতে এ পূজা অর্চিত হয় (ছবি: পরিশিষ্ট ৩.১৭ দ্রষ্টব্য)। এ উপলক্ষে বাড়ির আঙিনার মাঝখানে পর্দা দিয়ে আবৃত স্থানটি লেপন করা হয়। তারপর বিভিন্ন প্রসাদ, যেমন-কলা, চিড়া, দুধ, খর (পাত্রদের বিশেষ মদ), বিভিন্ন ধরনের ফলমূল চতুর্দিকে রাখা হয়। বাড়ির সবচেয়ে ধার্মিক ও জ্ঞানীলোক পূজার কাজ সমাপন করে। তিনি দেবতার নামে বিভিন্ন মন্ত্র পাঠ করতে থাকেন। মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে পূজা শুরু হলে সামর্থ্য অনুযায়ী তিনি কয়েকটি হাঁস বা কবুতর বলি দেন ঐ পূজা অর্চনার বাইরের খোলা জায়গায়। এরপর পূজা-অর্চনার স্থানে তিনি ঐ

বলি দেয়া হাঁস বা কবুতর রেখে পুনরায় পূজা অর্চনায় মনোনিবেশ করেন। এ পূজার প্রধান প্রার্থনা হলো-

পাত্র ভাষা

মা গো দুর্গা মা, নাং হাইলে হালিংলে
সকলহোয়ালে পশুপাখি, কীটপতঙ্গ- চেরালতা
সব লে নালিং আশীর্বাদ পিরা য়ুয়ে,
সব লে বেমার আজায়কত দই দুশমনকাত
নে, উদ্ধার ছুয়ে সব লে সুখী বে।
বৎসরে বৎসরে, যেইরা নালিং
শুধু হালিং এনে, নালিং নাম
নালিং লে কইয়ে
সব লে সুষ্ঠু জ্ঞান, সুষ্ঠু বুদ্ধি পিরায়োইয়ে।
একবারে কীটপটঙ্গ, পশুপাখি লাগাইরা
চেরালতা সব কিছু লাগাইর‍্যা
সব লে নালিং শান্তি শান্তি।

মা গো দুর্গা মা, নালিং ছাড়া কোনো গতি নাই,
সব কিছু রিজাহাংমালিক
নালিং রিজাক আপনে পিয়ে বিপফট আজারকাট উদ্ধার সয়ে
সব কিছু নালিং থেক এ
নালিং ছারা আলিং কোনো গতি নাই।

সব কিছু নালিং উদ্ধার সরাবে হালিংলে
হিংসা-নিন্দা খাতো উদ্ধার ছে
হিংসা নিন্দা পালোটরা পেইনা ফোকা
ঠাকুরোং নাম, মাই জ্ঞান সুষ্ঠু জ্ঞান হুতুম হালিং।
ফোকা পালোত য়ে।
মা গো দুর্গা মা দুর্গতি ছারাইয়ে
দুর্গতি পেইনা থাকা বেমার আজার কা তাইনা সয়ে

দয়ই দুশমন তেই না, দয়ই দুশমন কাত উদ্ধার সয়ে

সব নালিং হালিং লে সান্তি বর পিরা উয়ে।

বাংলা ভাষা

মাগো, দুর্গা মা, আপনি আমাদের এবং আমাদের সবাইকে

পশুপাখি, কীপপতঙ্গ, গাছপালা

সকলকে আপনি আশীর্বাদ দিয়ে যাবেন।

সকলকে অসুখ-বিসুখ থেকে এবং দুশমন

ও বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন এবং সুখে রাখবেন।

বছরে বছরে যেভাবে আমরা

শুধু আপনার নাম নিতে পারি,

এবং স্মরণ করতে পারি

সকলকে সুস্থ জ্ঞান, সুস্থ বুদ্ধি দিয়ে যাবেন।

এভাবে সকল জীবজন্তু পশুপাখি এবং গাছপালা

সবাইকে যেন আপনি শান্তি দেন।

ঔম শান্তি শান্তি শান্তি।

পাত্রদের পূজা-অর্চনার ধারণাকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে–দৈনন্দিন বা প্রাত্যহিক পূজা এবং বিশেষ বা বিশেষ সময়ে অনুষ্ঠিত পূজা। পাত্রদের প্রাত্যহিক পূজার তালিকায় রয়েছে-গৃহদেবতা, নারায়ণ, মহাদেব, লক্ষী, বিপদনাশিনী প্রভৃতি পূজা। নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠিত পূজার মধ্যে কালিপূজা, দুর্গাপূজা, স্বরস্বতী পূজা, লক্ষীপূজা, মহাদেব পূজা বিখ্যাত। পাত্রদের নিত্য পূজা বা প্রাত্যহিক পূজা দিনের দুটি ভাগে অনুষ্ঠিত হয়; যেমন-*মঙ্গলারতি*-যার মাধ্যমে দিনের শুরুতে সবার জন্য মঙ্গল কামনা করা হয়, *সন্ধ্যারতি* পূজা-যা সন্ধ্যার সময় দেবতার নামে প্রার্থনা করা হয় এবং প্রার্থনার পর দেবতাদের নামে প্রসাদ দেওয়া হয় (ছবি: পরিশিষ্ট ৩.১৮ দ্রষ্টব্য)।

১০.৭.২ সামাজিক অনুষ্ঠান সংক্রান্ত শব্দ

পাত্র সমাজে বিভিন্ন সামাজিক উৎসব প্রচলিত রয়েছে; এসব উৎসবের মধ্যে *ফাক খুং*, কর্ণবেদ প্রথা, *তিল সংরাইন* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১০.৭.২.১ *শিকার শব্দ*

শূকর শিকার করাকে পাত্ররা *ফাক খুং* উৎসব বলে। ফাক খুং অর্থ শিকার, আর ফাকুং লার অর্থ শিকারের নেতা। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম থেকে আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি এবং আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস থেকে এই শিকারের সময়। এই সময় শিকারের *পানজাল* বা পায়ের চিহ্ন বের করা সহজ হয়। শিকারের আগে *রাইজেঞা* অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ উৎসব পাত্রদের মধ্যে হৃদ্যতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। পাত্র এলাকায় বনজঙ্গল হ্রাস পাওয়ার ফলে পাত্রদের মধ্যে এই অনুষ্ঠান খুব কমই অনুষ্ঠিত হয়।

১০.৭.২.২ *তিল সংরাইন অনুষ্ঠান*

পাত্র আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে *তিল সংরাইন* অন্যতম। প্রতিবছর তারা এই উৎসব পালন করে থাকে। তিল সংরাইনের দিনে ভোরে ঘুম থেকে উঠে স্নান করে আগুন দিয়ে ছোট বড় সবাই উত্তাপ গ্রহণ করে। এ সময় নতুন চাল ও নতুন তিলের গুঁড়ো, কমলা, বাতাসা দিয়ে প্রসাদ তৈরি করা হয়। বয়স্ক ব্যক্তিরা স্নান করার পর তিল দিয়ে সবার কপালে তিলক পরিয়ে দেন। তিলক দেয়ার সময় বলা হয়, 'তিলে তিলে দিন বাড়ে আর দিনে দিনে আয়ু বাড়ে'। কেবল আয়ু বাড়ার জন্য নয়, শীতকাল যাতে দ্রুত শেষ হয়ে রোদের দিন বাড়ে সেই কামনায় এই উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। পাত্ররা মনে করেন যে, মহাভারতের ভীষ্ম দেবের মৃত্যুর সঙ্গে এই অনুষ্ঠানের সাযুজ্য রয়েছে। 'নির্দিষ্ট কোনো বৃক্ষের আরাধনাও উদ্ভাবিত হয়েছে একই বিশ্বাসের রূপান্তর হিসেবে। মিঃ ফারগুসন মনে করেন, বৃক্ষ পূজার এই ব্যাপারটা ব্রাহ্মণরা গ্রহণ করেছে আদিবাসীদের কাছ থেকে' (উদ্ধৃত, ওয়াইজ, ২০০০: ৩৯)।

১০.৭.২.৩ *মাখাই বা বঘাই সেবা উৎসব*

পৌষ ও মাঘ মাসে বাঘের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পাত্ররা *মাখাই বা বঘাই* নামে একটি উৎসব পালন করেন। গভীর অরণ্যে বসবাসকারী পাত্রদের বন্য পশুপাখির সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে বাঁচতে হতো। ফলে পাত্ররা এরূপ উৎসব নিয়মিতভাবে পালন করতেন। এখন আর বাঘের ভয় নেই বলে এ উৎসবের গুরুত্ব অনেকটাই ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে। তবুও পাত্ররা সংস্কৃতি রক্ষার প্রয়াসে এরূপ উৎসব পালন করেন। খিসানের (১৯৯৪: ১৬৮) উক্তিতেও বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়-

> সিলেটে মাত্র ৫০/ ৬০ বৎসর আগেও মাখাই বা বঘাই সেবা বলে এক প্রকার অনুষ্ঠান হতো। এর প্রধান উদ্দেশ্য বাঘকে সন্তুষ্ট করা। এটা শীতের সময় পৌষ- মাঘ মাসে হতো। আর বাঘের কবলে মানুষ ও গৃহপালিত অসংখ্য পশু প্রাণ হারাতো। বাঘের এ উপদ্রব থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য গান গাওয়া হতো। এ অনুষ্ঠান পাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে।

১০.৭.২.৪ মৃতের সৎকার সংক্রান্ত শব্দ

একজন মানুষের জীবনচক্রের শেষ অধ্যায় হলো মৃত্যু। তাই মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও সমাজে বসবাসকারীদের নিকট এ অধ্যায়টি নানাবিধ কারণে গুরুত্বপূর্ণ। অতএব মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি কামনার্থে বিভিন্ন সমাজে রয়েছে নানাবিধ লোকায়ত আচার-অনুষ্ঠান (হাসান ও অন্যান্য, ২০১১)। পাত্রদের প্রতিটি গ্রামে শ্মশানঘাট ও কবরস্থান রয়েছে। মৃতব্যক্তিকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় খাটিয়া করে। এই খাটিয়া বানানোর সময় অনেকে বলে-

পাত্র ভাষা

হায়নে যেরানি থিনা, লাকলাং হরানি লগে উনা
পা, পই যে লগে ওয় না।

বাংলা ভাষা

আমার যেদিন মৃত্যু হবে, খাটিয়ার বাঁশ সাথে যাবে

মা- বাবা সাথে যাবে না।

মৃতদেহ বহন করার সময় বহনকারীরা সমস্বরে বলতে থাকে-

হরি হর হে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
যাদবায় মাদবায় কেশবায় নমঃ।

পাত্ররা বিশ্বাস করেন যে, মৃত ব্যক্তির আত্মা খাঁচামুক্ত করার জন্য *আনুং বুক* (ভাত) ও *খর* বা *হান্ডি* (পাত্রদের প্রস্তুতকৃত মদ) প্রয়োজন। তাই পাত্ররা এসব খাবারের সঙ্গে অক (মাছ), পান-সুপারি, তীর ও ধনুক ইত্যাদি সমাধির কাছে রেখে দেন। সমাধি শেষে সমাধি কাজে নিয়োজিত অংশগ্রহণকারীরা স্নান করেন। তারপর মৃত ব্যক্তির কাফনের আলাদা দেড়গজ কাপড় ও টাগা আবার ভালভাবে ধৌত করে এবং এই কাপড় থেকে টাগার সম পরিমাণ এক টুকরো ছিঁড়ে একটি লোহা বেঁধে দেয়া হয়। তারপর টাগা ও কাপড় মৃত ব্যক্তির জ্যেষ্ঠ ছেলের শরীরে জড়িয়ে দেয়া হয়। এটাকে পাত্র ভাষায় বলা হয় *ধারা* (শোক পালনের চিহ্ন)। এগার দিনের দিন মৃত ব্যক্তির মঙ্গল কামনায় শ্রাদ্ধের আয়োজন করা হয়। শ্রাদ্ধের জন্য যে স্টেজ সাজানো হয়, পাত্র ভাষায় তাকে বলা হয় *কীর্তনের আলং*। তিনমাস পর মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে পাত্ররা পালন করে *থিরাম দেবতার* পূজা।

১০.৮ সামাজিক বিধি-নিষেধ সংক্রান্ত শব্দ

প্রত্যেক সমাজের মূল্যবোধ, আদর্শ, নীতি-নৈতিকতা, প্রথা, বিশ্বাসের একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে। মূলবোধ ও আদর্শের পরিপন্থি কাজগুলোকে অনেক সমাজে সামাজিক বিধি-নিষেধ বলে ধরা হয়। অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় পাত্র সম্প্রদায়েরও সামাজিক বিধি-নিষেধ বিদ্যমান। এসব বিধি-নিষেধের যেমন

ইতিবাচক দিক রয়েছে তেমনি রয়েছে নেতিবাচক দিক। পাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে এসব প্রচলিত বিশ্বাসের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ গুরুত্বপূর্ণ।

১০.৮.১ বিয়ের বিধি-নিষেধ সংক্রান্ত শব্দ

শ্যালিকাকে বিয়ে করা পাত্র সমাজে নিষেধ। এ ছাড়া বড় ভাইয়ের স্ত্রীকে বিয়ে করাও পাত্র সমাজে নিষেধ। বিয়ের দিন বর-কনে মধু ও ফলমূলসহ বাড়িতে *ঢং* (ঈশ্বরের সেবা) না করা পর্যন্ত কনের বাবা-মা বরের বাড়িতে কোন খাবার খেতে পারে না।

১০.৯ অপভাষা (slang) সংক্রান্ত শব্দ

১০.৯.১ গালি সংক্রান্ত শব্দ

ভাষার শিষ্ট রূপের বাইরে গালি দেয়ার ভাষাকে এক কথায় বলা যেতে পারে অপভাষা। পৃথিবীর সব ভাষাতেই এই অপভাষা প্রচলিত রয়েছে। পাত্রভাষাও এর ব্যতিক্রম নয়। দৈনন্দিন জীবনে পাত্ররা এ ভাষার মাধ্যমে মনের ক্ষোভ, আক্ষেপ, ঘৃণা ও আবেগ প্রকাশ করে থাকে, যেমন-

পিসাই চাকলাই- শালা	খইং শাসু/ শাচু - কুকুরের বাচ্চা	ফাকুং ছাচু- শূকরের বাচ্চা
পিশাং ইজর- শালী	ছিনং ছিনং - গরুর গরু	গোষ্ঠী মাইলই - গোষ্ঠী
কিলাই খইন খই - কুত্তা	খাপুইন খাপুই- বানরের বানর	ছিলানুং ছাওয়া- ছিলানের ছেলে
চিনং ছাচু- গরুর বাচ্চা	ছিনাল- বেশ্যা	ঝকনা- ধর্ষণ/ চুদা
পোখতি - পুটকি মারা	বাংলাগাত- ছোট লোক	বাংলে ইনিলো- উপহাস
বাঙজাত মাইলই- অমানুষ	লাংয়াত- নোংরামি	লাংয়াত বাং- বাজে লোক
লাংয়াত খাসলত- বাজে আচরণ	শরম পিকা- চরিত্রহীন	নতিং ছাওয়া- নটির ছেলে
পুংগাং ছাওয়া- পুংগার ছেলে		

১০.৯.২ বিবাদ সংক্রান্ত শব্দ

- উছকা পিলো- ধাক্কা দেয়া
- কাইজ্জা সলো- ঝামেলা বাঁধানো
- ঘাই- ছুরিকাঘাত
- থেংকুং বম- লাঠির আঘাত
- বম- মারা/ আঘাত করা
- মুটকি- মুষ্ঠ্যাঘাত
- হুতুম- নিক্ষেপ করা
- ছিনালের ছিনাল- (খারাপ মেয়ে); এক মেয়ে আরেক মেয়েকে গালি দেয় এর মাধ্যমে।

- ছিনং - এর অর্থ গরু। এটি পাত্ররা গালি হিসেবেও ব্যবহার করে।
- খই খাচো- কুকুরের বাচ্চা।
- এই হালার হালা নাঅইলে হাইবিয়াছে- এই শালা তোর মাকে বিয়ে করব।
- এই হালার হালা নাংইজরআইলে বিয়াছে- এই শালা, তোর বোনকে বিয়ে করব।
- নালে হাই লোত্রাহিনা- তোমাকে আমি দেখে ছাড়ব।

১০.১০ পাত্র ভাষার শব্দভাণ্ডারে কোড মিশ্রণ

১০.১০.১ শব্দ পর্যায় কোড মিশ্রণ

পাত্র ভাষায় কোড মিশ্রণের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এ ভাষায় বাংলা, ইংরেজি, সিলেটের আঞ্চলিক ভাষাসহ অন্যান্য ভাষার শব্দের মিশ্রণ লক্ষণীয়, উদাহরণস্বরূপ– রাইন**দিন** (বর্ষাকাল), চুম**দিন** (শীতকাল), **জুয়ান** ছাওয়া (যুবক), **জবা**ং মৌর (জবা ফুল), **বাইজ** বড়ি (বাজপাখি), **পয়লা** খেগাও (প্রথম প্রসব), **পাল** চালো (পাল নেওয়া), নাং**দুল** (কানের দুল), মাই **বাড়ি** (পরিচ্ছন্ন বাড়ি), **কাকা বাপ** (সৎ পিতা), **মিঠাই** জরুংবাং (মিষ্টি বিক্রেতা), **বুড়া আংগুইল** (বৃদ্ধাঙ্গুল), **জবান** দাই (বোবা), **মায়া**সালো (ভালোবাসা), **মন**দুয়াই (অমনোযোগী), **মনপিরা** (ইচ্ছামত), সরমুং **মাত** (লজ্জার কথা), **সরম** খলংখং (লজ্জা পাওয়া) প্রভৃতি।

১০.১০.২ বাক্য পর্যায় কোড মিশ্রণ

পাত্র ভাষায় বাক্য পর্যায়ও কোড মিশ্রণ লক্ষ করা যায়, উদাহরণস্বরূপ– সুমন প্রত্যদিন ফুটবল জল্লো, অর্থাৎ সুমন প্রতিদিন ফুটবল খেলে। এরূপ–

১. বান্দরবান কাতো রাঙামাটি উম কয় সময় লাগিলা ? (বান্দরবান থেকে রাঙামাটি যেতে কত সময় লাগে)।
২. আলাং খুব শক্তিশালী আন বুদ্ধিমান (সে খুব শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান)।
৩. ঢাকা বাংলাদেশুং রাজধানী (ঢাকা বংলাদেশের রাজধানী)।
৪. যে শরম (কী লজ্জা)।
৫. ডাখাইত ফুকা লাঠিমারিকাং (ডাকাতকে লাঠি দিয়ে মারা হয়েছে)।
৬. মাই ছাত্রতুমলা পুরস্কার পিনা (ছাত্রদেরকে পুরস্কার দেওয়া হবে)।

১০.১১ উপসংহার

কোন সমাজই স্থির নয় কিংবা অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থা নয়। সমাজের গতিশীলতা ও পরিবর্তন সাধারণ ঘটনা। পাত্র সমাজের ক্ষেত্রেও এ কথাটি সমভাবে প্রযোজ্য। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে পাত্রদের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে লক্ষণীয় পরিবর্তন এসেছে। পাত্রসমাজের সংস্কৃতি, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাদের ভাষার প্রতীকসমূহ গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় হিসেবে ভূমিকা পালন করে আসছে। কাজেই পাত্রদের নিজস্ব শব্দভাণ্ডার দিয়ে সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান ব্যাখ্যা করা যায় সাবলীলভাবেই। মাঠ গবেষণায় লক্ষণীয় যে, পাত্রদের জীবনে যেমন সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটেছে, তেমনি ঘটেছে তাঁদের শব্দভাণ্ডারের পরিবর্তন। কারণ সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে ভাষা পরিবর্তনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ববহ। তবে একথা স্বীকার্য যে, সংস্কৃতির গ্রহণ-বর্জন একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। পাত্র সংস্কৃতিও এর ব্যতিক্রম নয়। পাত্র সংস্কৃতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তন-পরিমার্জন হচ্ছে এবং এ সংস্কৃতি সিলেটের সংস্কৃতির অনেক কিছুই গ্রহণ করছে। গ্রহণ-বর্জন যাই হোক না কেন, পাত্রদের উন্নয়নে প্রয়োজন তাদের সংস্কৃতির সাবলীল বিকাশ। তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে হলে জাতীয় সংহতিকরণের (national integration) সাথে তাদের মুক্তি তথা ভাগ্যোন্নয়নের প্রক্রিয়াকে (the process of their emancipation) সম্পৃক্ত করা উপেক্ষণীয় নয়।

একাদশ অধ্যায়
পাত্র ভাষার সংস্কৃতিঃ লোকসাহিত্যিক প্রতিফলন

লোকসাহিত্যিক নিদর্শন ভাষার সমৃদ্ধিকে প্রকাশ করে। লিখিত ভাষার মাধ্যমে এই লোকসাহিত্য স্থিতি লাভ করে এবং তা দেশ-কালের গণ্ডি পেরিয়ে আপন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়। তবে লিখিত রূপ না থাকলে সে ভাষার লোকসাহিত্য কেবল ঐ ভাষা সম্প্রদায়ের মুখে মুখেই চর্চা হতে থাকে। লিখিত বা মৌখিক যেভাবেই চর্চা হোক না কেন কোনো ভাষার লোকসাহিত্য বা লোকসংস্কৃতি ঐ ভাষীর জীবনাচারণের প্রতিফলন। চক্রবর্তী ও অন্যান্য (২০১২: ১৪) এ প্রসঙ্গে বলেছেন–

> লোকসংস্কৃতি হচ্ছে কোনো এক বিশেষ জনগোষ্ঠীর জীবনাচারণের সামগ্রিক দর্পণবিশেষ, যা ঐতিহ্যগতভাবে প্রাপ্ত এবং মৌখিক ও লিখিতভাবে বা প্রথা ও বিভিন্ন রীতিনীতি এবং আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করে থাকে; যেমন-লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোকউৎসব, লোকশিল্প, লোকনৃত্য, লোকধর্ম, লোকসংস্কার, লোকসাহিত্য ইত্যাদি।

লোকসাহিত্যিক এসব নিদর্শন কোনো জাতিগোষ্ঠির ভাষা ও সংস্কৃতি বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কোনো নৃগোষ্ঠির সাহিত্য বিশ্লেষণে ভাষাবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীগণ উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠির গল্প, গান, ছড়া, কবিতা, মিথ প্রভৃতি বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করেন। আধুনিক নৃ-ভাষাবিজ্ঞানে এরূপ বিশ্লেষণকে বলা হয় বর্ণনা (Narratives)। Duranti (2009: 154) এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

> Narratives have always been of interest to anthropologists, In the last few decades, however, there has been a change in the types of narratives that are being studied and in the methods used for their documentation. In addition to the recoding of elicited folktales, myths and other traditional stories, contemporary researchers have been video-tapping and transcribing spontaneous narrative activities that emerge in a wider range of contexts including every day family interaction and political debates in the US and Europe.

পাত্র ভাষার লিখিত রূপ নেই তাই এ ভাষার লোকসাহিত্য পাত্রভাষীর মুখে মুখে চর্চা হয়ে আসছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। এ সাহিত্য মৌখিক ঐতিহ্য নির্ভর হলেও লিখিত সাহিত্যের মূল্যমানের চেয়ে তা কোনো অংশেই কম নয়। এগুলো পাত্র জাতির সংস্কৃতির একটি মূল্যবান উপাদান। পাত্র জাতির ইতিহাস এবং সংস্কৃতি বিকাশে এই সাহিত্যের অবদান রয়েছে। পাত্র লোকসাহিত্য স্বতঃস্ফূর্ত ও কৃত্রিমত্তাবর্জিত। এগুলো বিভিন্ন উপাদানে ঋদ্ধ। আলোচ্য প্রবন্ধে পাত্রদের এই সমৃদ্ধ লোকসাহিত্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে–

১১.১ লোক-সঙ্গীত (folk-songs)

লোকসাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বহুল প্রচলিত জীবন্ত একটি শাখা হলো লোকসঙ্গীত। সঙ্গীত চর্চায় পাত্রদের অতীত ঐতিহ্য রয়েছে। তাঁরা সকল ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবে সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করে থাকেন।

১১.১.১ *জাতীয় সঙ্গীত*: পাত্ররা বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতকে তাঁরা আনুগত্য প্রদর্শন করে থাকেন। তাঁদের ভাষায় এই জাতীয় সঙ্গীতটি নিম্নোক্তভাবে উচ্চারিত হয়-

পাত্র ভাষা

আইন সোনাং বাংলা, হাই নাংলো মাই খুলো।

বাংলা ভাষা: আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।

(বিস্তারিত, পরিশিষ্ট-৪.১ দ্র.)

১১.১.২ *দেশাত্ববোধক গান*: পাত্রদের মধ্যে দেশপ্রেম প্রবল। তাঁরা গানের মাধ্যমে এ দেশপ্রেম প্রকাশ করেন। চক্রবর্তী (২০১২: ১৭০-১৭০) ও অন্যান্য নিচের গানটি তুলে ধরেছেন-

পাত্র ভাষায়

আলিং দেশ সোনার বাংলাদেশ ছেলে, মেয়ে উভয়

সুখ দুঃখ ইনি চুমুর, দয় আর শেষ।

বাংলা ভাষা

আমার দেশ সোনার বাংলাদেশ

সুখ দুঃখ হাসি খুশির নেই কোনো শেষ। [বিস্তারিত, পরিশিষ্ট ৪.২ দ্র.]

১১.১.৩ *ভালোবাসা সঙ্গীত*: পাত্র ভাষীরা মনের কথা ব্যক্ত করে নিম্নোক্ত সঙ্গীতের মাধ্যমে। এর মাধ্যমে তাঁরা মনের আবেগ, অনুভূতি, প্রেম, ভালোবাসা, বিরহ, মিলন প্রভৃতি ব্যক্ত করে থাকে। যেমন-

পাত্র ভাষা

আইন নাংলে এয় মাইলো
নাংলে আইন খেযোং চমআতুং তাওনাইলো।

বাংলা ভাষা

আমি তোমাকে ভালোবাসি।
তোমাকে আমার মনের কথা বলতে পারছি না। (বিস্তারিত, পরিশিষ্ট-৪.৩ দ্র.)

১১.১.৪ *ভালোবাসা সঙ্গীত:* মনের অনুভূতি পাত্ররা এসব সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। এসব সঙ্গীতের মাধ্যমে তাঁরা হৃদয়ের ভালোবাসা, বিরহ, প্রেম ইত্যাদির প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকেন।

পাত্র ভাষা

রাই খুরা ন্যাংকাইওয়াংলো
হ্যারানিং দাপ্
প্যারেক প্যারেক অ্যার রাই
রানিং অ্যার পোকা দালো
রাইসিক করাইয়াংলো নাং থাকা।

বাংলা

মেঘ দেখে মনে পড়ে
সেদিনের ভোর।
ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ লাল রোদের আবিরে,
ঝলমল হায় আছে তোমার উপরে।

১১.১.৫ *অভিব্যক্তি প্রকাশক সঙ্গীত*: পাত্ররা সঙ্গীতের মাধ্যমে ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে থাকেন। তাঁরা পাওয়া না পাওয়ার বেদনার মূর্ত প্রকাশ ঘটান এসব সঙ্গীতের মাধ্যমে। এরূপ একটি সঙ্গীত হলো-

পাত্র ভাষা

হাই যে দিকা উরা দাইয়ে
হাইন তো ফারাইমাঝে মায়াইলো।

বাংলা ভাষা

আমি দিনে-রাতে শুধু যে
বাড়িতে আসিলে খুব নেশা হয়। (বিস্তারিত, পরিশিষ্ট-৪.৪ দ্র.)
(ছবি: পরিশিষ্ট ৩.২০ দ্রষ্টব্য)

১১.১.৬ *বিরহ সঙ্গীত*: মানুষ মাত্রই সুখ-দুঃখের অনুষঙ্গী। মানুষ ভাষার মাধ্যমে আবেগ, প্রেম, ভালোবাসা ইত্যাদির প্রকাশ ঘটায়। ঠাকুর (২০০২: ৪১) বলেছেন,

> সকল প্রকার কথোপকথনে দুইটি উপকরণ বিদ্যমান আছে। কথা ও যে ধরনে সেই কথা উচ্চারিত হয়। কথা ভাবের চিহ্ন (signs of ideas) আর ধরণ অনুভাবের চিহ্ন (signs of feeling)। কতকগুলি বিশেষ শব্দ আমাদের ভাবকে বাহিরে প্রকাশ করে এবং সেই ভাবের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ে যে সুখ বা দুঃখ উদয় হয়, সুরে তাহাই প্রকাশ করে।

পাত্ররা বিরহ প্রকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকে। এসব সঙ্গীত ব্যক্তি জীবনের কষ্ট, দুঃখ বা না পাওয়ার বেদনাকে প্রকাশ করে। এরূপ সঙ্গীত হলো-

পাত্র ভাষা

পেরেকদা কাতো লে এনরা নেংকরাকা আইন যেখালিসালো

থাইরা উরাংআইন হসালোছারাইলো।

বাংলা ভাষা

আমার ছোট থাকতে যে কষ্ট, বড় হয়েও সে কষ্ট

সেই কষ্ট থেকে আমায় মুক্তি নাই। (বিস্তারিত, পরিশিষ্ট-৪.৫ দ্র.)

১১.১.৭ *প্রার্থনা সঙ্গীত*: অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির ন্যায় পাত্ররা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রার্থনা সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকেন। চক্রবর্তী ও অন্যান্য (২০১২) এ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত সঙ্গীতের উল্লেখ করেছেন-

পাত্র ভাষা

য়োং সুওয়াতুম সতলে ইলিং য়োলে রাদম না।

য়োলে সালাতুম সকলে ইলিং য়োলে রাদম না।

য়োং কেংকা এর মরকুং য়োলে ফাছিনা।।

বাংলা ভাষা

আমরা মায়ের ছেলে সবাই মিলে মাকে ভক্তি/ পূজা

আমরা মায়ের ছেলে সবাই মিলে মাকে ভক্তি/ পূজা করি।

রাঙা পায়ে রাঙা জবা দিয়ে সাজাব।। (বিস্তারিত, পরিশিষ্ট-৪.৬ দ্র.)

১১.১.৮ *নৃত্য গান*: নৃত্য গান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির নিজস্ব সম্পদ। পাত্রদেরও নিত্য সঙ্গীত রয়েছে। এ সঙ্গীত তাঁদের আদিবাসী বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। চক্রবর্তী ও অন্যান্য এমন একটি নৃত্য সঙ্গীতের উদাহরণ দিয়েছেন-

পাত্র ভাষা

ময়ূরী লামলো উলাপ নিগাইরা।

ময়ূরীং লাম খুরা ফারান যে মাইলো।।

বাংলাভাষা

ময়ূরী নাচে নাচে ঐ মেলিয়া পেখম

ময়ূরীর নাচ দেখে প্রাণ জুরালো। (বিস্তারিত, পরিশিষ্ট-৪.৭ দ্র.)

১১.২ ছড়া (Rhyme)

ছড়ার মাধ্যমে কোনো সম্প্রদায়ের মনের ভাব প্রকাশিত হয়। খান (২০০৯: ৪২) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, সব 'সাহিত্যেই ছড়ার একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। বলা যায়, এটি জনজীবন সংশ্লিষ্ট সবচেয়ে সাহিত্য ঘনিষ্ঠ মাধ্যম। লোকজীবনের প্রধান সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিসমূহ গানের পরেই ছড়ার নাম চলে আসে'।

পাত্র ভাষায় ছড়ার প্রচলন রয়েছে। শিশুর মনোরঞ্জন, অবসর যাপন, জ্ঞান ও নীতিশিক্ষা সংক্রান্ত ছড়া ব্যবহার পাত্র সমাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পশুপাখি, জীবজন্তু, মাছ, পাহাড়, নদী, ঝিরি-ঝরনা ইত্যাদির সঙ্গে পাত্রদের স্বভাব, চালচলনের তুলনা দিয়ে এসব ছড়া রচিত হয়েছে-

ছড়া–১

পাত্র ভাষা

অইয়ো হাইলে খেমুং কুনাকা আগলিরা দিং বেলো

হাই যখন জলুং উলো লাংরা দিং দালো

বাংলা ভাষা

মাগো আমার ঘরের কোণে আগলে কেন রাখ

আমি যখন খেলতে যাই চেয়ে কেন থাকো। (বিস্তারিত, পরিশিষ্ট-৪.৮ দ্র.)

ছড়া-২

পাত্র ভাষা

দাই দাই চাখনা দই
দদি ওই এন্না
ওইয়ে দাইয়ে তাওইয়ে।

বাংলা ভাষা

না, না কেঁদো না
দুধ খাওয়াব, নিয়ে ঘুমাব।

ছড়া ৩

পাত্র ভাষা

ওইয়ো ময়না ওই মিগই য়াংদই

ময়নাং মেকা আইন ময়না,

বাংলা ভাষা

ঘুমাও খোকা
ঘুম আসো আমার খুকার চেখে। (বিস্তারিত, পরিশিষ্ট-৪.৯ দ্র.)

ছড়া-৪

পাত্র ভাষা

ওয়ু ওয়ু

আন চায়ে নাং?

দাই

তুমি ভাত খাবে?

না

(ছবি: পরিশিষ্ট ৩.২১ দ্রষ্টব্য) [বিস্তারিত, পরিশিষ্ট-৪.১০ দ্র.)]

ছড়া-৫

পাত্র ভাষা: ওইয়ে পাথর ওইয়ো থোর/ ওইর‍্যা দানাদই।

বাংলা ভাষা: ও বাবা, ওঠো, ও মা ওঠো/ ঘুমিয়ে থেকো না।

১১.৩ ধাঁধা (Riddles)

ধাঁধা লোকসাহিত্যের একটি প্রাচীনতম শাখা। পাত্র সংস্কৃতিতে এই ধাঁধার ব্যবহার রয়েছে। পাত্ররা বিয়ে, কৃষিকাজ, মৃতদেহ সংকার ও ধর্মানুষ্ঠানে ধাঁধা প্রয়োগ করে থাকেন।

ক) পাত্র ভাষা: থামিস কুং মাই চংচুকুং সিথপ।

বাংলা ভাষা: হলুদে ডগমগ দুধে আবরণ।

উত্তর: ডিম (তুই) [বিস্তারিত, পরিশিষ্ট ৪.১১ দ্র.)

১১.৪ বাগধারা (Idioms)

জীবন ও জগতের বিচিত্র ঘটনা, বিষয়, অভিজ্ঞতা মানুষের বাকভঙ্গিতে পরিবর্তন আনে। এ ধরনের বাকভঙ্গি বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। পাত্র ভাষায়ও এ ধরনের বাগধারার প্রচলন বিদ্যমান।

ক) পাত্র ভাষা: য়ুং আলাং মন কাং দয়, ওয়ু পকা বিষলো, মানাপ বা।

বাংলা ভাষা: যাওয়ার ইচ্ছা নেই, অকারণে অজুহাত তুলছে। (বিস্তারিত, পরিশিষ্ট-৪.১২ দ্র.)

১১.৫. প্রবাদ (Proverbs)

ভাষা মাত্রই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এবং স্ব-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। ভাষার যেমন নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি থাকে তেমনি থাকে বিশেষ বাগভঙ্গি। এই বিশেষ ভাবভঙ্গির একটি হলো প্রবাদ। প্রবাদ ব্যবহার পরিবেশ ও সংস্কৃতি নির্ভর। তাই অতি প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের সমাজে প্রবাদের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। চৌধুরী (১৯৯৯: ৯) প্রবাদ সম্পর্কে বলেছেন, 'আমাদের কৃষিভিত্তিক ও কৃষিনির্ভর সমাজে আবহমানকাল থেকে এর দিক-নিদের্শক ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়ে আসছে'। উপমা, বক্রোক্তি, বিরোধাভাস, অতিশয়োক্তি, অলঙ্কার প্রভৃতি বোঝাতে পাত্ররা এ প্রবাদের আশ্রয় নিয়ে থাকেন।

ক) পাত্র ভাষায়: হাওয়া তোং দাং চে ওয়াং আইন মাই।

বাংলা ভাষায়: নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। (বিস্তারিত, পরিশিষ্ট ৪.১৩ দ্র.)

১১.৬ লোককাহিনী (folktale)

আদিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কাহিনী প্রচলিত রয়েছে।

পাত্র ভাষা

ক) ঐরা দাদিং মামাভাইগনা। যে মামা আং বাগিনা সিকদালো, ইজরইন, তো ওয়াসিক। মামায়াং লাইদিসকং। মামা আং খেতকা উদিং।

বাংলা ভাষা

ক) এক ছিল মামা ভাগনে। ভাগনে মামার বোনের একমাত্র ছেলে ছিল। মামার সঙ্গে মামার ঝগড়া হলো। মামা, ভাগনের একটি গরু ধানক্ষেতে মেরে ফেলে। (ছবি: পরিশিষ্ট ৩.২২ দ্রষ্টব্য)

পাত্র ভাষা

খ) হৈরাং হৈরাং দাদিং গাউদিকা পাছিক আর ছাছিক, আলালিং খুব মাইরাদিনউয়ে। হৈরা রানছিক পাওয়াথিরাউকং বাংছাওয়া দাদিং লগুরছিক।

বাংলা ভাষা

খ) অনেক দিনের আগের কথা। এক গ্রামে এক ছেলের বাবা ছিল। তারা স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করত। হঠাৎ একদিন ছেলের বাবা মরে গেল।

গ) পাত্র ভাষা

হইরা দাদিং কততাই বাংনি। আতাকাকালে রানছিক কততাই থাইয়া খিরা পলংকং হুয়াং সাদিং ছাওয়াং রামেন ইসলো হারান। হারানলে আলাং কাকাওয়া খেসা খাই খুলো।

গ) বাংলা ভাষা

একই বাড়িতে বাস করতেন দুই ভাই। হঠাৎ করে বড় ভাই মারা গেলেন। রেখে গেলেন এক ছেলে। ছেলেটির নাম হারান। [বিস্তারিত, পরিশিষ্ট-৪.১৪ দ্র.]

১১.৭ মিথ (myth)

প্রত্যেক সমাজ বা সংস্কৃতিতে মিথ প্রচলিত রয়েছে। তবে সংস্কৃতিভেদে এ মিথের পার্থক্য দেখা যায়। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠিদের মধ্যে মিথের প্রচলন বেশি লক্ষ করা যায়। রায় (১৯৯৪: ২) বলেছেন, 'মিথের মধ্যে গোপনে বা প্রত্যক্ষভাবে ধর্মীয় বোধের গভীরতা, অন্য কথায় রিচুয়ালের উপাদান মিশে থাকে। রিচুয়ালের বাইরের কাজটা মনের ক্রিয়ার ধীরে ধীরে উন্নত হয়; এবং নান্দনিক রূপ পেয়ে সর্বজনীন হয়ে ওঠে'। পাত্র সমাজে এ পৌরাণিক কাহিনী বা মিথের বহুল প্রয়োগ রয়েছে। (ছবি: পরিশিষ্ট ৩.২৩ দ্রষ্টব্য)

পাত্রদের মাঝে টোটেমের ধারণা বিদ্যমান। এ ধারণার অন্তর্গত *বুইল* (কচ্ছপ) পূজা। সপ্তাহের শনি ও মঙ্গলবারে এ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। তবে বর্তমানে এ পূজার প্রচলন খুব কম। পাত্রদের গ্রাম কুশিরগুলে '*কালিথান*' নামে একটি পাথর আছে এটিকে তাঁরা হিন্দুদের কালিদেবীর প্রতীক বলে মনে করেন। কিংবদন্তি আছে যে, কালীথান দেবী পাত্রদেরকে বহিরাগতদের বিশেষত জয়ন্তিকা ও খাসিয়াদের আগমনের পূর্বাভাস প্রদান করত। জয়ন্তয়রা তাই ঐ পাথরকে অপসারণের চেষ্টা করে। এ কাজে তারা ব্যর্থ হয়। ফলে পাথরটি ভেঙ্গে দু'টুকরো হয়ে যায় এবং জয়ন্তিয়ের লোকেরা অর্ধেক পাথর তুলে নিয়ে যায়। তাঁদের রক্ষাকর্তা হিসেবে কালীথানের পূজা ভক্তিসহ সমাপন করেন। (ছবি: পরিশিষ্ট ৩.২৪ দ্রষ্টব্য)

১১.৮ কথোপকথন (dialouge)

কথোপকথনের মাধ্যমে দৈনন্দিন ভাববিনিময় প্রকাশ পায়। প্রাত্যহিক জীবনের কর্মকাণ্ডের স্বরূপ উন্মোচনে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। পাত্ররা কথোপকথনের মাধ্যমে প্রতিদিনের ভাব প্রদান প্রদান করেন। তাঁরা ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ড এই কথোপকথনের মাধ্যমে প্রকাশে সমর্থ হন। দৃষ্টান্ত-

পাত্র ভাষা: গারি কুং ইয়াংকাং মই দামরা ইয়াংকাং? গারি কুং। খ কুং? ইজরথাইকুং। হাইলাং নাংলেবমেতিরা ইয়াংলো। নাং কাকালে নাখানপি। নাং কাখালে তামা দিখুং আনচাখাং? নাং রামেন তামা। মানুসী। মেখা লাগিনা। হুয়ানাং চাখলাই। হাইয়া ইয়াংলো, ইয়াং ইয়াং। ওওই আইন ছালা পেরেকওই। আই রামেন বিধুর পাত্র। আইন ছালা পেরেকওইন রামেন উর্বশী। হাই মালগাওকা দালো। হাই তুমুংউলোপ্রতিদিন। আইন নেংখোরাকালে নেংখ্যাসলো আইন ছালাখানি লে মাইর‍্যা বাংশুয়ে। আলানিং থাইর‍্যা আলানিং ক্যাংকুং দামে। আলানিং লে এন্না হাই বেজান মেখ খুলো। আইন মিগোয়খা ইসোলো হুতুংলে এনরা ইয়াখা দিশে।

বাংলাভাষা: গাড়ি দিয়ে আসলেন, না হেটে আসলেন? গাড়ি দিয়ে। কার সাথে? দাদীর সঙ্গে। এই দেখ, তোমাকে ও মারার জন্য আসছে। তোমার কাকাকে চুমু দাও। তোমার চাচাকে বলো 'কী দিয়ে ভাত

খেয়েছেন?' তোমার নাম বলো। মানুসী। চোখে লাগবে। ও, তোমার নানা। ঐ যে আসছে, আস আস। এটা আমার ছোট মেয়ে। আমার নাম বিধুর পাত্র। আমার মেয়ের নাম উর্বশী। আমি মালগাও বাস করি। আমি প্রতিদিন কাজে যাই। আমার স্বপ্ন হলো দুটো মেয়েকে মানুষের মত মানুষ করব। ওরা বড় হয়ে নিজের পায়ে দাড়াবে। আমি ওদের নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখি। আমার ভবিষ্যৎ স্বপ্ন ওদেরকে নিয়ে। (ছবি: পরিশিষ্ট ৩.২৫ দ্রষ্টব্য)

১১.৯ উপসংহার

পাত্র জাতির মুখে মুখে প্রচলিত সাহিত্য খুব সমৃদ্ধ। তাঁরা প্রাত্যহিক জীবন থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি স্তরে এই লোকসাহিত্য প্রয়োগ করে থাকেন। কিন্তু পাত্রদের এই সাহিত্য দিনের পর দিন হারিয়ে যাচ্ছে। পাত্র ভাষায় লিখিত রূপের প্রচলন করে এই সাহিত্য যথাসম্ভব পুনরুদ্ধার করা আবশ্যক। ম্রং (২০১২: ১৩) এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

> সমাজ ও সংস্কৃতির দর্পণবিশেষ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর এই মৌখিক সাহিত্যের এক বৃহদাংশ হারিয়ে যাচ্ছে সংরক্ষণ আর পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে লেখালেখির পরিসর নেহাতই সীমিত। ততোধিক সীমিত মৌখিক সাহিত্য নিয়ে কাজ। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ইতিহাস ও সংস্কৃতি রক্ষার্থে ক্রমশ হারিয়ে যাওয়া এসব সাহিত্য সংরক্ষণ যেমন প্রয়োজন, তেমনি বাংলাদেশের বৃহত্তর জাতিগত সাহিত্য সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধকরণের স্বার্থেও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষদের মৌখিক তথা সকল লোকসাহিত্য সংরক্ষণ অতি জরুরি।

গবেষক, ভাষাবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা থাকলে পাত্র সম্প্রদায়ের এই মৌখিক সাহিত্য লিখিত রূপ দেওয়া সম্ভব।

দ্বাদশ অধ্যায়
পাত্র সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে সুপারিশমালা

কোনো নৃগোষ্ঠির ভাষা ও সংস্কৃতি আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্দিষ্ট নৃগোষ্ঠির উন্নয়নে কিছু পরামর্শ বা সুপারিশমালা উপস্থাপন অত্যন্ত জরুরি। কারণ এটি গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে।

সিলেটে পাত্রদের দীর্ঘদিনের ইতিহাস থাকলেও বর্তমানে তাঁরা নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়েছেন। পাত্র এলাকার বনভূমি কেটে উজাড় করার ফলে পাত্রদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়েছে। ফলে তাঁরা পূর্বের মতো আর সংস্কৃতি চর্চা করতে পারছেন না। বাংলাদেশের অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠির ন্যায় পাত্ররা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে মারাত্মকভাবে বঞ্চিত। আবার আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল পাত্ররা বর্তমানে নিজস্ব সংস্কৃতির অনেক উপাদানই চর্চা করতে পারছেন না। পাত্রদের স্বতন্ত্র মৌখিক ভাষা থাকলেও এ ভাষার কোনো লিপি ও লিখিত নিদর্শন নেই বলে এ ভাষা বর্তমানে সমস্যায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ অবস্থা থেকে তাঁদের উত্তরণ আবশ্যক। পাত্রদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের সুপারিশ করছি-

প্রস্তাব-১: পাত্রদের ভাষা সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি নিয়ে পৃথক কোনো জরিপ কাজ হয়নি বলে তাঁদের সংখ্যা নিয়ে যেমন মতানৈক্য আছে তেমনি অস্পষ্টতা আছে ভাষা নিয়ে। চাকমা ও চাকমা (২০১৫: ৩০) উল্লেখ করেছেন-

> বাংলাদেশের বাঙালি ভিন্ন ৪৫টির অধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিবাসী জাতি রয়েছে। কিন্তু দেশের সংবিধান সে কথা স্বীকার করে না। বাংলাদেশের সংবিধানের এসব জাতি সম্পর্কে সরাসরি কোনো কিছুর উল্লেখ নেই। তবে সংবিধানের ২৭ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী।' অনুরূপভাবে ২৮(১) অনুচ্ছেদে কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র কোনো বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না' বলে বৈষম্য নিবারণ করা হয়েছে। ২৮ (৪) অনুচ্ছেদে নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোনো অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না মর্মে বিধান করা হয়েছে। শেষোক্ত দফায় বর্ণিত 'নাগরিকদের যে কোনো অনগ্রসর অংশের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিবাসী বা সরকারি ভাষায় উপজাতি জনগোষ্ঠীসমূহকেও

Dhaka University Institutional Repository

> সরকারিভাবে নির্দেশ কর হয়। অধিকন্তু সংবিধানের ২৯ (২) অনুচ্ছেদের (ক) উপ-দফায় আরো বলা হয়েছে যে, নাগরিকদের যে কোনো অনগ্রসর অংশ যাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করতে পারেন, সে উদ্দেশ্যে তাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা হতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না।

পাত্রদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যবাহী ভাষা রয়েছে। কিন্তু এ ভাষা দিনের পর দিন হারিয়ে যাচ্ছে। কাজেই পাত্রদের ভাষা সংরক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে-

ক) ভাষা সংরক্ষণ (Language Documentation) কাজে পাত্র সম্প্রদায়কে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত করা;

খ) পাত্র সম্প্রদায়ের প্রতিটি গোত্র থেকে কিছু ব্যক্তিকে ভাষাশিক্ষক (Language Teacher) হিসেবে প্রশিক্ষণ দেওয়া যাতে তাঁরা নিজেদের মাতৃভাষার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারেন।

গ) পাত্র ভাষার ব্যাকরণ রচনার জন্য এ ভাষার শব্দ ও বাক্য পর্যায়ে উপাত্ত আহরণ ও সংরক্ষণ করা।

প্রস্তাব-২: *পাত্রদের মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে*

পাত্রদের নিজস্ব ও ঐতিহ্যবাহী ভাষা থাকলেও তাদের ভাষার বর্ণমালা নেই। এ কারণে পাত্র শিক্ষার্থীরা নিজস্ব ভাষায় পড়ালেখা করতে পারে না; বাধ্য হয়ে তাঁদেরকে বাংলা ভাষায় পড়ালেখা করতে হয়। ফলে পাত্র শিক্ষার্থীরা যথার্থ শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই পরিস্থিতি বাংলাদেশের অন্যান্য আদিবাসীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এ প্রসঙ্গে চাকমা ও চাকমা (২০১৫: ৩৬) বলেছেন–

> আদিবাসী ছেলেমেয়েদের স্কুল জীবন থেকে ঝরে পড়ার অন্যতম একটি কারণ ভাষাগত সমস্যা। স্কুলের প্রথম দিনে যখন অপরিচিত বাংলা ভাষায় একজন আদিবাসী শিশুকে পাঠদান করা হয় সে স্বাভাবিকভাবে কিছু না বুঝে স্কুলের প্রথম দিন থেকে কঠিন এক অবস্থার মুখোমুখি হয়। ফলে পড়ালেখার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ধীরে ধীরে স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। অন্তত প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করা হলে শিক্ষার্থীর মনে শিক্ষার বিষয়বস্তু আরো সহজ ও বোধগম্য হতো। কিন্তু জাতীয় শিক্ষানীতিতে এসব কখনোই অন্তর্ভুক্ত হয়নি বা অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তাভাবনাও করা হয়নি। আদিবাসীদের এ ধরনের স্বতন্ত্র ও বিশেষ প্রেক্ষাপটগুলো জাতীয় শিক্ষা নীতিতে সন্নিবেশিত না হলে আদিবাসীদের সামগ্রিক শিক্ষা বিস্তার এক কথায় সুদূর পরাহত।

Dhaka University Institutional Repository

উপরের উদ্ধৃতির আলোকে বলা যায় যে, এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য পাত্রদের স্বভাষায় শিক্ষাদানের কোনো বিকল্প নেই। সরকারকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া আবশ্যক।

প্রস্তাব-৩: *পাত্র লোকসাহিত্য সংরক্ষণ*

বাংলাদেশের অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির ন্যায় পাত্রদের সমৃদ্ধ সাহিত্য ভাণ্ডার রয়েছে। পাত্রদের মুখে মুখে এসব লোকসাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে এ লোকসাহিত্য আহরণ সহজ নয়। কারণ 'বাংলাদেশের আদিবাসীদের লোকসাহিত্য উৎকৃষ্ট হলেও তা উদ্ধার ও সংরক্ষণ করা অনেক কঠিন' (দোহা, ২০০৮: ১১)। কাজটি কঠিন হলেও পাত্র সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধ লোকসাহিত্য বিশেষ করে প্রবাদ প্রবচন' বাগধারা-বাগবিধি, গান, ধাঁধা, এক কথায় প্রকাশ, মিথ, লোকবিশ্বাস ও কুসংস্কার, অপরাধ জগতের ভাষা, পাত্রভাষার গল্প, কাহিনী, ছড়া, ঘুমপাড়ানি গান, ঘুম ভাঙানি গান, শিকারের গান, ফসল ওঠা ও উৎপাদনের গান, পশুহত্যা ও পশুবলির গান ইত্যাদি সংরক্ষণ করা অতি জরুরি।

পরিবর্তন একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এবং ইতিবাচক পরিবর্তন সবাই সাদরে গ্রহণ করেন। এ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া পৃথিবীর প্রায় জাতিগোষ্ঠির মধ্যে লক্ষ করা যাচ্ছে। হক এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আজকের দিনে সকল উপজাতির মধ্যেই পরিবর্তনের ঢেউ এসেছে। ফলে তাদের আদিম অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে' (১৯৯৫: ৯)।

পাত্র জনগোষ্ঠির সাংস্কৃতিক জীবনে পরিবর্তনের দিকটি বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে আলোচনায় স্থান পেয়েছে। কারণ এই পরিবর্তনে যেমন বস্তুগত সংস্কৃতি যুক্ত হয়েছে তেমনি অবস্তুগত সংস্কৃতির অনেক বিষয়ও অনুষঙ্গ হয়েছে, যেমন-পাত্র ভাষার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের বিষয়টি এখানে গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা যায়। পেশা, ধর্ম ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিবর্তনের ফলে পাত্র ভাষার অনেক উপাদান হারিয়ে যাচ্ছে কিংবা পরিবর্তন হয়েছে। তাই ভাষাবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী ও ভাষা গবেষকদের পাত্র ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য উপস্থাপনের প্রয়াস লক্ষ করা যায়।

প্রস্তাব-৪: *পাত্রদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান*

পাত্রদের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড রয়েছে। সনাতন ধর্মের অনুসারী পাত্ররা বর্তমানে ধর্মীয় রীতি-নীতির পরিবর্তন ঘটালেও এখনও অনেক আচারে আদিবাসী হিসেবে তাঁদের নিজস্বতা রয়েছে (হোসেন ও অন্যান্য, ২০০৯)। কিন্তু চরম অভাবের কারণে তাঁরা অনেকেই সেই সাংস্কৃতিক উৎসব পালন করতে সক্ষম নন। তাঁদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করার প্রয়াসে সরকার উদ্যোগী হতে পারেন। সরকার

Dhaka University Institutional Repository

পাত্র এলাকায় সাংস্কৃতিক একাডেমি গঠন করে তাঁদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবিত করতে সচেষ্ট হতে পারেন। এ ব্যাপারে যেসব বিষয় প্রাধ্যান্য পেতে পারে তা হলো-

ক) পাত্রদের নৃত্য-কলা, সঙ্গীত, অভিনয়, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা এবং অবিরত চর্চার মাধ্যমে সেগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা। পাত্র জনগণকে সেগুলো রক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধ করা ও সচেতন করে তোলা।

খ) পাত্রদের নৃত্য, গীত ও অভিনয়ের ওপর স্টাফ শিল্পীদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

গ) নৃত্য, গীত ও অভিনয়ের ওপর পাত্র যুবক-যুবতীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ঘ) পাত্রদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

ঙ) পাত্র সঙ্গীত চর্চা অবিরত রাখার জন্য সঙ্গীতের উপর প্রশিক্ষণ পরিচালনা।

প্রস্তাব-৫: *ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি হিসেবে পাত্রদেরকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান*: বাংলাদেশের সংবিধানে দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির অধিকার সম্পর্কে সরাসরি কোনো আলোচনা নেই। তবে সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী। অনুরূপভাবে ২৮ (১) অনুচ্ছেদে 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না' বলে বৈষম্য নিবারণ করা হয়েছে। দেশের পশ্চাৎপদ জনসাধারণের উদ্দেশ্যে সংবিধানে উল্লেখ আছে- ২৮ (৪) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- 'নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোনো অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না'। এই অনুচ্ছেদে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও তাঁদের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে দেশের আদিবাসীকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সিলেটের আদিবাসী পাত্রদেরকেও এ সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা আবশ্যক। কারণ পাত্রদেরকে যদি সাংবিধানিক স্বীকৃতি না দেওয়া হয় তাহলে তাঁদের নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হয়ে পড়বে। বর্তমানে পাত্ররা এই দ্বিবিধ সমস্যায় অবতীর্ণ হয়েছে।

প্রস্তাব-৬: *ভূমির অধিকার নিশ্চিতকরণ*

পাত্ররা ভূমির ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত। বহিরাগতরা পাত্র এলাকায় বসতনির্মাণ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও চাষাবাদের মাধ্যমে পাত্রদের জমি দখল ও জবরদখল করে নিয়েছে। ফলে দিনের পর দিন পাত্ররা নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হচ্ছে। অথচ ভূমিজ সন্তান হিসেবে পাত্রদের অধিকার রয়েছে পাত্র এলাকার জমির ওপর। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার আদিবাসী ও জনগোষ্ঠি সংক্রান্ত ১০৭ সংখ্যক কনভেনশন অনুযায়ী 'ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর আদিবাসীদের সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত মালিকানা লাভের অধিকার রয়েছে এবং

Dhaka University Institutional Repository

তাদের ভূমি ও ভূখণ্ড থেকে তাদেরকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ থেকে রেহাই পাওয়ার অধিকার রয়েছে (চাকমা ও চাকমা, ২০১৫: ৩৩)। পাত্রদের ভূমির অধিকার সম্পর্কে পাত্র (২০১৪: ২) বলেন-

> পাত্র জনগোষ্ঠির স্ব-ভূমির দলিল দস্তাবেজসহ বৈধ মালিকানা রয়েছে। পাহাড়টিলা ও সমতল উভয় প্রকারের জমিতেই তাদের মালিকানা আছে। তবে বেশিরভাগ পাত্র জনগোষ্ঠির জমিগুলোর অবস্থান ছিল পিগাড়ীটিলায় যা তুলনামূলকভাবে কম উর্বর। ২০০৫ ও ২০০৬ সালে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা বারসিক পরিচালিত এর এক জরিপ থেকে জানা যায়, বর্তমানে সিলেট জেলার ৩টি উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে ৩২টি গ্রামের ৫৫২টি পাত্র পরিবারের মোট জমির পরিমাণ হলো (মালিকানাধীন ও দখলি) ২৯৩.০১ একর। এর মধ্যে মালিকানা (বৈধ কাগজপত্র দলিল, পর্চা, রেকর্ড, নকশা আছে) এমন জমির পরিমাণ ২৭৯.৩৯ একর এবং খাসজমি (নিজস্ব দখল সত্ত্বেও) রয়েছে ১৩.৩৫ একর। বিগত ৮-১০ বছরে পাত্র সম্প্রদায়ের (অআদিবাসীদের দ্বারা জালিয়াতি, জবরদখল ও প্রতারণার মাধ্যমে, অধিগ্রহণের কারণে) বেহাতি হয়েছে ৩৪.০৩ একর জমি। অপরদিকে বৈধ মালিকানাধীন ২৭৯.৬৬ একর জমির মধ্যে বর্তমানে মামলাধীন জমিও রয়েছে। পাত্রদের মধ্যে বহু ভূমিহীন কম রয়েছে। ভূমি বিক্রি, জালিয়াতি, স্থানান্তর (ভারতে চলে যাওয়া) জমি অধিগ্রহণ, প্রতারণা, জবরদখল ও ভূমি সংক্রান্ত মামলা চালাতে গিয়ে এখন ভূমিহীনে পরিণত হয়েছে।

এভাবেই ঐতিহ্যগত ভূমি ও বসতভিটার অধিকার হারিয়ে সর্বহারা দশায় উপনীত পাত্র সম্প্রদায় আজ হারিয়ে ফেলছে জীবন ধারণের ন্যূনতম অধিকার। পাশাপাশি ঘটছে ভূমিদস্যু ও প্রভাশশালী চক্র কর্তৃক পাত্রদের ভূমি ও বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ, পাত্র সম্প্রদায়কে নির্যাতন, হয়রানি, তাদের ভূমির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত ইত্যাদি। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য পাত্রদেরকে ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক।

প্রস্তাব-৭: *শিক্ষাক্ষেত্রে পাত্রদের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে*

আমরা জানি, শিক্ষা উন্নত জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। 'শিক্ষা একটি অধিকার। শিক্ষার অধিকার একটি বিশ্বজনীন স্বীকার্য বিষয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা সকলের জন্য মানসম্মত শিক্ষার অধিকার সুরক্ষিত করা হয়েছে' (রশীদ ও রিতু, ২০১৬: ৩১)। বাংলাদেশের সংবিধানে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি প্রতিষ্ঠানসহ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিক্ষার্থীদের জন্য কোটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। পাত্ররা যাতে নির্বিঘ্নে এই সুবিধা গ্রহণ করতে পারে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে। পাত্রদের শিক্ষার বর্তমান চিত্র সম্পর্কে হোসেন ও অন্যান্য (২০০৯: ১২৭) বলেছেন-

Dhaka University Institutional Repository

> শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি অধুনা পাত্রদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি হলেও অভাবের কারণে অচিরেই ভাটা পড়ে এই জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের। এছাড়া জানা যায় কবছর আগেও এই অঞ্চলের আশপাশে বা নিকট দূরত্বের মধ্যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। যাতায়াতের সহজ রাস্তা ছিল না। ফলে, বহু বছর তাদেরকে শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে তারা সবাই কমবেশি শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন। শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী প্রতিটি পরিবারের শিশুরা এখন বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। তবে সাধারণত প্রাথমিক পর্ব পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেও দরিদ্রতার কারণে অধিকাংশ পাত্র শিক্ষার্থী মাধ্যমিক স্তর থেকে ঝরে পড়ে।

পাত্ররা অস্বচ্ছল বলে ছেলেমেয়েদেরকে উচ্চশিক্ষা তো দূরের কথা প্রাথমিক ও উচ্চবিদ্যালয়ে পড়াতে পারে না। সরকার যদি পাত্র এলাকায় প্রয়োজনীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে এবং গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করে তাহলে পাত্ররা পড়ালেখায় উৎসাহী হবে এবং দেশের বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

প্রস্তাব-৮: *অর্থনৈতিক অধিকার সংরক্ষণ*

সরকারিভাবে উদ্যোগ নিয়ে পাত্রদেরকে অর্থনৈতিক অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে। কারণ অর্থনৈতিক ভাবে অস্বচ্ছল ও দরিদ্র পাত্ররা জীবনের নানামুখী সমস্যায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাই পাত্রদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল করার জন্য সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়ন জরুরি। বাংলাদেশ সরকার নাগরিকদের অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যে আন্তর্জাতিক চুক্তি করেছেন তাতে উল্লেখ আছে 'প্রত্যেক নাগরিকের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে এবং উক্ত অধিকার বলে প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীন ও অবাধে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও বিকাশের অধিকার রাখে' (চাকমা ও চাকমা, ২০১৫: ৩২)।

পাত্ররা বর্তমানে তাঁদের পূর্বের পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছেন। তাঁদের এলাকায় আগের তুলনায় পাহাড় বা বনভূমি না থাকায় তাঁদের পেশার এ পরিবর্তন। এ সম্পর্কে হোসেন ও অন্যান্য (২০০৯: ১২৪) বলেছেন–

> কৃষিকেন্দ্রিক দিনমজুরের পাশাপাশি রিক্সা-ভ্যান চালনা বা জাতীয় শারীরিক শ্রমসাধ্য পেশার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে সিলেট সদরের খাদিমনগর ইউনিয়নের আলাইপুর গ্রামের পাত্র সম্প্রদায়ের মানুষ। হাতে গোনা দুএকজন পাওয়া যায় যারা যৎসামান্য শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়ে ছোটোখাটো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন। ব্যবসা ক্ষেত্রেও নেই তেমন যোগাযোগ। কারণ, শারীরিক শ্রমের বাইরে যে পেশা রয়েছে সেগুলোর জন্য হয় প্রয়োজন হয় অর্থ, নয়তো শিক্ষা। আর এ দুটোই এ যাবৎ অনায়ত্ত রয়েছে এই সম্প্রদায়ের মানুষদের। জীবিকা নির্বাহের জন্য পেশাগত সীমাবদ্ধতার কারণে পরিবারের আয় রোজগার প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। ফলে বছরের অনেকটা সময়েই

Dhaka University Institutional Repository

> তাদের অধিকাংশ ঋণের অর্থে জৈবিক ব্যয় নির্বাহ করেন যা তাদেরকে ক্রমান্বয়ে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর করে দিচ্ছে। বিগত সময়ে জমিজমা ঘরদোর হারিয়ে অন্যের আশ্রয়ে বসবাস করছেন এই গ্রামের অর্ধেক আদিবাসী পাত্র পরিবার।

প্রস্তাব-৯: *সাংস্কৃতিক অধিকার নিশ্চিতকরণ*

ভূমি অধিকার, শিক্ষা অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার, স্বাস্থ্য অধিকার ছাড়াও বর্তমানে পাত্ররা নানাবিধ সমস্যার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করছে। এর মধ্যে তাঁদের অন্যতম একটি সমস্যা হলো সাংস্কৃতিক সমস্যা। অথচ যেকোনো জাতির জন্যই এই সংস্কৃতি অস্তিত্বের পরিচায়ক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। পাত্রদের বৈচিত্রময় সাংস্কৃতিক জীবন আজ বিলুপ্ত প্রায়। সরকারি ও বেসরকারিভাবে পাত্র জাতিসত্তা ও তাঁদের সংস্কৃতি রক্ষার নিমিত্তে তাই অতিসত্তর বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিৎ। চাকমা ও চাকমা (২০১৫: ৩৮-৩৯) এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন-

> বাংলাদেশে বসবাসকারী আদিবাসী জাতির ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, এমনকি প্রথা-পদ্ধতিতে অন্য জাতির চেয়ে আলাদা। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর লোকেরা আদিবাসীদের বর্ণাঢ্য ও বৈচিত্র সংস্কৃতি সম্পর্কে খুব কম জানে। ফলে আদিবাসীদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি, রীতিপদ্ধতি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে।

আমরা জানি, পাত্রদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ও ভাষা রয়েছে। কিন্তু এই ভাষার কোনো লিখিত রূপ নেই বলে পাত্ররা তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের অনেক কিছুই ভুলে যাচ্ছে। তরু (২০০৮: ৮৯) এ প্রসঙ্গে বলেন-

> আদিবাসীদের ভাষার লেখ্যরূপ দেয়ার যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা দূরীকরণ বা বর্ণমালার অভাব মোচনের জন্য জরুরীভিত্তিতে পদক্ষেপ নেয়া আবশ্যক। স্ব- স্ব সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিরা স্ব-স্ব ভাষার বর্ণমালা আবিষ্কারে সমর্থ হলে তাঁদের এমন কোনো শব্দ থাকবে না যা বর্ণে প্রকাশ করা যায় না। আমাদের বিশ্বাস লেখ্যরূপ পেলেই আদিবাসীদের ভাষার সীমাবদ্ধতা দূর হবে এবং চর্চার ফলে ভাষা সমৃদ্ধ হবে। আদিবাসীরা আপন আপন ভাষার প্রতি গর্বিত ও শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবে।

এ অবস্থা চলতে থাকলে বাংলাদেশের অন্যান্য বিলুপ্ত প্রায় ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ন্যায় তাঁদের সংস্কৃতিও একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাই সরকার বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাদের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার্থে যে পদক্ষেপ নিয়েছেন পাত্র সম্প্রদায়কে সেই প্রকল্পে গুরুত্বের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

প্রস্তাব-১০: *রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষণ*

পাত্র সম্প্রদায় রাজনৈতিক অধিকার থেকে অনেকটা বঞ্চিত। অথচ রাজনৈতিক অধিকার যে কোনো মানবগোষ্ঠির গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। রাজনৈতিক অধিকারের মাধ্যমে একজন

Dhaka University Institutional Repository

পাত্র সম্প্রদায়ের সদস্য তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারটি নিশ্চিত করতে পারে। পাত্র সম্প্রদায়ের একজন সদস্যের রাষ্ট্র কিংবা তার উত্তরসূরীর সাথে সম্পাদিত চুক্তি, সমঝোতা স্মারক এবং অন্যান্য গঠনমূলক ব্যবস্থার স্বীকৃতি, প্রতিপালন এবং বাস্তবায়ন করার অধিকার রয়েছে এবং এসব চুক্তি, সমঝোতা স্মারক ও গঠনমূলক ব্যবস্থার অবশ্যই রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভের অধিকার রয়েছে। মাঠ গবেষণায় তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, সিলেটের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি পাত্র সম্প্রদায় রাজনৈতিক অধিকার তো সম্পূর্ণরূপে ভোগ করতে পারেই না বরং উল্টো নানাভাবে রাজনৈতিক হয়রানির শিকার হয়। পাত্র জনগোষ্ঠি অবৈধ গ্রেফতার, বিনা বিচারে আটক, বিচার বহির্ভূত হত্যা, মিথ্যা মামলায় হয়রানি, স্থানীয় প্রশাসন দ্বারা হয়রানি ইত্যাদির মাধ্যমে দমন নিপীড়নের শিকার হয়ে আসছে। কাজেই পাত্র জনোগাষ্ঠিকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। রাজনৈতিক অধিকারের সঙ্গে পাত্রদের নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক অধিকারের সম্পর্ক রয়েছে। কারণ পাত্ররা যদি রাজনৈতিক অধিকার থেকে এভাবে বঞ্চিত হতে থাকে তাহলে তাঁরা বিভিন্ন সংস্কৃতি চর্চা থেকে বঞ্চিত হবে। ফলে তাঁরা ক্রমান্বয়ে একসময় সব ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চর্চা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হবে।

প্রস্তাব-১১: *সরকারিভাবে পাত্রদের বিশেষ বরাদ্দের ব্যবস্থাকরণ*

সিলেটের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি পাত্ররা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক-সব দিক থেকেই পিছিয়ে রয়েছে। দিনের পর দিন তাঁরা আরও চরম দারিদ্যের শিকার হচ্ছেন। সরকার বিশেষ বরাদ্দের মাধ্যমে পাত্র সম্প্রদায়কে এ অবস্থা থেকে মুক্তিদানে উদ্যোগী হতে পারেন। সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা ও এনজিও পাত্র এলাকায় প্রেরণ করে তাঁদের জীবন-মান পরিবর্তনের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে পারেন। বিশেষ করে, ইউএনডিপি, বিশ্বব্যাংক, এডিপি, ইউনিসেফ, ইউনেস্কো, আইএলও ইত্যাদি বিশেষায়িত ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহকে সরকার পাত্র এলাকায় গবেষণার সুযোগ প্রদান করলে পাত্রদের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করতে পারবে। গরিব ও নিঃস্ব পাত্ররা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্যের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে বর্তমানে অনেকেই পূর্বের সাংস্কৃতিক চর্চা চালিয়ে যেতে পারছেন না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অস্বচ্ছল পাত্ররা মৃতদেহকে কবর দেওয়ার রীতি চালু করেছেন কেবল অর্থের অভাবে। এর ফলে মৃতব্যক্তিকে সৎকারের মধ্য দিয়ে তাঁদের যে ঐতিহ্যগত প্রথা ও রীতির প্রচলন ছিল সে সংস্কৃতি যেমন হারিয়ে যাচ্ছে, তেমনি সংস্কৃতির ফলিত ক্ষেত্র তেমনি ভাষাতাত্ত্বিক চর্চারও একটি শূন্যতার সৃষ্টি হচ্ছে। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় পাত্ররা এ ধরনের সাংস্কৃতিক চর্চার পুনরুদ্ধার ঘটাতে সক্ষম হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাব-১২: *পাত্রদেরকে চাকুরী ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে*

বাংলাদেশের সংবিধানে সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির জন্য শতকরা ৫ ভাগ পদ সংরক্ষণ করা হয়েছে। সিলেটে পাত্র সম্প্রদায়ের জন্য এই সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি পাত্ররা যাতে অন্যান্য চাকুরীতেও এরূপ সুযোগ পায় সে ব্যাপারেও সরকারের নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন।

প্রস্তাব-১৩: *চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি*

মানুষের পাঁচটি মৌলিক অধিকারের মধ্যে স্বাস্থ্য একটি। অথচ পাত্র জনগোষ্ঠি এ অধিকার থেকে অনেকটাই বঞ্চিত। পাত্র জনগোষ্ঠি স্বাস্থ্যগত সমস্যা প্রকটভাবে বিরাজ করছে। বাল্যবিবাহ, কিশোরী বয়সে মা হওয়া, গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্যসেবার অপ্রতুলতা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র দূরবর্তী হওয়া, কুসংস্কার, দারিদ্র্য, অসচেতনতা, অপরিচ্ছন্ন জীবনযাপন, স্যানিটেশন সমস্যা প্রভৃতি কারণে তাদের অনেকে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। কাজেই পাত্রদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য সরকারকে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া অত্যাবশ্যক।

প্রস্তাব-১৪: *বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ*

সিলেটের পাত্র সম্প্রদায় বর্তমানে নানা সমস্যায় অবতীর্ণ। তাঁদেরকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এই অবস্থা হতে উত্তরণ সম্ভব নয়। তাই সরকারের উচিত পাত্র সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ বরাদ্দের ব্যবস্থা করে তাদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো। চক্রবর্ত্তী (২০০০: ৮২) এ প্রসঙ্গে বলেন-

> সিলেটের আদিবাসী পাত্র সম্প্রদায় ক্রমক্ষয়িষ্ণু। তাদের জনসংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। অস্বাস্থ্যকর জীবন, অশিক্ষা ও অর্থনৈতিক দূরবস্থা ইত্যাদি বিবিধ কারণ এজন্য দায়ী। এই আদিবাসী পাত্রদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে তাদের ধ্বংস কতকটা অনিবার্য। পাত্রদের উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং উপার্জনের উপায়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখা প্রয়োজন। স্থানীয় বেসরকারী সংস্থার উন্নয় প্রকল্পে পাত্ররা সাধারণভাবে অন্তর্ভুক্ত। পাত্র সম্প্রদায়ের বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ব্যবস্থা যথোপযুক্ত নয়। এখন প্রয়োজন আদিবাসী পাত্র সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রকল্প নেয়া যেখানে তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অর্থ উপার্জনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে।

সিলেটের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি পাত্রদের উন্নয়নের জন্য ভাষা ও সংস্কৃতির পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রেও উন্নয়ন প্রয়োজন। কারণ এসব বিষয় বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক প্রকাশ করে। এ বিষয়ে চক্রবর্ত্তী (২০০০: ৮২)) পাত্রদের উন্নয়ন প্রকল্পে যেসব পদক্ষেপের কথা বলেছেন তা নিম্নরূপ-

Dhaka University Institutional Repository

ক. স্বাস্থ্য পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য পানীয় জল সরবরাহ ও পায়খানা ব্যবস্থার উন্নয়ন। পাত্রদের বসতি গ্রামগুলোতে টিউবওয়েল বসানো এবং আধুনিক পায়খানা ব্যবস্থার সুযোগ সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

খ. শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য এসব গ্রামগুলোকে কেন্দ্র করে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন।

গ. দরিদ্রতা কর্মসূচি গ্রহণ করে ছোট ছোট উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে পাত্রদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। পারিবারিক পর্যায়ে হাঁস, মুরগি ও গরু ছাগল পালন, কুটিরশিল্প তথা বাঁশ ও বেতের কাজে পাত্রদের প্রশিক্ষণ এবং ব্যক্তিগতভাবে এসব কাজে উৎসাহী করে তোলার জন্য সাময়িকভাবে ঋণদান কর্মসূচি গ্রহণ করা আবশ্যক। একই সাথে প্রদত্ত ঋণ নির্ধারিত খাতে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা তার প্রতিও সমানভাবে লক্ষ রাখা প্রয়োজন।

ঘ. পাত্রদের গ্রামগুলোতে বিদ্যুৎ সংযোজন, তাদের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ জাগ্রত করা এবং সর্বোপরি তাদের আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত।

ঙ. পাত্রদের বসতি গ্রামগুলোকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ ব্যাংক ও অন্যান্য বেসরকারি সংগঠনের শাখা প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। ঋণের প্রতি আদিবাসী পাত্র সম্প্রদায়ের বিশষ ভয় রয়েছে। উন্নয়নের জন্য ঋণগ্রহণ এবং ঋণ পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের এই ভীতি দূর করা সম্ভব।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে সিলেটের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি পাত্র সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ও গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তাই পাত্রদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করছি-

১. পাত্রদেরকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান।

২. জাতীয় বাজেটে অনগ্রসর ও অবহেলিত পাত্রদের জন্য বিশেষ বরাদ্দের ব্যবস্থা।

৩. পাত্র সম্প্রদায়ের সঠিক নৃতাত্ত্বিক পরিচয় উদঘাটনের জন্য সরকারিভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ।

৪. পাত্রদের ভূমি জরিপের জন্য একটি পৃথক ভূমি কমিশন গঠন।

৫. পাত্র এলাকার সরকারি খাসজমির পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে স্ব স্ব এলাকার ভূমিহীন পাত্রদের মধ্যে তা বণ্টনের ব্যবস্থা।

৬. পাত্র এলাকার প্রাকৃতিক ও সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বৃক্ষ নিধন, কৃষি জমিতে পরিণতকরণ, কৃত্রিম বন বাগান ও অপরাপর ক্ষতিকর উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাতিল করা।

Dhaka University Institutional Repository

৭. পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বননিধন, চাষাবাদ, পর্যটন ও অন্যান্য কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা।

৮. পাত্র উন্নয়ন কার্যক্রমে স্থানীয় সামাজিক সংস্থাকে অগ্রাধিকার প্রদান।

৯. কৃষিজীবী পাত্র সম্প্রদায়কে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান।

১০. পাত্র অধ্যুষিত অঞ্চলে অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে পাত্র শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

১১. আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত পাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে বিনা বেতনে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়াশুনার সুযোগ প্রদান এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিনাবেতনে পড়ার সুযোগ প্রদান।

১২. পাত্র এলাকার উন্নয়ন সংস্থা পরিচালিত প্রাক-প্রাথমিক স্কুলগুলোকে সরকারিকরণ ও সংশ্লিষ্টদের অভিজ্ঞতায় কারিকুলাম ও প্রাইমার প্রণয়ন।

১৩. সরকারিভাবে পাত্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ ও বিকাশের লক্ষ্যে আলাদা আলাদা পুস্তক প্রণয়ন সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৪. পাত্রদের জন্য একটি পাত্র সাংস্কৃতিক একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা।

১৫. পাত্র গোষ্ঠির সাংস্কৃতিক জ্ঞানসম্পন্ন মানুষগুলো হারিয়ে যাবার আগেই তাঁদের আর্থ-সামাজিক বিষয়াবলির লিখিত রূপ প্রদানে পদক্ষেপ গ্রহণ প্রভৃতি।

সর্বোপরি, বাংলাদেশের পাত্র সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ও ভাষিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সরাসরিভাবে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান। উপর্যুক্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করতে পারলে পাত্ররা পূর্বের গৌরবে প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আইয়ুব, সালাহউদ্দীন। (২০০৮)। *লেখার বিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান*। ঢাকা: অবিনশ্বর

আইয়োব, আলী আহাম্মদ খান। (২০১১)। *গারো পাহাড় অঞ্চলের আদিবাসী*। ঢাকা: শোভা প্রকাশ

আরিফ, হাকিম। (২০১১)। উপভাষাতত্ত্ব ও বাংলা উপভাষা চর্চার সম্ভাবনা। *সাহিত্য পত্রিকা*, বষং ৪৮, সংখ্যা: ৩, ৪৭-৭৪

আরেফিন, হেলালউদ্দিন খান। (১৯৮৯)। *বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞান*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র

আলাউদ্দিন, মোহাম্মদ। (২০০৯)। *সামাজিক গবেষণা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অন্বেষণ পদ্ধতি*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী

আলী, এম হাসান। (২০০৮)। *সামাজিক পরিসংখ্যান পদ্ধতি*। ঢাকা: অনু প্রকাশনী

আলী, সৈয়দ মোর্তজা। (২০০৩)। *হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস*। ঢাকা: উৎস প্রকাশন

আহমেদ, রেহনুমা ও চৌধুরী, মানস। (২০০৩)। *নৃবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ সমাজ ও সংস্কৃতি* । ঢাকা: একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড

ইসলাম, এ কে এম আমিনুল। (১৯৮৯)। *এই পৃথিবীর মানুষ* (দ্বিতীয় খণ্ড)। ঢাকা: বাংলা একাডেমী

ইসলাম, ড. মোঃ নুরুল। (২০০৮)। *ব্যক্তি সমাজকর্ম ও দল সমাজকর্ম পদ্ধতি*। ঢাকা: তাসমিয়া পাবলিকেশন্স

ইসলাম, জাহিদুল। (২০০৭)। ময়মনসিংহ-সিলেট অঞ্চল-ভূমিকা। (সম্পা.) মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য, *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*। ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ৩৪৫-৩৪৮

ইসলাম, পারেশ। (১৩৯৯)। সভ্যতার উৎস সন্ধানে। ঢাকা: *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা, ৫১-৭০

ইসলাম, শফিকুল (অনূদিত) (১৯৯৭)। *দি নেসেসিটি অব আর্ট* (মূল–আর্নস্ট ফিশার)। ঢাকা: সংঘ প্রকাশন

ইসলাম, মাহমুদ। (১৯৭৪)। *নৃতত্ত্বের সহজ পাঠ*। ঢাকা: জে, কে এস এন্ড পাবলিকেশন্স

ওয়াইজ, জেমস। (২০০২)। *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ*, [তৃতীয় ভাগ]। ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

–– (২০০০)। *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ*, [দ্বিতীয় ভাগ]। ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

কামাল, মেসবাহ। (২০১৫)। ভূমিকা। (সম্পা.) মেসবাহ কামাল। *বাংলাদেশের আদিবাসী এথনোগ্রাফিয় গবেষণা*। ঢাকা: উৎস প্রকাশন, ১৩-৪৪।

–– (২০০৭)। ভূমিকা। (সম্পা.) মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য, *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*। ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি, xiii-xlviii

কাশেম, আবুল। (২০০৭)। তাঁত শিল্পে মণিপুরি নারী-অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও সমস্যা। (সম্পা. লক্ষীকান্ত সিং ও অন্যান্য), *Annual Review Of Ethnic Affairs,* সিলেট: *Annual Review of Ethnic community Development Organization*, 97-102

কোরায়শী, গোলাম সামদানী। (১৯৮২)। *ইবনে খলদুন আল মুকাদ্দিমা (অনূদিত)*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী

কৃষাণ, অণিল। (১৯৯৮)। *সিলেটের মণিপুরী সম্প্রদায় ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তা*। সিলেট: সিলেট জেলা তথ্য অফিস

খাঁ, মালেক আনোয়ার। (২০১৪)। *লালেং থারকুং বা পাত্র ভাষার পরিচয়*। ঢাকা: উৎস প্রকাশন

খান, হাফিজ রশিদ। (২০০৯)। *আদিবাসী জীবন আদিবাসী সংস্কৃতি*। ঢাকা: এডর্ন পাবলিকেশন্স।

খান, সাদাত উল্লাহ (২০০৩)। পাত্র। সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলা পিডিয়া*, ২৭৬-২৭৭, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

খিসান, অনিল। (১৯৯৪)। *জিলা পরিক্রমা সিলেট*। সিলেট: সিলেট জেলা তথ্য অফিস

ঘোষ, সুবোধ। (২০০০)। *ভারতের আদিবাসী*। কলকাতা: ন্যাশনার বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

চন্দ, অনুরাধা। (২০০৬)। *সিলেট নাগরির পহেলা কেতাব ও দইখুরার রাগ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং

চক্রবর্ত্তী, রতনলাল। (২০০০)। *সিলেটের নিঃস্ব আদিবাসী পাত্র*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স

চক্রবর্তী, ঈশানী ও আকতার, এস এম শামীম। (২০১২)। *ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মৌখিক সাহিত্য*। ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী

চট্টোপাধ্যায়, অন্নপূর্ণা। (২০১৩)। প্রাচীন বঙ্গে পুণ্ড্র নামক জনগোষ্ঠীর বসতি ও সংস্কৃতির বিবর্তনের প্রতিফলন–প্রসঙ্গ: গ্রামীণ থেকে নগরায়ন। (সম্পা.) মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, *ইতিহাস অনুসন্ধান* ২৭, ১৪১-১৪৮, কলকাতা: *পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ*

চাকমা, মঙ্গল কুমার ও চাকমা, পল্লব। (২০১৫)। বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিসমূহের সার্বিক অবস্থা। (সম্পা.) মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের আদিবাসী–এথনোগ্রাফিয়া,* ২২-৫২ ঢাকা: উৎস প্রকাশন

চৌধুরী, কামাল আবদুল নাসের। (২০১২)। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য। শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। *স্মরণিকা*, ১৯-২২। ঢাকা: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

চৌধুরী, সুজিৎ (১৯৯২)। *শ্রীহট্ট কাছাড়ের ইতিহাস (১ম খণ্ড)*। কলকাতা: প্যাপিরাস প্রকাশনী

চৌধুরী, মতিয়া রহমান (১৯৯৯)। *সিলেট ও সিলেটী ভাষা*। লন্ডন: সিলেটী ট্রানস্লেশন এ্যান্ড রিসার্চ

চৌধুরী, অচ্যুতচরণ। (২০০২)। *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত*। ঢাকা: উৎস প্রকাশন

চৌধুরী, মোমেন। (১৯৯৯)। *নজরুল সাহিত্যে প্রবাদ-প্রবচন-বাগধারা*। ঢাকা: নজরুল ইনস্টিটিউট

জাহান, ইফফাত। (১৩৮০-১৪০০)। *সিলেটের উপজাতি পাত্র*। ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি

জাহিদ, জাহাঙ্গীর আলম। (২০০১)। কুমারখালির প্রাচীন অধিবাসীদের ভাষা। *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, উনবিংশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৭৩-১৮৩

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (২০০২)। আবেগের ভাষা। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), *বাঙালির ভাষাচিন্তা*, ৪১-৪২। কলকাতা: প্রগেসিভ পাবলিশার্স

তত্ত্বনিধি, অচ্যুতচরণ চৌধুরী। (২০০২)। *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত*। ঢাকা: উৎস প্রকাশন

তরু, মাযহারুল ইসলাম। (২০০৮ ক)। *বাংলাদেশের আদিবাসী সংস্কৃতি*। ঢাকা: কথা প্রকাশ

তরু, মাযহারুল ইসলাম। (২০০৮ খ)। আদিবাসী সংস্কৃতি ও লালনে উপজাতীয় কালচারাল একাডেমীর ভূমিকা। *শিল্পকলা*, সপ্তবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ৫৩-৬৮

তারেক, জাহাঙ্গীর। (১৯৯৮)। *শব্দার্থবিজ্ঞানের ভূমিকা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী

দোহা, এম.এস। (২০০৮)। *বাংলাদেশের আদিবাসী সমাজের ইতিবৃত্ত*। ঢাকা: মেলা প্রকাশনী

নকী, সৈয়দ আলী ও রহমান, হাবিবুর। (১৯৮০)। *নৃবিজ্ঞান*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী

নাথ, মৃণাল। (১৯৯৯)। *ভাষা ও সমাজ*। কলিকাতা: নয়া উদ্যোগ

পাত্র, শ্রী গৌরাঙ্গী। (২০১৩)। *পাত্র সম্প্রদায় ভিত্তিক জরিপ*। সিলেট: সিলেট

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমহান। (২০১৩)। *সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান*। কলকাতা: পারুল প্রকাশনী

বিশ্বাস, অশোক। (২০০৫)। *বাংলাদেশের রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী

বিশ্বাস, আবদুল আউয়াল ও আসাদুজ্জামান, মুহাম্মদ। (২০০৭)। সিলেটের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা পাত্র: ভাষা ও সংস্কৃতি। *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ৫০ বর্ষ: ২য় সংখ্যা, ১২৪-১৩৯

মজিদ, মুস্তাফা। (২০১৫)। *ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিচয়*। ঢাকা; বাংলা একাডেমী

মজুমদার, আবু তাহের। (২০০৬)। স্যার উইলিয়াম জোনস: জীবন ও সাহিত্য। (গ্রন্থ পর্যালোচনা, সিরাজুল ইসলাম)। *এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ২৩৭-২৪০

মন্তাজ, সাহেদ। (২০১৪)। *বাংলাদেশের আদিবাসী পূর্বাপর*। ঢাকা: দি স্কাই পাবলিশার্স

-- (২০১৩)। *নৃবিজ্ঞান ভাবনা*। ঢাকা: দি স্কাই পাবলিশার্স

মল্লিক, ভক্তিপ্রসাদ। (২০০২)। লৌকিক ভাষা। (সম্পা.) সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙালির ভাষাচিন্তা*, ১৭৬-১৮০, কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স

মানিক, আবদুল হামিদ। (২০০১)। সিলেটে ভাষা আন্দোলনের পটভূমি। ঢাকা: প্রীতি প্রকাশন

ম্রি, সেলেস্তিন শিশির। (২০০৭)। পাত্র। (সম্পা.) মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য, *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*, ৪৩১-৪৪০, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি

মুরমু, মিথুশিলাক (২০০৯)। *আদিবাসী অন্বেষণ।* ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান

মোহান্ত, রসময় (১৯৯৯)। সিলেটের আদিবাসী: সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন। (সম্পা.) শরীফ উদ্দিন আহমেদ। *সিলেট, ইতিহাস ও ঐতিহ্য*,৬৬০-৬৬৯, ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি

-- (১৯৯৮)। *সিলেট অঞ্চলের আদিবাসী প্রেক্ষিত ও শব্দকর সমাজ সমীক্ষা*। মৌলভীবাজার: আত্ম উন্নয়ন সমিতি (আউস)

মোহসীন ও অন্যান্য। (২০০৭)। *সাংস্কৃতিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১-৩৬

মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর। (১৯৮৫)। *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স

-- (২০১২)। বাক্যতত্ত্বের ভূমিকা। (সম্পা.) রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার, *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যকারণ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম খণ্ড, ৩৩৩-৩৪৬

যাকারিয়া, আবুল কালাম মোহাম্মদ। (২০০৯)। *বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি*। ঢাকা: গ্রন্থকানন

রহমান, এ এস এম আতিকুর। (২০০৮)। *সমাজ গবেষণা পদ্ধতি*। ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স

রহমান, এস.এম. আতিকুর ও শওকতুজ্জামান, সৈয়দ। (২০০০)। *সমাজ গবেষণা পদ্ধতি*। ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স

রহমান, মোঃ মিজানুর। (২০০৭)। বাংলাদেশে সিলেট অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী পাত্র সম্প্রদায়ের সমাজ-সংস্কৃতি: একটি নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান। (সম্পা.) লক্ষীকান্ত সিং, *Annual Review Of Ethnic Affairs*, ৬৯-৮৩, সিলেট: *Ethnic Community Development Organization (ECDO)*

রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। (১৯৯৪)। *নৃ-বিজ্ঞানের রূপরেখা*। ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান

রহমান, মাহফুজুর। (২০০৯)। *সিলেট অঞ্চলে নৃ-তাত্ত্বিক ও ক্ষুদ্র জনাগোষ্ঠী*। ঢাকা : ইত্যাদি প্রকাশন

বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে বসবাসকারী পাত্র সম্প্রদায়ের সমাজ-জীবন ও পাত্র সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থা-২০১৪ এর জরিপের ফলাফল উপস্থাপনা শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করে পাত্র সম্প্রদায় কল্যাণ পরিষদ বা পাসকপ, সাল-২০১৫, স্থান : হোটেল সুপ্রীম, মীরের বাজার, সিলেট, ১-১২

রায়, বার্ণিক। (১৯৯৪)। *কবিতায় মিথ*। কলিকাত: পুস্তকবিপণি

রহিম, ড. মুহম্মদ আবদুর ও অন্যান্য। (২০০৬)। *বাংলাদেশের ইতিহাস*। ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান

রহিম, আব্দুর। (২০১৭)। *বাংলাদেশের ভাষা-পরিকল্পনা*। ঢাকা: অবসর

রশীদ, মামুনুর ও রিতু, ছাদিয়া। (২০১৬)। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিক্ষার অধিকার। (সম্পা.) আবু হামিদ লতিফ, *বাংলাদেশ শিক্ষা বিষয়ক সাময়িকী*। ঢাকা: বাফেড, ৩১-৪৬

সরকার, পবিত্র। (১৯৯১)। *লোকভাষা লোকসংস্কৃতি*। কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন

সরকার, শিপ্রা। (২০০৯)। ম্যালিনোস্কির মাঠ-গবেষণা সামাজিক তত্ত্ব ও অন্যান্য। ঢাকা: সূচীপত্র

সরকার,পবিত্র। (১৯৮৪)। *ভাষা দেশ কাল।* কলিকাতা: মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

সাগর, খুরশিদ আলম। (২০১১)। *বাংলাদেশের আদিবাসীদের কথা*। ঢাকা: শোভা প্রকাশ

সামাদ, ডক্টর এবনে গোলাম। (১৯৬৭)। *নৃতত্ত্ব*। ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন বোড, পৃ-বিষয়াভাস

সিকদার, সৌরভ। (২০১৩)। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: ভাষা ও সংস্কৃতি। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য, শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, *স্মরণিকা*। ঢাকা: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, ৩৩-৩৬

-- (২০১১)। *বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষা*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী

সুর, অতুল। (১৯৯০)। *বাঙলা ও বাঙালীর সমাজ ও সংস্কৃতি*। কলিকাতা: জ্যোৎস্নালোক

-- (১৯৭৯)। *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন*। কলিকাতা: জ্যোৎস্নালোক

সুলতান, মঈনুস। (অনুল্লেখ)। *পাত্র জাতির কথা*। সিলেট: বাংলাদেশ গ্রাম বান্ধব বা এফআইভিডিবি

সুলতানা, নাসিমা। (২০০৩)। নৃবৈজ্ঞানিক সমস্যা হিসেবে নৃবিজ্ঞানের উদ্ভব: ইতিহাস ও বিতর্ক। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*,সংখ্যা ৭৫, ৬৩-৮০

সেন, রংগলাল, (২০০৮)। ইবনে খালদুন: সমাজবিজ্ঞানের অনানুষ্ঠানিক জনক। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, যুক্ত সংখ্যা: ৮৫-৮৬, ১-১৮, ৩১-৪৬

স্ট্রাউস, ক্লদ লেভি। (২০১১)। *নির্বাচিত রচনা*। (অনুঃ) শামসুদ্দিন চৌধুরী, ঢাকা: বর্ণায়ন

হক, খাজা কামরুল। (১৯৯৫)। *বাংলাদেশের উপজাতি*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী

হক, আবুল কাসেম ফজলুল। (২০১৩)। *সংস্কৃতি কী এবং কেন*। ঢাকা: স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘ

হক, মহাম্মদ দানীউল। (২০০২)। *ভাষাবিজ্ঞানের কথা*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স

হালদার, গোপাল। (২০০৮)। *সংস্কৃতির রূপান্তর*। ঢাকা: মুক্তধারা

-- (১৯৮৬)। *সংস্কৃতির বিশ্বরূপ*। কলিকাতা: মনীষা

-- (১৯৭৬)। *সংস্কৃতির রূপান্তর*। ঢাকা: মুক্তধারা

হায়দার, মোহাম্মদ মনযুর-উল। (২০০৮)। চাকমা নৃগোষ্ঠীর ভাষা: নৃবৈজ্ঞানিক ও ভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনা। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা, ৯০, ৬৭-৭৪

হাসান, খন্দকার মাহমুদুল। (২০০৫)। *মানুষের উৎপত্তি, জাতিসমূহের সৃষ্টি*। ঢাকা: শিখা প্রকাশনী

হাসান, শাহেদ ও অন্যান্য। (২০১১)। *ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকায়ত জ্ঞান*। রাজশাহী: রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ- গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমী

হুমায়ুন, রাজীব। (২০০১)। *সমাজভাষাবিজ্ঞান*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী

হোসেন, আইয়ুব, হক, চারু ও রিজুয়ানা রিস্তি। (২০০৯)। *বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী*। ঢাকা: হাক্কানী পাবলিশার্স

হোসেন, মোহাম্মদ আশরাফ। (১৯৯০)। *শ্রীহট্টের ইতিহাস*। সিলেট: টি কিউ এ প্রকাশনী

হোসেন, ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম ও হক মো: রবিউল। (২০০৫)। দিনাজপুরের সাঁওতালদের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন: একটি সামজতাত্ত্বিক সমীক্ষা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ১-১৮

দ্রং, সঞ্জীব। (২০০৩)। *সংহতি*। ঢাকা: বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম

Ahmed, R Uddin and Biswas, A. Awal. (2007). Living and Lives of Patro Community in North-East Region of Bangladesh *(an ethnographic interpretration)*, This paper was presented in the seminar of the Asiatic society of (Kolkata) India, 1-10

Ahmed, S. Uddin (1999). S*ylhet: History and Heritage*, Dhaka: Bangladesh Itihas Samity

Ali, A and S. Hasan (2005). *Entitlement and deprivation selected ceases of discrimination in Bangladesh*. Bangladesh: UNESCO

Austin, J. L. (1962). *How to Do Things with words*. Oxford: Oxford university press

Bartsch, R and V. Theo. (1975). *Linguistics and neighboring disciplines*. New York: American Elsevier publishing company.

Beeman, *W.* O. (2012). Linguistics and Anthropology. In Ruth kemson, Tim Fernando and Nicholas Asher (eds). *Philosopy of Linguistics,* 531-511. Amsterdam: North Holland

Best, J. W. and others (2005). *Research in education*. England: Pearson Education

Biswas, A. Awal. (2015). *Ethnographic profile of the ethnic communities of north-eastern Bangladesh*. Dhaka: Bangladesh University grant commission

Creswell, J. W. (2009). *Research Design*. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: SAGE

−− (2010). *A little Book of language*. New Delhi: Orient Blackswan

Crystal, D. (1971). *Linguistics*. London: Penguin Books.

Danesi, M. (2004). *A Basic course in anthropological linguistics*. Toronto: Canadian Scholoars press Inc.

Duranti, A. (1997). *Linguistic Anthropology*. England: Cambridge university press

−− (2009) *Linguistic Anthropology a reader*. UK: Blackwell Publishing ltd

Fromkin,V.A. (2000). *Linguistics an introduction to Linguistics Theory.* UK: Blackwell publisher

Grierson, G. A (1903). *Linguistic survey of India*.volume-5, part-1, Calcutta:Government of India central publication branch

Gumperz, J. J. (2009). The speech community. In Allessandro Duranti (ed). *Linguistic Anthropology*. England : Willey- Blackwell, 66-73

Hye, M. A. (2007). *The changed culture of the Laleng community of Sylhet*. Sylhet: Jaintia Shinnomul Songstha

Islam, M. N. (2005). *An introduction to research method*s. Dhaka: Mullick and brothers

Kramsch, C. (1998). *Language and culture.* Oxford: Oxford university press

Lewis, M. P, Gary F. S and Charles D. F (eds.) (2016). *Ethnologue: Languages of the World, Nineteenth edition.* Dallas, Texas: SIL International. Online version: http://www.ethnologue.com/19/

Mohanto, R. (1999). Socio-cultural life of Ethnic people of Sylhet. In Sharif uddin Ahmed (ed.), *Sylhet: History and Heritage*, Dhaka: Bangladesh Itihas Samiti, 797-805

Population and Housining Cencus (2011). Community Report: Sylhet, Bangladesh Bureau of Statistics: Statistics and Informatics Division ministry of planning

Silverstein, M. (1975). *Linguistics and anthropology.* In Renate Bartsch and Theo Venanemann (eds) *Linguistics and Neighboring disciplines*. New York: American Elsevier publishing company.157-170

Swadesh, M. (1951). Diffutional cumulation and archaic residue as Historical expantations.*Southwestern Journal of Anthropology* 7, 1-21

Teeter, K.V. (1964). *Anthropologiccal Linguistics and Linguistic Anthropology*. Newyork: American Anrhropologist

Trask, R.L. (2004). *Key concepts in Language and Linguistics*, London and New York: Routledge.

Ullah Khan, S. (2003). The Patra, In Sirajul Islam (ed.). *National Encyclopedia of Bangladesh.* Dhaka: Asiatic society of Bangladesh, volume 8. P.10

তথ্যদাতা: নকুল পাত্র, বয়স ৭০ বছর, পড়ালেখা- ৮ম শ্রেণি পাস, পেশা-কৃষি, গ্রাম: কুশিরগুল, খাদিমনগর, সিলেট

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট–১: পাত্র ভাষার রূপমূল তালিকা (অসম্পূর্ণ)

১. পোশাক পরিচ্ছদ সম্পর্কিত রূপমূল

বাংলা ভাষার শব্দ	**পাত্রভাষার শব্দ** (IPA-তে)
গেঞ্জি	/cika/
লুঙ্গি	/lɔŋgi/
ধুতি	/lok^{h}/
দুল	/nakuŋ/
আংটি	/ræŋu/
প্যান্ট	/kæŋu/
শাড়ি	/aʃoiṯuŋ ril/
জাইংগা	/leŋti/
গামছা	/boḏliŋ/
গলার হার	/k^{h}alukaŋ
চুড়ি	/k^{h}aru/
সুতা	/inkrimu rill/
চিরুনী	/ancilɔŋ/

২. যন্ত্র, হাড়ি, পাতিল, অস্ত্র, মেশিন, আসবাবপত্র সম্পর্কিত রূপমূল

বাংলা ভাষার শব্দ	**পাত্রভাষার শব্দ** (IPA-তে)
টুল	/iŋk^{h}ɔl/
চেয়ার	/uniŋ/
টেবিল	/p^{h}alli keŋ/
বোটি	/aiḏa/
দা	/inok^{h}/

শিশি	/muk^{h}/
মোমবাতি	/læmuŋ/
খাট	/coki/
মই	/moi/
চৌকি	/coki/
পিঁড়ে	/pærek iŋk^{h}ɔl/
কম্বল	/chuŋ rill/
কাঁথা	/k^{h}ant̪a/
কোদাল	/kud̪al/
কলসি	/laham/
বাটা	/pat̪ak^{h}a/
আলনা	/b^{h}iluŋ t^{h}ak/
শিকে	/c^{h}ikc^{h}a/
ছুরি	/kat̪lɔŋ/
পাটি	/pat̪ika/
তোষক	/beruŋ/
কাস্তে	/kaci/
তলোয়ার	/t̪oluar/
পেরেক	/incɔn/

৩. পেশাগত ও বৃত্তিমূলক রূপমূল

বাংলা ভাষার শব্দ	**পাত্রভাষার শব্দ** (IPA-তে)
শিক্ষক	/paporailɔ/
কৃষক	/cinɔŋ kamtullo/
গৃহিনী	/k^{h}emu burioi/
মাঠ	/t̪al/
মাঝি	/mazi/ t̪allɔŋ calailɔ/
হাট	/bazar/

মালি	/moruŋkʰamla/
মজুর	/ænalo/
দিনমজুর	/ænalo/
জেলে	/ɑkʈɔkɔy/
অফিসার	/tʰaibaŋ/
শিল্পি	/iran ʈalɔ/
কামার	/inɔkuŋkʰamla/
জমি	/ʈal/

৪. ভৌগলিক ও জ্যোর্তিবিদ্যা বিষয়ক রূপমূল

বাংলা ভাষার শব্দ	**পাত্রভাষার শব্দ** (IPA-তে)
বর্ষা	/rainɖin/
শীত	/cʰuuŋɖin/
বৃষ্টি	/rai/
খড়া	/raiɖai/
আমাবস্যা	/aoiʃa/
চন্দ্রগ্রহণ	/zonokʰuŋɖɔʃa/
সূর্যগ্রহণ	/raniŋɖɔʃa/
স্যঁতসেঁতে	/ʃibarʃibar/
শীতশীত	/cuŋ cuŋ/
উত্তর	/utor/
দক্ষিণ	/ɖokʰin/
পূর্ব	nihaŋ
পশ্চিম	pocʰimkʰum
দক্ষিণ-পূর্ব	ɖohinkʰum nihɑŋkʰum
উত্তর-পশ্চিম	utorpocʰim

৫. মানুষ এবং জীবজন্তুর দৈহিক অংশ নির্দেশক রূপমূল

বাংলা ভাষার শব্দ	**পাত্রভাষার শব্দ** (IPA-তে)
চুল	/ca/
মাথা	/p^{h}u/
দাঁত	/c^{h}ani/
ঠোঁট	/int^{h}ur/
কপাল	/ʈ̪ahaŋ/
ভ্রু	/mek^{h}ungcɑ/
নাক	/nak^{h}an/
চোখ	/mɑk^{h}/
গাল	/ɔm/
কান	/nah/
জিভ	/ɖ̪ai/
গলা	/k^{h}alu/
বুক	/næŋkɔra/
হাত	/re/
রক্ত	/^{w}il/
পা	/kæŋ/
হাঁটু	/aŋt^{h}u/
বগল	/bogli/
আঙুল	/ræŋk^{h}ora/
আঙুলের নখ	/camɔn/
পিঠ	/nuŋ/
কব্জি	/k^{h}ɔbzi/
স্তন	/cu/
কোমর	/moul/

নাভি	/nabi/
পেট	/pɔk/
নিতম্ব	/pɔkʈi/
লিঙ্গ	/boʈoi/
যোনি	/ʃɔna/
প্রস্রাব	/fiŋ/
মলত্যাগ	/k^{h}iʈkaŋ/
কানের খৈল	/naŋk^{h}oir/
গর্ভপাত	/pɔkoi/

৬. উদ্ভিদ ও প্রাণী বিষয়ক রূপমূল

বাংলা ভাষার শব্দ	**পাত্রভাষার শব্দ** (IPA-তে)
ঘোড়া	/jac^{h}el /
ছাগল	/cabai/
গরু	/cinɔŋ/
বেড়াল	/mæŋ/
কুকুর	/k^{h}oi/
শেয়াল	/miʃuruŋ/
জোঁক	/iŋliʈ/
শুকর	/p^{h}ak/
মৌমাছি	/puia/
ঘাঁস	/aʃ/
কাক	/uak^{h}/
পায়রা	/paru/
ময়না	/mɔyna/
বাছুর	/baiccæ /
বাঘ	/k^{h}aic^{h}a/
টিয়া	/tia/

বেজি	/urkai/
মাকড়শা	/makɔr/
চড়ই	/aʃ cɔra/
মুরগি	/uah/
তেলাপোকা	/t̪elcura/
ঝিঁঝি	/caṭ̪ur/
বক	/bogla/
ইঁদুর	/p^{h}aiuk/
বাদুর	/baḍ̪uri/
হরিণ	/koira/
চিল	/ciilḍ̪iguni/
কেঁচো	/dʒir/
মাছি	/t̪u/
সাপ	/p^{h}arul /
তালগাছ	/t̪al rɔŋ/
কলাগাছ	/p^{h}aŋu/
পেয়ারাগাছ	/ʃorbin/
নিমগাছ	/k^{h}arɔŋ/
ফুল	/mour/
কুলগাছ	/mt^{h}ali rɔŋ/
সুপারিগাছ	/koy/

৭. খাদ্য ও প্রস্তুত প্রণালী বিষয়ক রূপমূল

বাংলা ভাষার শব্দ	**পাত্রভাষার শব্দ** (IPA-তে)
ধান	/ʃɔk^{h}/
চাল	/ʃaŋ/
ভাত	/an/
খৈ	/k^{h}oi/
মুড়ি	/muri/

চিড়ে	/c^{h}ambær/
তেঁতুল	/ŋt̪ænt̪oi/
হলুদ	/t^{h}amis/
মিষ্টি	/d̪ɔk^h/
পান্তা ভাত	/t̪oinɑn/
বরবটি	/k^{h}ara/
কুমড়ো	/imk^{h}ɔm/
সবজি	/lat̪apat̪a/
ঝোল	/k^{h}allɔŋ /
তরকারি	/bæn/
ভাজা	/k^{h}ɔla/
মাছ	/ɔk/
মাংস	/t^{h}an/
সাক	/lat̪a/
ডিম	/t̪ui/
মদ	/k^{h}ɔr/
আলু	/p^{h}aru
দুধ	/coŋcu/
তেল	/joŋt̪/
জিলিপি	/d̪ilapi/
ঢ্যাঁড়শ	/d̪æreʃ/
বেগুণ	/baigun
মরিচ	/hal/
লেবু	/jara/
ফুলকপি	/mour ben/
টক	/t^{h}or/
সেদ্ধ	/up/

৮. সময় ও পরিমাণ নির্দেশক রূপমূল

বাংলা ভাষার শব্দ	**পাত্রভাষার শব্দ** (IPA-তে)
দুপুর	/nilad̪ɔl/
বিকেল	/nila/
সন্ধ্যা	/ʃanja/

রাত	/pʰaia/
সকাল	/d̪ap/
জোরে	/tʰaira/
আস্তে	/ɔŋɔyra/
ভাল	/mai/
খারাপ	/nlaŋaṭ̪/

৯. টাকা, গণনা ও সময় বিষয়ক রূপমূল

বাংলা ভাষার শব্দ	**পাত্রভাষার শব্দ** (IPA-তে)
দাঁড়িপাল্লা	/tʰumlɔ/
পয়সা	/ʃaŋai/
হালি	/pʰalli/
একটু	/ʃik/

১০. রংবাচক রূপমূল

বাংলা ভাষার শব্দ	**পাত্রভাষার শব্দ** (IPA-তে)
সাদা	/lɔk/
কালো	/ik/
লাল	/ær/
নীল	/nil/
কমলা	/kɔmla/
বেগুনি	/beguni/
সবুজ	/ʃɔbuɟ/
হলুদ	/ɔld̪ia/ holdia/

১১. প্রকৃতিবাচক রূপমূল

বাংলা ভাষার শব্দ	**পাত্রভাষার শব্দ** (IPA-তে)
আকাশ	/ʃɔina/ soin/
বাতাস	/baṭ̪aʃ/ ṭ̪upʰan/
পানি	/ṭ̪əi/ ṭ̪oi/
আগুন	/kæri/
মাটি	/ṭ̪ʰɔŋlai/

পৃথিবী	/d̪unia/
কাদা	/d̪əl/
বন	/inam/
ফসলের মাঠ	/t̪al/
মেঘ	/rai/
বৃষ্টি	/rai/
নদী	/laŋt̪ʰeni/ nɔd̪i/
পাহাড়	/tilla/ par/
ঝর্ণা	/nakut̪an/ t̪oiumpʰoe/
আলো	/d̪ura/ t̪ʰɔŋ/
অন্ধকার	/and̪ar/
সূর্য	/rani/

পরিশিষ্ট– ২: পাত্র ভাষার বিভিন্ন ধরনের বাক্য

ক্রমিক	পাত্র ভাষার বাক্যর বাংলা উচ্চারণ	IPA	বাংলা অর্থ
১	হালিং ইউনিয়ন পরিষদ খাত ও কিচু সাহায্য খলংখং।	[haliŋ iuniɔn poriʃɔd̪ kʰat̪ o kicu sahaɟɟo kʰɔlŋkʰɔŋ]	৪ নং ইউনিয়ন পরিষদ থেকে পাত্ররা বিভিন্ন সাহায্য–সহযোগিতা পেয়ে থাকে।
২	আইন পরিবারকা সাতজন দাহান	[ain poribarka sat̪ɟɔn d̪ahan]	আমাদের পরিবারের সদস্য সাতজন।
৩	আলিং থঠন টিলাকা ওরা ফাক এনাংল	[aliŋ tʰɔtʰɔn tikala ora pʰak enaŋlɔ]	আমরা পাহাড় থেকে শুয়োর শিকার করি।

৪	হালিং শিকার কা উরা খলংএ	[haliŋ ʃikɑr ka ura kʰɔlɔŋe]	শিকার পাবার জন্য আমরা ভোগ দেই।
৫	আলিং পয়লা পুজা ইছলা দুর্গাপুজা।	[aliŋ pɔe̯la puja icʰɔla d̪urgapuja]	দুর্গাপূজা প্রধান ধর্মীয় উৎসব।
৬	দুর্গা পূজা তা মাই মিল এনা।	[d̪urga puja ʈa mai mil ena]	পূজা উপলক্ষে নতুন জামা কাপড় পরি।
৭	আলিং দলই পাড়া আখড়া কা পূজাসলো।	[aliŋ d̪ɔloi para akʰra ka rujasɔlo]	দলই পাড়ায় পূজা করি।
৮	আলিং সকলে মিলিয়া পঞ্চায়েতুং মিটিং তিরা এরা দিরা খরচা সাংহাই এনলো	[aliŋ sɔkale milia pɔncaeʈuŋ mitiŋ ʈira era d̪ira kʰɔrca s aŋhai enlo]	আমাদের পুজার খরচ পঞ্চায়েত বহন করে।
৯	আলিং সকলে মিলিরা মিটিং তিরা সমস্যা সমাধান সল।	[aliŋ sɔkale milira mitiŋ ʈira sɔmossa sɔmadʰan sɔl]	আমাদের যেকোন সমস্যা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সমাধান করা হয়।
১০	বাংতুং ছিনও ছংচু তুনলো।	[baŋʈuŋ cʰino cʰɔŋcu ʈunlo]	পাত্ররা গাভীর দুধ পান করে।
১১	লালেং ছিনং খান চাইলো।	[laleŋ cʰinɔŋ kʰan cailo]	পাত্ররা গরুর মাংস খায় না।
১২	বানতুং পবিত্র ইছংবেহে ছাহাল ছিতাই রাখিলো।	[baŋʈuŋ pobiʈro icʰɔŋbehe cʰahal cʰiʈai rakʰilo]	পাত্ররা পবিত্রতা রক্ষার জন্য গোবর ব্যবহার করে।
১৩	বাংথুমং সাং আয়া থংলাইনখেম।	[baŋtʰumɔŋ saŋ aya tʰɔlainkʰem]	মাটির ঘরই পাত্রদের শান্তির আশ্রয়স্থল।

১৪	বাংথুমং থেরাহারিলে পাপলো ছিলেললোং নেয়ামদাহাং।	[baŋtʰumɔŋ tʰeraharile paplo cʰilelloŋ neamḍahaŋ]	মৃত্যুর পর পাত্রদের দাহ ও মাটি দেয়ার প্রথা প্রচলিত আছে।
১৫	পাবুবেং চাংখা বাংখুম জাইলে।	[pabubeŋ caŋkʰa baŋkʰum ɟaile]	শুটকীর ঝোল পাত্রদের প্রিয় খাবার।
১৬	সাংহাই পয়সাং অসুবিধার কারণে সালোইতোমলে বিয়া পিয় উনাইলো।	[saŋhai pɔysaŋ ɔsubidʰar karone saloiṭomɔle bia piɔ un ailo]	অর্থের কারণে অনেক পিতার মেয়ে বিয়ে দিতে কষ্ট হয়।
১৭	গাও ছেলেফরতম তামই লেখাপড়া চল।	[gao cʰelepʰɔrtɔm ṭamoi lekʰapɔra cɔl]	গ্রামের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অল্পই লেখাপড়া করছে।
১৮	ছায় বাং মিলিরা আলালে চষবাস করে।	[cʰay baŋ milira alale cɔʃbas kɔre]	সবাই মিলে বসবাস করে।
১৯	বাং থোমং নিজস্ব মান্দব দাহা।	[baŋ tʰomɔŋ niɟɔsso mandob ḍaha]	তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি আছে।
২০	বাং থো আলালো পা খইলে আদর যত্ন চল।	[baŋ tʰo alalo pa kʰoile ador ɟɔṭno cɔl]	তারা বাবা মাকে খুব আদর যত্ন করে।
২১	বাং থো মং খালি জায়গা চেরা লাগি না দরকার।	[baŋ tʰo mɔŋ kʰali ɟaḛga cera lagi na dɔrkar]	তাদের পাহাড়ে বেশি করে বনায়ন প্রয়োজন।
২২	বর্তমান বাং থো মং পাত্রকা লাগিকা।	[bɔrtoman baŋ tʰo mɔŋ paṭroka lagika]	পাত্রদের মধ্যে আধুনিকতার ছোঁয়া

			লেগেছে।
২৩	দি কাম্বই কা ছমলো	[d̪i kamboi ka c^{h}ɔlo]	আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলছি।
২৪	খারাই লাটকিরা জাহাং ডালকা।	[k^{h}arai latkira ɟahaŋ d̪alka]	আম ডালে ডালে ঝুলছে।
২৫	ফায়কুং রামায় দাহাং।	[p^{h}ae̯kuŋ ramae d̪ahaŋ]	ইঁদুরের লেজ আছে।
২৬	ফারমল চাও ইইনজারলো সৈনকা।	[p^{h}armɔl cao iinɟarlo soinɔka]	ঈগল আকাশে উড়ে।
২৭	একতারা থপলো বাউল।	[ekt̪ara t^{h}ɔplo baul]	বাউল একতারা বাজায়।
২৮	দ্যাখোদুমো খের ছনা চাষ।	[d̪æk^{h}od̪umo k^{h}er c^{h}ɔna caʃ]	ওলকচু চাষ করব।
২৯	ঔষধে চাতিক বেমার মাইনা।	[ouʃɔd^{h}e cat̪ik bemar maina]	ঔষধ খেলে অসুখ সারে।
৩০	চিনং দালো আথাল খেমা।	[cinɔŋ dalo at^{h}al k^{h}ema]	গরু গোয়াল ঘরে থাকে।
৩১	ঘুড্ডি ইনজারলো সৈনকা।	[g^{h}uddi inɟarlo soinɔka]	ঘুড়ি আকাশে উড়ে।
৩৩	ঔ আইন বন্ধু।	[oi ain bond^{h}u]	ও আমার বন্ধু।
৩৪	আগ গাও দলইপরার।	[ag gao b̪olipɔrar]	আমাদের গ্রামের নাম দলই পাড়া।
৩৫	হাই সেনাবাহিনীকা ওলোতে।	[hai senabihinika olo̯te]	আমি সেনাবাহিনীতে যোগ দেব।
৩৬	আই ইঞ্জিনিয়ার শি।	[ai inɟiniar ʃi]	আমি ইঞ্জিনিয়ার হব।

৩৭	স্যার হাইলো গণিত পা ইংলিশ সলো।	[sɛr hailo goni̪t pa iŋliʃ sɔlo]	স্যার গণিত ও ইংরেজিতে ভাল।
৩৮	আইন গাওকা সিরামিকস ফ্যাক্টরি সেদা।	[ain gaoka siramiks pɛktori sed̪a]	আমাদের গ্রামে সিরামিক ফ্যাক্টরি আছে।
৩৯	আলা খ?	[ala k^hɔ]	উনি কে?
৪০	হালিং গোসা একং।	[haliŋ gosa ekŋ]	আমরা রাগ করেছি।
৪১	ফাংউ চাংকা মাইরা ফালো।	[p^haŋu caŋka maira p^halo]	কলা খেতে ভারি মজা।
৪২	মেখুং ইয়েলে খুলো।	[mek^{h}uŋ ie̪le k^hulo]	চোখ দিয়ে মাকে দেখি।
৪৩	চং ইয়াংলো ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ।	[cɔŋ iaŋlo g^hɛŋr g^hɛŋ]	ব্যাঙ ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর করে ডাকে।
৪৪	ছা ছালো সকলং সমান।	[c^ha c^halo sɔkɔloŋ sɔman]	ছেলে মেয়ে সবাই সমান।
৪৫	ঝাকা পারাছিক কামকা লাগিলো।	[$ɟ^h$aka parac^{h}ika kamka lagilo]	ঝুড়ি অনেক কাজে লাগে।
৪৬	তুই চাতিকে জুর ইছলো।	[t̪ui catike ɟur ic^{h}lo]	ডিম খেলে শক্তি বাড়ে।
৪৭	কইরা দালো সুন্দর বনকা।	[koira d̪alo sund̪ɔr bɔnka]	সুন্দর বনে হরিণ থাকে।
৪৮	চংতং দাখাং পারাছিক গুন।	[cɔŋt̪ɔŋ d̪ak^{h}aŋ parac^{h}ik gun]	দুধের অনেক গুন আছে।
৪৯	কলুং তই জুন।	[kɔluŋ t̪oi ɟun]	নলকূপের পানি খাও।
৫০	মৌর ফুটিকাং বাগানকা।	[mour p^hutikaŋ baganka]	ফুল ফুটেছে বাগানে।
৫১	লাঙ্গলুং আল	[laŋlu al lɔŋlo]	লাঙ্গল দিয়ে চাষ

	লংলো।		করি।
৫২	শাপলা ফুটিলো পুকুরকা।	[ʃapla pʰutilo pukurka]	পুকুরে শাপলা ফুটিল।
৫৩	আস তইকা সাতাররিলো।	[as ʈoika saʈarrilo]	হাঁস পানিতে সাঁতার কাটে।
৫৪	বাড়িং বেরকা শখুং তাল।	[baɾiŋ berka ʃɔkʰuŋ ʈal]	বাড়ির পাশে ধান ক্ষেত।
৫৫	আষাঢ় চাকলা রায় কালালো।	[aʃaɽ cakla raɻ kalalo]	আষাঢ় মাসে বৃষ্টি পড়ে।
৫৬	দুক ইনছালো আলি ছতিকে।	[ɖuk incʰalo ali cʰoʈike]	অলস হলে দুঃখ বাড়ে।
৫৭	জনাক থুরকাং সৈনকা।	[ɟɔnak tʰurkaŋ soinɔka]	আকাশে চাঁদ উঠেছে।
৫৮	ওয়া আল কর্তাই।	[oa al kɔrʈai]	উনি আমার দাদা।
৫৯	মেতরাই ইছলো।	[mrʈrai icʰlo]	এখন বৃষ্টি হচ্ছে।
৬০	নানদিদিকা চো ইয়াংকাল।	[nanɖiɖika co iaŋkal]	আপনি কোথায় থেকে এসেছেন।
৬১	বাংউলো আইন মাই লাগিকাং।	[baŋulo ain mai lagikaŋ]	মেয়েটিকে আমার ভাল লেগেছে।
৬২	হাই নাংলো মাই খোলে।	[hai naŋlo mai kʰole]	আমি তোমাকে ভালবাসি।
৬৩	শিবু চিনং এনাংল।	[ʃibu cinoŋ enaŋlɔ]	শিশুদা গরু আনছে।
৬৪	আই খেসা গরম লাইলো।	[ai kʰesa gɔrom lailo]	আমার গরম লাগছে।
৬৫	হাই স্কুলকা পড়ে আয়লো।	[hai skulka pɔɾe aɻlo]	আমি পড়ালেখা করি না।
৬৬	আলিং বাং কোন	[aliŋ baŋ kon sɔrkari ɔfiska cakuri ɖoaɻi]	আমাদের

	সরকারি অফিসকা চাকুরী দোয়াই		সম্প্রদায়ের মানুষের চাকুরির অভাব রয়েছে।
৬৭	আলিং পারুং জাগাখা কোন কিছু পাগাই ইয়াইলো।	[aliŋ paruŋ ɟagak^{h}a kono kic^{h}u pagai̯ iailo]	পাহাড়ের জমিতে চাষবাস করা হয় না।
৬৮	ভুক লাগছে।	[b^{h}uk lagc^{h}e]	খিদে পেয়েছে।
৬৯	গুমাই তাই	[gumai̯ t̪ai̯]	ঘুম পেয়েছে।
৭০	দুইলা আস আছিইল	[d̪uila as ac^{h}iil]	আমার দুটি হাঁস আছে।
৭১	আইন মিগোই ইয়াংলো।	[ain migoi̯ iaŋlo]	আমার ঘুম পেয়েছে।
৭২	সারাংকা লাঙ্গল এনরা ভালকাউলো।	[saraŋka laŋgol enra b^{h}alkaulo]	কাঁধে লাঙ্গল নিয়ে চাষী মাঠে যায়।
৭৩	লালেং বাংলালালা খানি রিকসাকুং ওলো।	[laleŋ baŋlalala k^{h}ani riksakuŋ olo]	দুজন পাত্র রমণী রিকসায় যায়।
৭৪	আইন নাম নিজাম উদ্দীন।	[ain nam niɟam ud̪d̪in]	আমার নাম নিজাম উদ্দীন।
৭৫	আইন বাবা নেছার আলী।	[ain baba nec^{h}ar ali]	আমার পিতা নেছার আলী।
৭৬	হাই ক্লাস এইটকা পড়িনং।	[hai klas eitɔka poɽinɔŋ]	আমি অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছি।
৭৭	মাদাব মাইছক ইছনং।	[mad̪ab mai̯c^{h}ɔka ic^{h}nɔŋ]	এবার ভাল ফলন হয়েছে।
৭৮	উফিলা পায়খানা শরীলজেছে মাইলই।	[up^{h}ila payek^{h}ana ʃorilɟec^{h}e mai̯loi̯]	খোলা পায়খানা স্বাস্থ্যর পক্ষে ক্ষতিকর।
৭৯	মছাকুলে ছাইই ছোলো।	[mɔc^{h}akule c^{h}aii c^{h}olo]	মশা ম্যালেরিয়া রোগ ছড়ায়।
৮০	কুইনাইন জুনলো থেকে ছাইমাইলো।	[kuinain ɟunlo t^{h}eke c^{h}aimailo]	কুইনাইন ম্যালেরিয়া জ্বর ভাল করে।
৮১	আইলেং ইউনিয়োনো	[aileŋ iuniono cearmɛn maibi bic^{h}ac^{h}ɔlo]	আমাদের ইউনিয়নের

	চেয়ারম্যান মাইবি বিছাছলো।		চেয়ারম্যান ভাল বিচারক।
৮২	লালেং জোয়ান তোন কামু দরকার।	[laleŋ ɟoan ʈon kamu ɖɔrkar]	পাত্র যুবকদের কর্মসংস্থান দরকার।
৮৩	নিয়াতিতু দুঃখা খামবাংছু খাই।	[niaʈitu ɖukʰa kʰambaŋcʰu kʰai]	পাত্রদের মধ্যে ভিক্ষা প্রবণতা কম।
৮৪	আইলেং বাংতুং শুজা শরল।	[aileŋ baŋʈuŋ ʃuɟa sɔrol]	আমরা সহজ সরল।
৮৫	লালেং লালাতুং তালখা কামতুংলো।	[laleŋ lalaʈuŋ ʈalkʰa kamʈuŋlo]	পাত্র নারীরা মাঠে কাজ করে।
৮৬	মানি শিকারখানে এনাহা এনামখাতো এনাহা।	[mani ʃikarkʰane enaha enamkʰaʈo enaha]	আজ দুটো শুকোর বন থেকে শিকার করা হয়েছে।
৮৭	শিকারেংখা ছানখা মাইলো।	[ʃikareŋkʰa cʰankʰa mailo]	শুকোরের মাংস প্রিয়।

পরিশিষ্ট–৩: ব্যবহৃত আলোকচিত্রসমূহ

চিত্র ৩.১ পাত্রভাষা গবেষক সলিম আনোয়ার খাঁ

চিত্র ৩.২ তথ্য দিচ্ছেন এফআইভিডিবির সহযোগী পরিচালক সমিক সহিদ জাহান

চিত্র ৩.৩ একটি পাত্র পরিবারের সাথে গবেষক।

চিত্র ৩.৪ পাত্র বস্তুগত সংস্কৃতি (ঐতিহ্যবাহী ঘর)

চিত্র ৩.৫ পাত্র বস্তুগত সংস্কৃতি (আধুনিক ঘর)

চিত্র ৩.৬ বিয়েতে ঠাকুরের মন্ত্রপাঠ

চিত্র ৩.৭ বরের জন্য রঙ্গিলাদের অপেক্ষা

চিত্র ৩.৮ বিয়েতে বর ও কনে

চিত্র ৩.৯ ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিহিত নকুল পাত্র

চিত্র ৩.১০ পাত্রদের পান সাজানো ঢালা

চিত্র ৩.১১ পবিত্র পাত্র বড়দের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানাচ্ছেন

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৩.১২ লগনী পাত্রের বিয়েতে রঙ্গিলারা গান পরিবেশন করছেন

চিত্র ৩.১৩ বরকে চাকদালে বহন

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৩.১৪ বিয়েতে সাত পাঁকের দৃশ্য

চিত্র ৩.১৫ পাত্রদের ঐতিহ্যবাহী পানীয় খর

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৩.১৬ খেমুলারাম পূজার পাঠাবলি

চিত্র ৩.১৭ পইন পূজার উপকরণ

চিত্র ৩.১৮ পাত্র পূজামণ্ডপ (দূর্গাপূজা)

চিত্র ৩.১৯ গানে মগ্ন প্রেমপাত্র

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৩.২০ ঘুমপাড়ানি ছড়া বলছেন সুমিতা পাত্র

চিত্র ৩.২১ গল্প বলছেন প্রেমপাত্র

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৩.২২ মিথ বলছেন বিজয় পাত্র (বয়স ৬৫ বছর)

৩.২৩ চিত্র: মিথ বলছেন ভরত পাত্র (বয়স-৮৫ বছর)

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৩.২৪ কথোপকথনে পাত্র ছেলেমেয়ে

পরিশিষ্ট- ৪

৪.১ পাত্র ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত

পাত্র ভাষা

আইন সোনাং বাংলা, হাই নাংলো মাই খুলো।

চিরদিন নাং শইন,

চিরদিন নাং শইন, নাং বয়ার,

আইন ফারানকা

ও ইয়ো, আইন ফারানকা থপলো বাশি,

সোনাং বাংলা, হাই নাংলো মাই খুলো।।

ও ইয়ো, ফালগুনকা নাং খারাইন ইনামকা ইনুমকুং পাগল ছলো,

ফারান উলো হায় হায় রে-

ও ইয়ো, ফালগুনকা নাং খারাইন ইনামকা ইনুমকুং পাগল ছলো,

ও ইয়ো, আগনাইকা নাং ভরা খেতকা দি খুলো

হাই দি খুলে মধুর ইনি।

সানাং বাংলা, হাই নাংলো মাই খুলো।।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষা

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।

চিরদিন তোমার আকাশ

চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,

আমার প্রাণে

ও মা, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি

সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।।

ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনের ঘ্রাণে পাগল করে,

মরি হায়, হায় রে-

ও মা, অঘ্রান তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি

আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।

সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।।

৪.২ দেশাত্মবোধক গান

পাত্র ভাষায়

আলিং দেশ সোনার বাংলাদেশ ছেলে, মেয়ে উভয়

সুখ দুঃখ ইনি চুমুর, দয় আর শেষ।

ঠেং ডালকা উনিরা উত্তয়াসা মাইরা ইরান তাল

ঘরই দেশুং কথা হাই মাইরা ইরান তাল

ঘরই দেশুং কথা হাই মাইরা বেনা ফারানকা

ও দেশকা ইলিং জনম ইসকং,

ঘ দেশুং মাই সনা ইলিং।।

ইলিং দেশ সোনার বাংলাদেশ

ইলিং দেশ স্বাধীনতাং বাংলাদেশ,

ইলিং প্রিয় জন্মভূমি সোনাং বাংলাদেশ।।

বাংলা ভাষা

আমার দেশ সোনার বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

সুখ দুঃখ হাসি খুশির নেই কোনো শেষ।
গাছের ডালে পাখিরা গায় গান মনের সুখে,
এ দেশের কথা ভুলব না আমি গেঁথে রাখব বুকে
এ দেশ মোদের জন্মভূমি এ দেশের গৌরব করিব আমি।।
আমার দেশ সোনার বাংলাদেশ
আমার দেশ স্বাধীন বাংলাদেশ
আমার প্রিয় জন্মভূমি সোনার বাংলাদেশ।

৪.৩ ভালোবাসা সঙ্গীত

পাত্র ভাষা

আইন নাংলে এয় মাইলো
নাংলে আইন খেযোং চমআতুং তাওনাইলো
আইন নেং করা সিহাললোরাটিকাং
হাই আইন (ফারায়ুইলোআ) খেরিরা খলয়াংয়াইলো।

বাংলা ভাষা

আমি তোমাকে ভালোবাসি।
তোমাকে আমার মনের কথা বলতে পারছি না
আমার বুক কাঁপছে
আমি সাহস হারিয়ে ফেলেছি।

৪.৪ অভিব্যক্তি প্রকাশক সঙ্গীত

পাত্র ভাষা

হাই যে দিকা উরা দাইয়ে
হাইন তো ফারাইমাঝে মায়াইলো,
হাই যে দিকা উরা দায়ে
দিনে রাতে হাই খালি খর জুনু ফারায়ানতালো।
দিনে রাতে হায় যে খরখুনপুলিরা দালো
হাই যে দিকা হাইলে সান্তি খলংলা
হোখোতাউম যে হাইদিনকে দায়লো।
দিকা উয়ে দিকা দায়ে

Dhaka University Institutional Repository

আইন যে খালি দিনে রাতে খর ফারানখেরিলো

আইন যে খালি দিনে রাতে খর ফারানখেরিলো

প্রত্যেক যবর হাই মনে মনে

পাপ পিয়ে দিরা খেরিলো।।

তারপরেংউতো হাই উলাইলো

বারি আংতিকে হাই, খরউংদিদাই ছরা দালো

বাইরখনদালো মন তো খ্যারিয়্যাইলো।।

বাংলা ভাষা

আমি দিনে-রাতে শুধু যে

বাড়িতে আসিলে, খুব নেশা হয়

করতে ইচ্ছে হয়।

দিনে-রাতে খুব নেশার জন্য ইচ্ছা হয়।

সবাই যেন আমাকে

মন্দ বলে,

তারপরও আমার খাইতে ইচ্ছা হয়,

তারপরেও আমার খাইতে ইচ্ছে হয়।

মনে মনে কত বলি আমি

আমি নিজেকে নিজেই ঘৃণা করি।

৪.৫ বিরহ সঙ্গীত

পাত্র ভাষা

পেরেকদা কাতো লে এনরা নেংকরাকা আইন যেখালিসালো

থাইরা উরাংআইন হসালোছারাইলো,

আইন যে ফাল্লি বাং ছাচুং আনছোরা উকাং

হ ইশোরোং আইন ছালো এনরা হাই দাহাং।

ফাইয়্যা ফায়া বেমারকুং চাখোলো

আলাংতোআইন (খলো) ইজাইলো

হাই হোইরা খুলোকাং আলাং তো ইজাইলো
হাই দিরা খেরেংএ দিরা চাইয়ে।
ওইয়ো পইনু ইয়ো নাং হাইলে নেংকাংসংজুরপিয়ে
ওয়ো ইক ইয়ো, নাং হাইলে নেংকরাং জুর পিয়ে,
নালিং খাতো ছাচু বেয়াইলে এনরা হাই
মায়রা চালো চলিয়ে ।

ওইয়ো পইনু ইয়ো, আইন ইয়ো
আইন নেংকা জুরপি পিদোয় মাইরা হাইলে
হালিংচায়ে ছাচু বেয়াইলে মাইরা এনরা
কামকাদুমকা মায়রা মায়রা শোয়ে হালিং।

বাংলা ভাষা

আমার ছোট থাকতে যে কষ্ট, বড় হয়েও সে কষ্ট
সেই কষ্ট থেকে আমায় মুক্তি নাই।
আমার যে চারটা বাচ্চা আছে ওরা এখনও অবুঝ।
এতদ্বসত্বেও আমি কষ্ট নিয়ে বেচে আছে।

রাতের পর রাত আমি অসুখে কাদি
উনি তো আমার কষ্ট বোঝে না
আমি এত কষ্টে আছি তবুও উনি বোঝেন না
আমি কীভাবে থাকব আমি কিভাবে বাচব

মা গো দুর্গা মা, আমায় স্মরণ শক্তি দাও
মা গো কালি মা, তুমি আমার হৃদয়েবল দাও
তোমার কাছ থেকে আমার ছেলে মেয়ে নিয়ে
ভালো করে চলতে দাও।
মা গো দুর্গা মা, আমার মা
আমার স্মরণ শক্তি দাও, দাও না মাগো
ছেলে মেয়েকে নিয়ে আমায় ভাল থাকতে দাও
কাজ কর্মে আমি যেন সফল হই।

৪.৬ প্রার্থনা সঙ্গীত

পাত্র ভাষা

য়োং সুওয়াতুম সতলে ইলিং য়োলে রাদম না।
য়োলে সালাতুম সকলে ইলিং য়োলে রাদম না।
য়োং কেংকা এর মরকুং য়োলে ফাছিনা।।
য়োং সুওয়াতুম সতলে ইলিং য়োলে রাদম না।
য়ো ইলিং, ইলিং রোং ফারাই বেনাদই ফারানকা,
য়োং কান্দাকা য়োং উরিকা উনিরা দানা।।
য়োং সালাতুম সকলে ইলিং য়োলে রাদম না।
য়োং সুওয়াতুম সতলে ইলিং য়োলে রাদম না।।

বাংলা ভাষা

আমরা মায়ের ছেলে সবাই মিলে মাকে ভক্তি/ পূজা
আমরা মায়ের ছেলে সবাই মিলে মাকে ভক্তি/ পূজা করি।
রাঙা পায়ে রাঙা জবা দিয়ে সাজাব।।
আমরা মায়ের ছেলে সবাই মিলে মাকে ভক্তি/ পূজা
আমরা মায়ের মা আমাদের ভয় ভাবনা নেই মোদের
মায়ের কাছে মায়ের তরে পরান সপিব।।
আমরা মায়ের ছেলে সবাই মিলে মাকে ভক্তি/ পূজা
আমরা মায়ের ছেলে সবাই মিলে মাকে ভক্তি/ পূজা।।

৪.৭ নৃত্যগান

ময়ূরী লামলো উলাপ নিগাইরা।
ময়ূরীং লাম খুরা ফারান যে মাইলো।।
কৃষ্ণচূড়াং রংখা ময়ূর উলাপ নিগাইলো
রুমু ঝুনু নপুর য়াতুম কেংকা সিথপলো,
ময়ূরীং লাম খুরা ফারান যে মাইলো।।
নিলা উলো ফায়া য়াংলো দাম দাম রে।।
ময়ূরীং লাম খুরা ফারান যে মাইলো।।

Dhaka University Institutional Repository

হাইলাং হাইলাং জনক খুল তুমমলুক খুল

কো- কোরা য়াংলো।।

ময়ূরীং লাম খুরা ফারান যে মাইলো।। ঐ

বাংলাভাষা

ময়ূরী নাচে নাচে ঐ মেলিয়া পেখম

ময়ূরীর নাচ দেখে প্রাণ জুরালো,

কৃষ্ণচূড়ার ডালে ময়ূর পেখম মেলেছে

রুনঝুনু নুপুর সেথা পায়ে বেঁধেছে

বাদল বেলা গেল চল চল যাই

ময়ূরীর নাচ দেখে প্রাণ যে জুরায়।।

দেখ দেখ চাঁদ দেখ তারা দেখ ডাকি ডাকি আয়

ময়ূরীর নাচ দেখে প্রাণ যে জুড়ায়।।

৪.৮-ছড়া **১**

পাত্র ভাষা

অইয়ো হাইলে খেমুং কুনাকা আগলিরা দিং বেলো

হাই যখন জলুং উলো লাংরা দিং দালো

আইন বন্‌রা সকল পেরেকতুম স্কুলকালো উলো

আলানীং বন্‌রা হাইলে লেখিং পড়িং খেরিলো।

বাংলা ভাষা

মাগো আমার ঘরের কোণে আগলে কেন রাখ

আমি যখন খেলতে যাই চেয়ে কেন থাকো

আমার মত সকল শিশু স্কুলেতে যায়

তাদের মত আমিও লিখতে পড়তে চাই।

৪.৯. ছড়া-২

পাত্র ভাষা

ওইয়ো ময়না ওই মিগই য়াংদই

ময়নাং মেকা আইন ময়না,

ওইর‍্যা দায়েরে

Dhaka University Institutional Repository

নাং উই কামতুমলো চাকনা দই

ওই ময়না ওই

ওইরে ময়না ওই

ইাংউহ কাম তুমলো চাকনা দই।

ওই আইন ময়নাং মেকা সিগয়

য়াংলো হাই পা ওইর‍্যা বে এ।

বাংলা ভাষা

ঘুমাও খোকা

ঘুম আসো আমার খুকার চেখে

আমার খোকা ঘুমিয়ে থাকবে

তোমার মা কাজে যাবে

তুমি কেদো না।

ঘুমাও খোকা ঘুমাও, ঘুমাওরে খোকা ঘুমাও

তোমার মা কাজ করছে

কেদো না, ঘুমাও।

আমার খোকার চোখে ঘুম আসছে

আমি ঘুমিয়ে রাখবো ওকে।

৪.১০ ছড়া-৩

পাত্র ভাষা

ওয়ু ওয়ু

আন চায়ে নাং?

দাই

ওমর‍্যা দাই পাকাইন য়ুনা

মিথাই পিনা জনুং পহল পিনা

হাপরা হাপরা লাইতে

বাংলা ভাষা

তুমি ভাত খাবে?

না

চলো ওদিকে ঘুরতে যাই

চকলেট দেব, পুতুল দেব

ঐযে ঐযে দেখ।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১১ ধাঁধা

ক) পাত্র ভাষা: থামিস কুং মাই চংচুকুং সিথপ।

বাংলা ভাষা: হলুদে ডগমগ দুধে আবরণ।

উত্তর: ডিম (তুই)

খ) পাত্র ভাষা: মেনায় দক দক, মেনলে খা, সকল কালে হরইরা আলাং।

বাংলা ভাষা: কাচায় কোমল, পাকলে কঠিন,

দুনিয়া জুড়ে বসত হল তার। উত্তর: থংলাই (মাটি)

গ) পাত্র ভাষা: সিকওয়া ঠেং, ঠুংকা ঠুংকা ছিরখ।

বাংলা ভাষা:এক খানি লাঠি,

ঘন ঘন আটি। উত্তর: চত্তং মইট (বেণী)

ঘ) পাত্র ভাষা: এর দখওই উলো হপরা অমকা

থোতাকা রেয়াং চালো।

বাংলা ভাষা: লাল বুড়ি হাটে যায়

গালে মুখে চর খায়। উত্তর: খেরুংলা (কচু পাতা)

৪.১২ বাগধারা

ক) পাত্র ভাষা:য়ুং আলাং মন কাং দয়, ওয়ু পকা বিষলো, মানাপ বা।

বাংলা ভাষা: যাওয়ার ইচ্ছা নেই, অকারণে অজুহাত তুলছে।

খ) পাত্র ভাষা: ওয়ুই ওয়ুই তুমরা পিকাং।

বাংলাভাষা: কোনো রকম গোঁজামিল দিয়ে থুয়ে দিলাম।

গ) পাত্র ভাষা: নিজুং ইজলে লতরা অইনো আলগে মিথঠন।

৪.১৩ প্রবাদ প্রবচন

ক) পাত্র ভাষায়: হাওয়া তোং দাং চে ওয়াং আইন মাই।

বাংলা ভাষায়: নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।

খ) পাত্র ভাষা: দইআং কাত দইং মাই।

বাংলা ভাষা: দুষ্ট গরুর চাইতে শূন্য গোয়াল ভাল

গ) বাংলা ভাষা: রে খানি পাদাম রা চা

Dhaka University Institutional Repository

পাত্র ভাষা: বাংলা ভাষায়: দুই হাত নাড়ে খা।

৪.১৪ **লোককাহিনী** (folktale): আদিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কাহিনী প্রচলিত রয়েছে।

পাত্র ভাষা

খ) ঐরা দাদিং মামাভাইগনা। যে মামা আং বাগিনা সিকদালো, ইজরইন, তো ওয়াসিক। মামায়াং লাইদিসকং।মামা আং খেতকা উদিং। বাগিনা আং চিনং মামায়ালাই আর থাতরাটিকাং, হাটুরাটিকাং বাগিনাআ চিনং। আইন মামা তো আইন চিনংলেথাটুরাটিকাং। থা আইচ্যা আইন্যা মামা টকাং। চিনংলে তো আলাংরেং খালিরা, এনাং রা পারেংকাং পারেংরা লই আলাং এনরা উকাং বাজার কা। বাজার এনরা উরা দিরা উও উও রা ওইনো দেস সিকা উকাং। উরা ইসরকাং ফাইআ। ফাইয়া ইশার পরে আলাং রং সিকা উতোরা দাহাং। রেংআতোং লে ছলাতা পালতরা আর যত ইংখো, ডাখাইত তোং লই মাল এনাং কা, টিমোখি দামফইকা। টিমোখি দামফইকা এনাংরা আলালিং বাটিলো, আর যে আওতো ধয় জুরি হোআরলে পিলো অংয়ই অংয়ই। আর যে আতোং মাই, উয়া তোং ওয়ানলে ওমফই। পটাবালা সময় কা। হেআলাই থেরংকা দারা ইজালো, হেওআলাই তাকাং নেংকা সরা দই দই, নালিং হরই বাটা সলোরে। আর হেওয়ালাই, ডাংকা ডুংকুর রা, লই রেংআতোংলে টিকাং ডুরোংডারাংরা, টিরং লাই হোতেংলাই তালো। উফাই দয় উফাই দয়, আর লেংরা জোলায়া তোং তাদিং যুতু মেত কই যাংয়ে হালিংলে পিলো অংয়ই অংয়ই, আর হেয়া লাই রেংয়া তোং লে দুমুর দুমুর। আর হোতোং লাই টিকাং আর পিকাং দোর, আর আলাংলাই রংকাতো লামিরাং তো, সবপালে সলাকা পালোতকাং আর খেমকা উকাং। রেংআ তুংলে টিরা উকাং দামরা খেমকালে, পাওই তালো তে আইন মামা ডোংকা, থুংকু পাললা লালং ওয়াতুং উরা এনাং থুংকু লালং ওয়াতুং উরা এনাং। সাংয়াই থোংয়ে সোনা,রূপা থোংয়ে, পোয়উ য়োকাংলই চাকলাইয়া দুংকা তালোতে, থুংকুং অলালং আয়া তোং পি আইন সাওয়া খাংলে? নাংযে চিনং থাতদিং হুআংরে জরা দিরা, আইন সায়া এনাংকাং ছাংআই। ওইয়ো তারা মামায়াতালো। হাই থাতলা আর আলাং আরো জররা সাংয়াই পোইসা পইদা সরা এনাংলা। মামা আ লাই দিসকং আলং চিনং সিকলে আলাং থাতরা টিকাং। আলাংনে আলাং চিনং য়ু চামরেংজরুং জোররা ওয়ানকাং বাজারকালে। তহং বাজারকালে তালে, চামরা কইয়ানে চামরা কইয়ানে। আসতা বাজারবেমরাইলো তালো। বাংলাই ইজারাতালো দিং চামরা দিং দিয়া হইরা তারা ছকল আলাংলে বেজতি শোলো। হুং বেজতিং গোসাকোং আলাংলাই আবার বাগনায়াং বারি কেললো, থাতরা, তারপরের আলাং তো লই হং ডালা কয়েককইসে দারা ঔন।মামায়া লই আলা খেম লে কেলরা টিকাং। কেলরা বাগিনায়া দিসকং হ খেমওং খ্যাকলায়াতুংলে সলাকা পালুউতরাবাজারকাআবার জরোং য়াংওনলো। হইরা আবার আলাং (বাগিনা) বাজারকালে থেখলায়াতুংলাই জরুংওয়ানলো ছলছিকাছরা আর। আর আরসিকুং লাই সলাকাপ

Dhaka University Institutional Repository

সাংয়াইকরি খুরা আলাং লাই দিসলো ও কতটাই আইন সলায়া ইনজচার নাং সলায়া ইনজার লই। নাং সলায়া হাইলে পি। আর নাং আইন সলায়াং সংয়াই পইরা য়াওননা। হং বাইগন্যা আ হুআতুং যাওনা আলাং পউলে আবার তালো। আইন মামা নোং কাতো থুয়ুং লালাং য়াতু এনাং লোই। হং ইৎরওই আলাং কতটাই নোং কা উলো। কতটাই? ইাং বাগিনা থেকলাআ তুং জররা সাংআই এনাং কাং। হুং মামা আ লাই নেং কা সরা আলাং খেমলে কেনলো। থেকলাআতুং লে জরোং আন লো বাজারকা। বাংলে তালো হাই থেখলাআতুং জরে নালিং কই দাহাং থেখলা আনে। হ ইৎারা বাংলাই আলাং লে ইম খুবলো, লাগিলো বিজান। হং হইরা বাংলাই আনাংলে বংলো। এরা মামা আলাং মিনতাইলো আলাং লাংআতয়াতুং লে।

বাংলা ভাষা

এক ছিল মামা ভাগনে। ভাগনে মামার বোনের একমাত্র ছেলে ছিল। মামার সঙ্গে মামার ঝগড়া হলো। মামা, ভাগনের একটি গরু ধানক্ষেতে মেরে ফেলে। ভাগনে গরুর চামড়া শুকিয়ে বস্তায় ভরে বিক্রি করার জন্য নিয়ে যায়। যেতে যেতে রাত হয়। ভাগনে রাত কাটানোর জন্য একটি গাছে উঠে বসে থাকে। গভীর রাতে একদল ডাকাত টাকা-পয়সা, সোনা, রূপা চুরি করে ঐ গাছের নিচে এসে ভাগ করতে থাকে। দুর্বল ডাকাত ভাগে কম পায় আর যে সবল সে ভাগে বেশি পায়। এ কারণে দুর্বল প্রার্থনা করতে থাকে 'হে আল্লাহ আমার কাছে একজন লোক পাঠাও তার কাছে আমি বিচার দেব। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ভাগনে চামড়ার বস্তা নিচে ফেলে। বস্তার শব্দে চোরেরা ভয়ে সব টাকা-পয়সা, সোনা, রূপা ফেলে দৌড়ে পালায়। তারপর ভাগনে বস্তা থেকে চামড়া ফেলে দেয় এবং টাকা পয়সা বস্তায় ভরে বাড়ি নিয়ে আসে। বাড়ি এসে ভাগনে তার মাকে বলে- মা, মামার বাড়িতে গিয়ে পাল্লা নিয়ে এসো। আমি আমার টাকা পয়সা, সোনা,রূপা ওজন করব। মামা এ খবর শুনে বলে, আরে, আমি ওর গরু মেরে ফেললাম আর সে মরা গরুর চামড়া বিক্রি করে এত টাকা পেল। মামার লোভ হলো এবং সে তার গরু মেরে চামড়া শুকিয়ে বাজারে বিক্রি করতে গেল। এমন কাজ দেখে সবাই তাকে গলমন্দ করতে লাগল। মামা রাগে, ভাগনার উপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তার ঘর আগনে পুড়িয়ে দিল। ভাগনে সেই ঘরের কয়লা বাজারে নিয়ে গেল বিক্রি করার জন্য। এ সময় এক লোক বস্তার মধ্যে খুচরা পয়সা নিয়ে ঘুরোঘুরি করছিল। ভাগনে তাকে দেখে বলতে লাগলো 'আমার এই বস্তার মধ্যে টাকা আর টাকা, এতে কোনো খুচরা পয়সা নেই, এজন্য ওজন কম; আর তোমার বস্তায় টাকা নেই;এতে খুচরা পয়সা আছে তাই ওজন বেশি। ভাগনে লোকটিকে প্রস্তাব দিলো, চলো আমরা বস্তা পরিবর্তন করি। লোকটি ভাগনের কথায় বিশ্বাস করল এবং তার পয়সার বস্তা ভাগনার সঙ্গে বদল করে নিল। ভাগনে বাড়ি এসে তার মাকে বলল-'মা, মামার বাড়িতে গিয়ে পাল্লা পাথর নিয়ে এস, আমার পয়সা ওজন দেব'। মামা এ কথা শুনে,

Dhaka University Institutional Repository

অবাক হলো। সে তার ঘর আগুনে পুড়িয়ে দিল এবং সেই ঘরের কয়লা বাজারে নিয়ে গেল বিক্রি করার জন্য।মামা বাজারে গিয়ে বলতে লাগল আমার কয়লা বিক্রি করব কে নেবে কে নেবে?মামার কথায় লোকজন অবাক হলো এবং রাগান্বিত হলো। লোকজন মামাকে গালি গালাজ করতে লাগল। এক পর্যায়ে জনগণ অতিষ্ট হয়ে তাকে মার দিল। পরে মামা তার ভুল বুঝতে পেল। (ছবি: পরিশিষ্ট ৩.২২ দ্রষ্টব্য)

গ) হৈরাং হৈরাং দাদিং গাউদিকা পাছিক আর ছাছিক, আলালিং খুব মাইরাদিনউয়ে। হৈরা রানছিক পাওয়াথিরাউকং বাংছাওয়া দাদিং লগুরছিক। ওয়াতালো ওলোগোর ইয়াংউয়ে আইনবাত থিকাং আইনলগে দায়েনে ফুলকা লগুরা আলাংলোগে। উকাং ফুলকা বাওয়াং ছাওয়াতালো ইয়াইলিন ওইনা লগুরাতালো দাই আইন ফারাইতুরলো হাই ওয়াইনা। বাং ছাং ছাওয়াতালো দেই নাং ফারাইলো। হাই দ্যাহাং অ্যা নাং ফারাইনাদোই লগরাতালো দাইয়েলগোর দাই নাংওয়াজেতো হাইছারাতি বাং ছাং ছাওয়াতালা দিং দিইয়ে; দুর ছাইনা ফুলকা লগুরা তালাং নাং ওই ওইলে হাই ওইনা ফুলকা নাউয়েনে। হরইছো দরা হালা লগুরাং কইছে নিগোইয়া ইয়াংপলোহো; কিন্তু লগুরাতো ওআইনো। লগুরা কইছে মরা আং মিগাহাতু বিলুইয়া হরাইরো আর মিগা লাগলো তো ছাতাসিক ওইলো কুইছে মুরাঅনে বাং লগুরাং মিগা নাগনো থুরা হিরা থ দুরালগুয়া কইছে ফারাই ফেবুকা। উগা আলাং ওইকারো থুরা দররে খাতিরা দোউর পিটাং মরা অনেক কইছে হকারো থুবা বাং ছাওয়াং ফুলে ফুলে দোউর পিগাং দোরপি দোরপিরা মরাআ উরা বাংউলা ছরছু ওরা থা তকোইকাং হতানা বর আওয়া আর বাং ছাওয়া মাইর স ছরাং মরা কইছে বাং ছারা থিকাং ফুলকা মুরা ছাওয়া ওইকারো থরা খুলো আলাং লগুরা ছয়ং ফুলকা আরা তালা লগুর লগুর না হাইলা তারউইলা তারা পলোকিং ফুলকা মরাওয়াং ছাওয়া গাও বাশিলা করা লগুরালা গোরিং লেগিকাং খেরি খ্যারিয়া। উরা খলোংলো শর শর ওরাখা। উয়ি উয়ি আর উর কালারাংদাহাং ফুলকা বাং ছাওয়া বারিকা ইয়াংরা খুকাং খুলো পাওয়াং থুতা কালা। উয়ি থান আকতিরা দাহাং ফুলকা কুইছে মরাআলা মানরা পুকাং ব্যারখ্যা ইসুক থাকা ইস্যণশ পিরা।

বাংলা ভাষা

অনেক দিনের আগের কথা। এক গ্রামে এক ছেলের বাবা ছিল। তারা স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করত। হঠাৎ একদিন ছেলের বাবা মরে গেল। ছেলের এক বন্ধু ছিল। সে তার বন্ধুকে বলল, 'আমার বাবা তো মরে গেছেন, তুমি আমাদের বাড়িতে এস। তারপর তার বন্ধুকে নিয়ে বাড়িতে গেল। রাতে বন্ধু ঘুমোতে গেল। তার বন্ধু বলল, আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। ছেলেটি বলল, ঠিক আছে ঘুমোও। বন্ধু বলল, না, আমি ঘুমোতে পারব না। কারণ তোমার বাবা উঠে এসে আমাকে খেয়ে ফেলবে– এই ভয়ে আমি ঘুমোতে পারব না। তখন ছেলেটি বলল, আরে আমি আছি না কোন চিন্তা নেই। কিন্তু সে বলল, তবুও আমার ভয় করছে। ছেলেটি বলল, প্রথমে তুমি ঘুমোও, তারপর আমি ঘুমাব। তারা সেভাবেই ঘুমানোর চেষ্টা

Dhaka University Institutional Repository

করল। ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়ল। তার বন্ধুটি আর ঘুমোতে পারছে না। হঠাৎ করে সে তার বন্ধুর বাবার মুখ দেখতে পেল। বন্ধুটি দেখল, মরা মানুষটি তার ছেলের মুখ দেখছে। তখন ভয়ে বন্ধুটি দরজা খুলে দিল দৌড়। পেছনে পেছনে মরা মানুষটিও দৌড়াতে লাগল। দৌড়াতে দৌড়াতে সে ছেলেটিকে ধরে ফেলল। সরিষা গাছের উপর ছেলেটিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। ছেলেটি ও মরা মানুষটি মারামারি করতে লাগল। মারামারির এক পর্যায়ে মরা মানুষটি ছেলেটিকে খেয়ে ফেলল। সকালে কার বন্ধু ঘুম থেকে উঠে বলল, বন্ধু তুমি এত স্বার্থপর? তুমি আমাকে কিছু না বলেই চলে গেলে। ছেলেটি গ্রামবাসীকে ডেকে বলল, আমি আমার বন্ধুকে খুঁজে পাচ্ছি না,চল আমরা খুঁজে দেখি। তখন গ্রামবাসীরা বন্ধুকে খুঁজতে লাগল। হঠাৎ তারা দেখতে পেল সরিষা ক্ষেতে বন্ধুটির হাত মাংস পড়ে আছে। তারপর সবাই বাড়ি চলে গেল। তারা দেখতে পেল, মরা মানুষটির মুখে রক্ত, মাংস মুখে লেগে আছে। তখন তারা মরা মানুষটিকে কবরে নিয়ে তার উপর ও নিচে কাঁথা দিয়ে কবর দিল।

ঘ) পাত্র ভাষা

হইরা দাদিং কততাই বাংনি। আতাকাকালে রানছিক কততাই থাইয়া খিরা পলংকং হুয়াং সাদিং ছাওয়াং রামেন ইসলো হারান। হারানলে আলাং কাকাওয়া খেসা খাই খুলো। রানছিক হারানুং পয়ইকুং আর নুনুয়ই এননা ছিকাই থুরকাং ছিকাইন পরেয়ং আলালীং আলগা ইসকং। হং হারান পয়ইলে এননা আলগা বাড়িকা উরা দাহাং। আলাদা বাড়িকা দাহা বাক্কা কয়েকদিন উলা। হারানুং কুইচে থেমরোত ছিলকরা উলো। হারানকুং পয়ইকুং কততা সরা ফালাং লাকলা এনাংকাং এরা হং হারানে আলাং কাকাওয়ালে উরা তায়ে আলালীং খেম যুইতসরা পিং কথা, হং হারান উরা পানুওয়া য়ায়ুং কতা তাকাং। এরা পয়ইলে য়াংরা তালো য়ো রেই দাহাং ওয়াওয়া থাননা তুনরা বে আইন কাকা য়ারনা, রান্দা বাড়া সরা হারানকং পয়ই পানুওয়াং বাত লাংলো। পানওয়াতো আর য়াঙাইলো হং হারানুং ফারানকা ইসলো আইন য়োকুং নাং বাতল্াং বাতলাংয়ো। নাং দিং ওয়ং আইন য়োকং আইন নুনুকুং দিনে এননা ছিকাইকাং হং মইদি নাং আইন থাকানে গোসা সরা দায়ে, এরা আলীং বাড়ি ওয়না য়াঙাইনা। ভাইহুতয়াং মাতকুং পানুয়াং ফারান করোরা য়াং ধুরলা। হং পানুওয়া তালো ভাইহুতওয়ালে বাবারে বাবা হাই আর গোসা সইনা মেত থাইরা নাং বাড়ি দাম। হং হরানি অন্তরে অর গোসা গোসি দয়। পানুওয়া পইনুয়ই হারান হারানুং পইয়ই একলগে চালো দালে।

বাংলা ভাষা

একই বাড়িতে বাস করতেন দুই ভাই। হঠাৎ করে বড় ভাই মারা গেলেন। রেখে গেলেন এক ছেলে। ছেলেটির নাম হারান। হারান তার কাকাকে খুব ভালোবাসে। কাকাও হারানকে খুব ভালোবাসে। হারানের মা আর কাকীর মধ্যে মাঝে মাঝে ঝগড়া হয়। কিছুদিন পর তারা আলাদা হয়ে যায়। হারান

Dhaka University Institutional Repository

তার মাকে নিয়ে অন্য বাড়িতে আসে। কাকা-কাকীও আলাদা বাড়িতে থাকেন। এভাবে অনেক দিন কেটে গেল। হারান দেখলো তাদের ঘরের চাল ছাউনি নেই তার ঘরটাও ভেঙে গেছে। সে আর তার মা ঘর মেরামতের জন্য ছন, বাঁশ, বেত জোগাড় করলো। হারান তার কাকাকে খবর পাঠালো। কাকা যেন ঘর মেরামত কাজে সাহায্য করেন- এই আশায়। সে তার পোষা মোরগটা ধরলো। মাকে বলল, কাকার জন্য এটা রান্না করো। হারান খাবার নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু কাকা এলেন না। তারও খাওয়া হলো না। হারান জানাল মায়ের সাথে কাকীর ঝগড়া হয়েছে। তাই কাকা আসেননি। তারপরা হারান কাকার বাড়ি গেলো। কাকাকে বলল, 'মা তোমার জন্য মোরগ রান্না করেছেন, আমি সারাদিন অপেক্ষা করেছি। আর তুমি গেলে না। শুনেছি মা আর কাকী ঝগড়া করেছে, আমি তো ঝগড়া করিনি। এজন্য কি তুমি আমাকে ভুলে যাবে? আমাদের বাড়ি কি তুমি যাবে না'। হারানের কথায় কাকার মন গলে গেলো। তিনি আর বসে থাকতে পারলেন না, হারানকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'চল, এখনই তোদের বাড়ি যাই। আর কখনও এমন হবে না'। এখন হারান তার কাকাকে সব সময় কাছে পায়। মা আর কাকীর মধ্যে খুব মিল। তারা বলে হারানের জন্যই তাদের মধ্যে মিল হয়েছে। হারানের মনেও তাই খুব আনন্দ। এখন তারা সবাই মিলেমিশে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository